লোকায়ত সংস্কৃতি

পরিপ্রেক্ষিত ও রূপরেখা

লোকায়ত সংস্কৃতি

পরিপ্রেক্ষিত ও রূপরেখা

সম্পাদনা

সঞ্জীব সরকার

অরুণকুমার রায়

ভূমিকা : ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

উইলিয়াম কেরী স্টাডি এ্যাণ্ড রিসার্চ সেণ্টার

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৮০

প্রকাশক : সুনীলকুমার দত্ত, উইলিয়াম কেরী স্টাডি এ্যাণ্ড রিসার্চ সেণ্টার
১৪/২, সদর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৬

মুদ্রণ : প্রিনটেক্স ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
১৯, এস. এন. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা ৭০০০১৩

প্রচ্ছদশিল্পী : অমিতাভ সেন

বাংলা লোকবিজ্ঞান চর্চা

ওয়াকিল আহমেদ

ইংরেজ তাঁদের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এদেশের ভাষা, ভাব, কৃষ্টি ও জীবনযাত্রাপ্রণালী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। খৃষ্টান পাদরিগণও ধর্মপ্রচারকার্যের সুবিধার জন্য অনুরূপভাবে এদেশের ভাষা-সাহিত্য ও জনজীবনকে জানার উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে লৌকিক-বিজ্ঞান সম্পর্কেও চর্চা শুরু করেন তাঁদের আগমনের অল্পকাল পর থেকেই। সারা উনিশ শতক ধরে নানা জনে নানা বিষয়ের উপর আলোকপাত করে গেছেন বিভিন্ন পুস্তক, প্রবন্ধ, রিপোর্ট, নথিপত্র, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও আত্মজীবনীতে।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ তখন উন্নতির চরম শিখরে। তাঁদের পৃথিবী-জোড়া সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত নেই। দারিদ্র্য নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। পুরাতন বিদ্যার নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে ও নতুন বিদ্যার আবিষ্কার সাধন করে জ্ঞান-গরিমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। সে কাজ তাদের সাজে।

আমরা যখন আধুনিক বিদ্যা গ্রহণ করি তখন বাস্তব দিকগুলিকে অধিক মূল্য দিয়েছিলাম। তখন আমাদের জাগবার কাল, জাগাবার কাল। ধর্ম ও সমাজের সংস্কারসাধন করেছি, প্রয়োজনে তর্ক-বিতর্ক করেছি, দর্শন-ইতিহাস-বিজ্ঞান চর্চা করেছি। এর সঙ্গে শুরু হয়েছে সৃষ্টিশীল শিল্পচর্চা। লোকবিজ্ঞান যে একটি জ্ঞানের জগৎ, চর্চার জগৎ, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়েনি। রামরাম বসু থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত দীর্ঘ একশ' বছরে লৌকিক বিষয় নিয়ে শিক্ষিত লোকে খুব কমই আলোচনা করেছেন। শতাব্দীর শেষ দিকে লোক-সাহিত্যের আলোচনাসহ কিছু সংগ্রহ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথই। তিনি তার সৃষ্টিশীল কাজেও লৌকিক উপাদানকে ব্যবহার করলেন। ছড়ার

ভাব ও ছন্দ, বাউল গানের ভাব ও সুর এবং রূপকথার ভাব ও চরিত্রকে উন্নত রচনার আঙ্গিকে ছেঁকে ধরলেন। তাঁর সৃষ্টিতে লৌকিকতা বা গ্রামীনতা রইলো না, তাতে নতুন প্রাণ ও আনন্দ, রূপ ও সৌন্দর্য ফুটলো। তাঁর অনন্য ও অননুকরণ প্রতিভার দ্বারাই এটি সম্ভব হয়েছে।

নতুন ও বৈচিত্র্যের পিয়াসী রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পণ্ডিতগণ এগিয়ে এলেন লোকসাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করতে। সংগ্রহ ও আলোচনা করতে এগিয়ে এলেন দীনেশচন্দ্র সেন, গুরুসদয় দত্ত, সতীশচন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, হরিদাস পালিত, মহম্মদ মনসুর উদ্দীন ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। দীনেশচন্দ্র সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে কিছু সহযোগিতা পেয়েছিলেন। অন্যদের প্রয়াস ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। বাংলার গ্রাম-জীবন ও গ্রামীণ সমাজ দীনেশবাবুর আবেগ প্রবণ মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় লোকসাহিত্যের বিভিন্ন দিকের ভাবৈশ্বর্য ও রসসৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। বাংলার মাটি-মানুষ-সমাজ-কৃষ্টির অনাবিল প্রাণস্পন্দনটি কল্লোলিত হয়েছে তাঁর আলোচনায়। তিনি ঠিক বিজ্ঞানের পথ ধরে চলেন নি, রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই বিস্তৃতি এনেছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কিশোরদের জগৎ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের ছড়া ও রূপকথার সংগ্রহ ও সম্পাদনা বাংলার শিশুদের স্বপ্নলোককে ভরে তুলেছিল। রাজকন্যার পক্ষীরাজ ঘোড়া, সোনার কাঠি রূপার কাঠি, সুয়োরাণী-দুয়োরাণী, রাক্ষস-খোক্ষস, দেও-পরী, ভূত-প্রেত, শিশুজগৎকে ছাড়িয়ে আমাদের সাহিত্যের মধ্যেও উঠে এসেছে ঐ সময় থেকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে নানা উপমায়, অলংকারে, প্রতীকে, রূপকে ব্যবহার করেছেন গদ্যে-পদ্যে। গুরুসদয় দত্ত লোকচর্চার অর্থকে আরও সম্প্রসারিত করে জাতির ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটাবার চেষ্টা করেছিলেন। স্বদেশীযুগে ব্রতচারী আন্দোলন তাঁরই অবদান। ব্রতচারী আন্দোলনের মূল ভিত্তিই হচ্ছে বাংলার লোকৈতিহ্য। নাচ-গান-প্যারেডের সমন্বয়ে রচিত ব্রতচারিতে নতুন সুর, ছন্দ, রূপ ও আদর্শ ফুটেছিল। স্কুল-পাঠশালায় ছেলেমেয়েদের নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হত তা।

বালক-বালিকার দেহে-মনে-চিন্তায় শৃঙ্খলাবোধ, ঐতিহ্য-প্রীতি জাগাবার উত্তম মাধ্যম ছিল এটি। অনেকে মনে করেন ইংরাজ সরকারের কর্মচারী জি. এস. দত্ত বাঙালী টেরোরিস্ট তরুণদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন স্কুলের প্রাঙ্গণে বৃটিশদের প্ররোচনায়। সে বিচার-বিতর্ক ভিন্ন। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, দেশের কৃষ্টিকে শিক্ষামূলক কাজে, দৈহিক গঠনের কাজে, সামাজিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা তিনি বাস্তবে প্রমাণ করে গেছেন। পরবর্তীকালে এ কাজটি আর কারও দ্বারা হয়নি।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বদেশ-চেতনা জাগাবার কাজে লোকসঙ্গীতকে ব্যবহার করা হয়েছিল। তখন তার কৌলীন্য বেড়েছিল। গ্রামের অশিক্ষিত লোকের কণ্ঠ ছেড়ে শহরের শিক্ষিত লোকের কণ্ঠে আশ্রয় করেছিল। রেকর্ড এবং রেডিওতে অন্যান্য ভদ্র সঙ্গীতের পাশে লোকসঙ্গীত স্থান করে নেয়। শুধু তাই নয়, শহরের শিক্ষিত কবিরা পর্যন্ত লোকসঙ্গীতের ভাবে ও সুরে গান রচনায় মনোনিবেশ করেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের ভাব-ভাষা-কথা-সুরকে তা স্পর্শ করেছে। গায়ক আব্বাসউদ্দীন, পঙ্কজ মল্লিকের আবির্ভাব ঐ সময়েই। শিক্ষিত কবির কলমে ও গায়কের কণ্ঠে লোকসঙ্গীতের গ্রামীণ আদল সংরক্ষিত হওয়ার কথা নয়, হওয়া বাঞ্ছিতও নয়। অনেকে অভিযোগ করেন, এতে লোকধারার বিকৃতি আসে এবং লৌকিক প্রাণোচ্ছলতা বিনষ্ট হয়। রক্ষণশীল মনোভাব এরূপ দুঃখবাদের জন্ম দেয়। শিক্ষিত লোকে গ্রামের সাধারণ মানুষের বিষয় নকল করতে পারেন না। তাঁরা সমকালীন ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনার আলোকে তাঁদের সৃষ্টির বিষয়কে দেখতে চান। তাঁদের দ্বারা এরূপটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লোক-ঐতিহ্যকে তাঁরা নকল করবেন না। লোক-ঐতিহ্য থেকে তাঁরা প্রেরণা ও উৎস সংগ্রহ করবেন। তাতে লৌকিক বিষয়ের মর্যাদাহানি হয় না, মর্যাদা বাড়ে। অনেকে বলে থাকেন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী লৌকিক ধারার মধ্যে প্রচলিত ছিল: মুনী-ঋষিরা সে উৎসকে যুগচেতনায় নিষিক্ত করে শিক্ষিত সমাজের উপযোগী মহাকাব্য রচনা করেছেন। টলস্টয় তো বলেই ফেলেছেন যে আমাদের সকল সৃষ্টির উৎস নিহিত আছে ঐ জন-জীবনের গভীরে। রাশিয়ার 'ব্যালে নাচে'র উৎস লোক-ঐতিহ্য। আমাদের আল্পনা পল্লীর পূজাবেদী, গৃহ-প্রাঙ্গণ, দেওয়াল, কুলা, কাঠা, ঝাঁপি ছেড়ে শহরের

সভাসমিতির তোরণ, দেওয়াল মেঝে ও আচার-অনুষ্ঠানের মঞ্চ, আসর ও অন্যান্য সজ্জায় আসন পেয়ে গেছে সেটাতো স্বচক্ষেই দেখে থাকি। শহরের আল্পনায় আধুনিক মনের ছোঁয়াচ আছে, আদিমতা থাকেনি। আমাদের মণিপুরী নাচ ও জাতে উঠে এসেছে। লোকধারার প্রেরণাটা এরকমই হওয়া উচিত। নতুন সৃষ্টির প্রেরণা দিবে—যার সঙ্গে মানুষ ও মাটির সম্পর্ক থাকবে—আকাশের বায়বীয় পদার্থ হবে না, অথবা বিদেশী নকলবস্তু হবে না।

১৯৪৭-এর পর লোক-বিজ্ঞানের চর্চা মোড় নিয়ে গবেষণার রূপ গ্রহণ করে। ইউরোপীয় দেশগুলিতে ও আমেরিকায় এর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা শুরু হয় এবং তা অনেক দূর অগ্রসর হয়। উভয় বঙ্গের গবেষকদের প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে সংগ্রহের ব্যবস্থা হল, গড়ে উঠল স্বতন্ত্র প্রতিষ্টান, স্বতন্ত্র পত্রিকা। 'ফিল্ড ষ্টাডি' শুরু হল, সেমিনারের আয়োজন হল, সার্ভের ব্যবস্থা হল। ব্যক্তির উদ্যোগের স্তর থেকে প্রতিষ্ঠানিক যৌথ উদ্যোগে উপনীত হলাম আমরা। বাংলাদেশে 'বাঙলা একাডেমী' সংগ্রহের কাজে হাত দিয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। কিছু কিছু সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেছে তা। কুষ্টিয়ায় 'লালন একাডেমী' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকার যাদুঘর, রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম, শ্রীহট্টের সংগ্রহশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানেও লৌকিক বিষয়গুলি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক স্বতন্ত্র কোন গবেষণামূলক পত্রিকা এখনও প্রকাশিত হয়নি। গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত হয়ে থাকে। কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, পত্রপত্রিকা এবং প্রতিষ্ঠানাদির মাধ্যমেই 'স্কুল' গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে এরূপটি গড়ে উঠেনি। বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে আলোচনা, সমালোচনা ও গবেষণা বেশি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের পাঠ্যসূচীকে ছাড়িয়ে এম. ফিল, পিএইচ-ডি ডিগ্রির বিষয়ভুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি সমাপ্ত করেছেন। কয়েকখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিক হয়েছে। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্তের সম্পাদনায় ইংরাজী মাসিক পত্রিকা "Folklore" নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে গত সতের বছর ধরে। ডক্টর দুলাল চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে বাংলা পত্রিকা 'লোক-সংস্কৃতি'। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে দু-একটি ফোকলোর একাডেমী-ইনষ্টিটিউট গড়ে উঠেছে কলিকাতায় ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে।

লোকসঙ্গীত ও চর্চা ও লোকনৃত্যচর্চার জন্যও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় আছে। এদের পরিবেশিত অনুষ্ঠানাদি সুধিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দু'-একটি দল বিদেশ ঘুরে এসেছে। কিছুকাল আগে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ছৌ-নাচের দল দিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। রেডিও, রেকর্ড এবং টেলিভিশনে লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের পরিবেশনা অব্যাহত আছে। এগুলি হল মোটামুটিভাবে লোক সংস্কৃতির বিস্তৃতির ক্ষেত্র।

এখন সমালোচনায় নামলে আমরা কি দেখতে পাই? প্রথমতঃ আমাদের আলোচনায়-গবেষণায়-পরিবেশনায় আমরা কোন 'স্কুল' গড়তে পারিনি। 'দীনেশ চন্দ্র-স্কুল', 'আশুতোষ-স্কুল', 'আব্বাসউদ্দীন-স্কুল' তৈরি হয়নি। কিন্তু বিদেশে লোকবিজ্ঞানীরা অনেকে এরূপটি করতে পেরেছেন। বিশেষ করে, 'থমসন-স্কুল', এ্যন্টি-অর্নি-স্কুল' ইত্যাদির নাম সহজেই করা যায়। বিদেশী গবেষকদের আলোচনা বিজ্ঞানভিত্তিক। এজন্য তাঁরা তত্ত্ব খাড়া করতে পারেন। ফোকলোর আলোচনার যে বিজ্ঞানের মর্যাদা পেয়েছে, তার প্রকৃত কারণ এটাই। আমাদের আলোচনা 'বর্ণনামূলক পদ্ধতি'তে অধিক সীমাবদ্ধ, কিছু কিছু 'বিশ্লেষণমূলক' ও 'তুলনামূলক' পদ্ধতিতে আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে। লোকবিজ্ঞানের আলোচনায় সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, দার্শনিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের আলোচনায় এগুলি অনুপস্থিত। পাশ্চাত্ত্যের টেকনলজি পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে এবং তদনুযায়ী বিত্তার কপ্চানি করতে হবে আমাদের মনোভাব এরূপ না হলেও চলে। প্রাচ্যচিন্তা ধারার একটা নিজস্ব গতি ও প্রকৃতি আছে। লৌকিক বিষয়ের রূপ-রস-ভাবগত ব্যাখ্যার অধিক প্রয়োজন নেই। এর জন্য জন্য দু'চার জন গবেষকের শ্রম যথেষ্ট। আমাদের প্রয়োজন হবে এর তত্ত্বগত আলোচনা। অতীতের ইতিহাস নির্মাণের জন্য ঐতিহ্যের স্বরূপ-প্রকৃতি জানবার জন্য জীবন-জাতি-সমাজ-অর্থনীতি-নরতত্ত্বের যে সম্পর্কগুলি আছে, আমাদের খুঁজে খুঁজে সেগুলি বের করতে হবে। এটা একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে করা উচিৎ। এককভাবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে এরূপটি হওয়ার কথা নয়। একবার অর্থব্যয়, শ্রমব্যয় এবং শক্তিব্যয় করে একাজটি করে নিলেই চলবে। আমাদের জাতীয় জীবনে এত বেশি সমস্যা রয়েছে যে, আমাদের

প্রতিটি মুহূর্তকে বাস্তবের ও বর্তমানের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে। অতীতের পাতায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা চলবে না।

বাংলাদেশের একশ্রেণীর প্রগতিশীল লেখক আছেন, যাঁরা বলছেন যে, লৌকিক বিষয় কোন জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। এগুলি পিছিয়ে-পড়া সমাজের সৃষ্টি। জাতির অতীত অগৌরবের কথা তুলে ধরে সমাজ মনকে হতাশাগ্রস্ত ও হীনবীর্য করে তোলা হয়। ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন বিষয়বস্তুর আলোচনা বিশ্লেষণ দ্বারা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তারা এমন বলেন যে, লোকবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাগুলি সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী মানসিকতার ফল : সমাজ মানসের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও বুদ্ধিকে ব্যাপৃত করার জন্য তাঁরা এসব বিদ্যার বীজ ছড়িয়েছেন। সমস্যাবহুল দেশের বাস্তব সমস্যাকে ছেড়ে অন্য বিষয়ে এনার্জির ব্যয় জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। সুখী সমৃদ্ধ লোকের জন্য যা শোভা পায়, সংকটাপন্ন, সমস্যাকীর্ণ সমাজের মানুষের জন্য তা শোভা না। প্রয়োজনের দিক থেকে ও যুক্তির দিক থেকে তাঁরা যা'ই বলুন না কেন, একটা জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী লৌকিক বিষয়গুলির মুল্যায়নের প্রয়োজনকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবে ঠিকমতো মুল্যায়ন করতে হবে। জাতীয় জীবনের গঠনমুলক কাজে, সৃষ্টিশীল কাজে ও প্রেরণামুলক কাজে আসে এমন বিষয়গুলি নির্বাচন করে সেগুলির উপযোগিতা দেখাতে হবে। আমরা যেন বিদ্যাকে সস্তা ব্যবসায়ের কাজে না লাগাই আর শহরের সৌখিন গবেষক না হই। আমাদের মত উন্নয়নকামী দেশের নাগরিকের পক্ষে অধিক কালক্ষেপ, অকারণ শক্তিক্ষয় ও অর্থের অপচয় মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। একটা উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য শেষ করবো। আগে সন্তান-কামনায় রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র পশুবলি দিত। গাঁয়ের মেয়েরা সন্তানলাভের জন্য গাছে ঢিল বেঁধে আসে। মুসলমান মেয়েরা দরগায় কিংবা মাজারে সুতা বেঁধে দেয়। সন্তান জন্মের পর মুসলমান সমাজে যে আঁকিকা দেওয়া হয় (মেয়ের জন্য একটি ও ছেলের জন্য দুটি ছাগল জবাই করা হয়) তা ঐ একই মানসিকতার ফল। ধর্মীয় সামাজিক নিয়ম-প্রথা হিসাবে আমরা অনায়াসে এগুলি চালিয়ে দিই। এর পশ্চাতের রহস্যটুকু অতি সামান্য। এগুলি প্রাচীনকালের যাদুবিশ্বাসের

ফল। কৃত্রিম বস্তুর অনুকরণ করা বা নকল তুলে আসল বস্তুর কামনা করা যাদুবিশ্বাসের বৈশিষ্ট। গাছে ঢিল বেঁধে ফল ধরানোর নকল তুলে সন্তান ধারণের আকাঙ্খা ব্যক্ত করা হয়। প্রাণের বদলে প্রাণ কামনা করা বলি দেওয়ার উদ্দেশ্য। এইটুকু যদি আমরা বুঝতে ও বুঝাতে পারি, তবে আমাদের মনের তলায় অনেক অন্ধকার দূর হয়, আমরা অনেক সংস্কার, সংকট, ক্ষয়ক্ষতি, দুশ্চিন্তা, দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পাই। এরূপ আরও অনেক বিষয় আছে, যা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সেগুলির অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করা যায়। লোক-বিদ্যার এসব ব্যাখ্যা দ্বারা সমাজশিক্ষার যে একটা বড় উদ্দেশ্য সফল হতে পারে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

●

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ॥

রূপকথা চর্চায় সমস্যা ও বাংলা রূপকথার প্রাচীনত্ব

অরুণকুমার রায়

ভারততত্ত্বের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় একশ বছরের অধিককাল পূর্বে জার্মানদেশে যে ভারতীয় পুরাকাহিনী (Myths) গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল এই শতাব্দীর বর্তমান দশকে সেই দেশেরই সহায়তায় বাংলার রূপকথার (Marchen) প্রথম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়াস* যে বিশ্বের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে সেইজন্য সেই দেশ ও জাতির প্রতি যেমন আমরা কৃতজ্ঞ, তেমনি গৌরবান্বিতও বটে। গত শতাব্দীর জার্মান পণ্ডিতদের কঠিন ও জটিল একক প্রয়াসকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেও আমাদের দ্বারা সম্পন্ন বাংলা রূপকথার এই গবেষণাকে আরো অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি এই কারণে যে এ কারুর একক প্রয়াসের ফল নয়, জার্মানী ও বাংলার শতাধিক তরুণ ও প্রবীণ মানুষের দশ বছরের অধিককালের যৌথ-উদ্যোগের এ এক নিঃস্বার্থ ফসল।

প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে আধুনিক অর্থে পুরাকাহিনী তথা লোকায়নের (Folklore) চর্চা ইংরেজ যুক্তিবাদী দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনের (Francis Bacon, 1561-1626) দ্বারা শুরু হলেও এর উৎস-অনুসন্ধানের জন্য 'প্রাচ্যের দিকে মুখ ফেরাও' এই আওয়াজ প্রথম তুলেছিলেন জার্মান পণ্ডিত ক্রুজার [Creuzer : Symbolik und Mythologie, Leipzig, 1810-1812 : "This secret wisdom passed from the Orient to Greece and became the kernel of all myths, which therefore contain the wisdom of antiquity in all allegorical form"—tr. literally.]

ক্রুজারের এই যুগান্তকারী ইঙ্গিত পূর্ণায়ত হ'ল সমসাময়িক আর এক জার্মান মনীষীর অবদানে। পুরাকাহিনী-চর্চা তখন জটিল আবর্তে দিশেহারা। এই বিভাগে সঠিক বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। জট খুলে দিলেন কে. ও. মুলার (K. O. Muller. 1797-1840) তাঁর বিখ্যাত Prolegomena zu einer wissenschaft licher Mythologie, 1825 গ্রন্থে [শিরোনামার ইংরেজী হবে Preliminary Remarks on a Scientific Mythology.]। মুলার বললেন, পুরাকাহিনী তথা লোকায়ন-চর্চা একপেশে দৃষ্টিয়কাণ থেকে করা চলে না, এর বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে নানাদিক থেকে; তবেই এর জটিলতা উন্মোচিত হবে। আধুনিক অর্থে কে. ও. মুলারকেই প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকায়নিক বলা চলে। এই মুলারের নির্দেশ অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে লোকায়ন-চর্চার ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক প্রভৃতি বিদ্যাপীঠের (Schools) উদ্ভব হয়।

সকলেরই জানা আছে যে, ভারতবিদ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতমণ্ডলী এক সময়ে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই প্রভাব-বিস্তারের বীজ নিহিত ছিল ফ্রানৎজ বপ-এর (Franz Bopp. 1791-1867) তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে ইণ্ডো-জার্মানিক ভাষাসমূহের সম্পর্ক-নির্ধারণের সূত্র আবিষ্কারের মধ্যে। ভারতীয় পুরাকাহিনী তথা লোকায়ন-চর্চায়ও বপের অনুসারীরা গত শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত নানা দিক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বহু দেশে তাঁদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তিনি নাগরিকত্বের দিক থেকে জার্মান না হলেও বংশ এবং শিক্ষা-দীক্ষায় জার্মান। লোকায়ন-চর্চার ভাষাতাত্ত্বিক বিদ্যাপীঠের এই অনন্তপ্রতিভা হলেন ম্যাক্স মুলার [Max Muller, 1823-1900। মাত্র তেইশ বছর বয়সে মুলার জার্মানী ত্যাগ করে অক্সফোর্ডে আসেন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলি তর্জমা করার জন্য। দেশে তিনি আর ফিরে যাননি এবং বৃটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বাকি জীবন ইংরেজীতেই তিনি ভারততত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ে রচনা প্রকাশ করে গেছেন। লোকায়ন-চর্চার ইতিহাসে ম্যাক্স মুলারের সবচেয়ে বড় অবদান হ'ল, তিনিই প্রথম ভারতীয় ও গ্রীক পুরাকাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক-বিশ্লেষণে ভাষাতত্ত্বের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। [এদেশে ম্যাক্স মুলার "জার্মান পণ্ডিত"

আখ্যা পেলেও বর্তমানের দুই জার্মানীতেই তিনি 'বৃটিশ পণ্ডিত' রূপে পরিচিত।] ম্যাক্স মুলারের প্রভাব খোদ জার্মানীতেও বেশ কিছু পড়েছিল, এবং একটা জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক বিদ্যাপীঠও গড়ে ওঠে তখন। এই বিদ্যাপীঠের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন মান্‌হার্‌ডট (Mannhardt)। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে মান্‌হারডট Antike wald-und Feldkulte, 1877 [ইংরেজী তর্জমা করলে হবে Antique wood and Fieldcult] নামে একটি গ্রন্থপ্রকাশ করে পুরাকাহিনী ও লোকায়ন-চর্চায় মুলারীয় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অসারতা প্রমাণ করলেন। ইতিপূর্বে নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক ও ইতিহাসের পণ্ডিতমণ্ডলী মুলারীয় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর যে আঘাত হানছিলেন মান্‌হার্‌ডট এসে তাকে আরও জোরদার করলেন। এমনি ভাবেই একদিন লোকায়ন-চর্চায় ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাতাদের কবর রচনা হ'ল।

ভারতীয় চিরায়ত সাহিত্যের সাক্ষ্যপ্রমাণাদিকে ভিত্তি করে একশত বৎসর পূর্বে লোকায়ন-চর্চার যে ভাষাতাত্ত্বিক নিরিখ সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীব্যাপী পণ্ডিতমণ্ডলী তা চিরতরে বর্জন করলেন। নতুন জমানায় কেবল বিশ্লেষণী-মানদণ্ডই পরিবর্তিত হয়নি, গবেষণার উপকরণেরও তারতম্য হয়েছে। একশত বৎসর পূর্বে গবেষণার প্রধান উপকরণ ছিল চিরায়ত লেখ্য-সাহিত্য, আজ এই বিশাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মৌখিক লোককাহিনীই লোকায়ন-চর্চার মুখ্য উপজীব্য। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের ধারকদের অনেকেই এগুলিকে ইংরাজীনবীশ আয়া ও পাদ্রীদের ইউরোপ থেকে আমদানী করা পরী-কাহিনী (Fairy Tales) দ্বারা প্রভাবিত স্বকপোলকল্পিত কাহিনী বলে মনে করতেন। ইংরেজ ও ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলী সাম্রাজ্যবাদী-দৃষ্টিভঙ্গীতে আচ্ছন্ন ছিলেন ধরে নিলেও জার্মান মনীষীরাও এই বিভ্রান্তির বাইরে ছিলেন বলা চলে না। ১৮৯৩ সালে ইয়াকোব সংকলিত 'ভারতীয় রূপকথা' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে পণ্ডিতপ্রবর ভেবার (Weber) সংকলককে ষ্টোক্‌স, ফ্রেরে, কিংসকোর্ট, ষ্টিল-টেম্পল, ক্যাম্পবেল, ডেম্‌স ও নোলেস্‌ প্রমুখ লোকায়নিকদের 'সন্দেহজনক' (!) সংকলনগুলিকে নির্বিচারে গ্রহণ করে 'ভারতীয়' আখ্যা দেওয়ার জন্য দোষারোপ করেন। এই কাহিনীগুলিকে আদৌ ভারতীয় বলা চলে কিনা ভেবার স্পষ্টভাবেই সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। অনুরূপ সিদ্ধান্ত সম্প্রতি জিপসী-লোককাহিনী সংকলন

করতে গিয়েও পাওয়া গেছে। সকলেই জানেন ইউরোপের সব দেশে বহুকাল থেকেই জিপসী বা রোমানীরা দলবদ্ধভাবে বাস করছে। এদের কথ্যভাষা রোমানী নিয়ে গবেষণা করে পণ্ডিতমণ্ডলী একমত হয়েছেন যে এদের আদি নিবাস ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। জনৈক যুগোস্লাভ্ জিপসী লোকায়নবিদের সারাজীবনব্যাপী সংগৃহীত চার হাজার লোককাহিনী সম্পাদনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ডঃ মোডে দেখে বিস্মিত হয়েছেন যে যুগোস্লাভ, রুমানীয়, হাঙ্গেরীয়, চেকবুলগার এমন কি ইংরেজ লোকায়নবিদ জ্যাকবও সিদ্ধান্ত করেছেন যে জিপসীদের নিজস্ব কোন লোকসাহিত্য নেই, যে সব দেশে এরা দলবদ্ধভাবে বাস করে সেখানকার মৌখিক কাহিনীই এরা আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছে। কিন্তু ভারততত্ত্ববিদ ডঃ মোডে আবিষ্কার করেছেন যে এগুলির মুল প্রোথিত রয়েছে পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান অঞ্চলের প্রাচীন লোককাহিনীর মধ্যে। এদেরই মুখে শুনে শুনে রুমানীয়, বুলগারীয়, যুগোস্লাভ, হাঙ্গেরীয় চেক গ্রামীণ মানুষেরা পরবর্তীকালে নিজস্ব লোককাহিনী সৃষ্টি করেছে। এমন কি গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় সংগৃহীত বিশ্ববিখ্যাত জার্মান রূপকথা সংকলনের কাহিনীও এর ব্যতিক্রম না। অবশ্য এর দ্বারা আবার এই সিদ্ধান্ত করাও যুক্তিযুক্ত হবে না যে এইসব দেশগুলির নিজস্ব কোন লোকসাহিত্য নেই।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী কোন ক্রমেই ভুল করেননি। কারণ ভারতীয় মৌখিক রূপকথার যে কোন নির্ভরযোগ্য সংগ্রহ পড়লেই গ্রীসের রূপকথা ও ইউরোপের অন্যান্য অনেক লোককাহিনীর আশ্চর্য এক সাদৃশ্য সকলেরই নজরে আসবে। সরাসরি ইউরোপ থেকে আমদানীর সম্ভাবনা সর্বদা বিদ্যমান থাকলেও এ সমস্ত সাদৃশ্যের অধিকাংশের ব্যাখার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি রূপকথার প্রকৃতি ও ইতিহাসের বিস্তৃত ও নিপুণ আলোচনা, সে-যুগে যা একেবারেই অসম্ভব ছিল। অধুনা আমরা অবহিত হয়েছি যে এক-এক ধরনের (Type) রূপকথা-মাত্রেরই নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে, যদিও সে ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় কোনক্রমেই আমাদের জানা নেই। দীর্ঘদিন মুখে মুখে রয়েছে এবং ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ হয়নি বলেই এসব মৌখিক-রূপকথাগুলিকে সাম্প্রতিক বলতে হবে, এ চিন্তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। বরং এমন এক পুরণো মৌখিক ঐতিহ্যধারায় প্রতিষ্ঠিত যাতে এরা ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন

যুগের লিপিবদ্ধ রূপকথা অপেক্ষাও প্রাচীনত্বের পর্যায়ে পড়ে, সে কথা সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা দরকার। প্রাচীন যুগের লিপিবদ্ধ রূপকথাগুলিও, তা জাতক বা তার অনেক পরের কথাসরিৎসাগর যা থেকেই নেওয়া হোক না কেন, তারাও নিশ্চয়ই পূর্বতন কোনও মৌখিক রূপকথার উপকরণের ভাণ্ডার থেকেই সংগৃহীত হয়ে থাকবে। কাজেই আমাদের বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন পণ্ডিতব্যক্তির কাছে গা-জুরি মনে হতেও পারে। স্বভাবতই তাঁদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, পঞ্চাশ কি একশত বৎসর পূর্বের সংগ্রাহকের লিপিবদ্ধ বাংলা বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের রূপকথাগুলি কি করে নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে প্রতিপন্ন দু'হাজার বছরের প্রাচীন জাতকের ন্যায় রূপকথাসমূহ থেকেও প্রাচীনতর হতে পারে?

এখানেই আমরা লোকায়নের উপকরণসমূহের জটিলতম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি। কেবলমাত্র সমসাময়িক সাক্ষ্যপ্রমাণাদির উপর নির্ভর করে এসব কাঁচামালের পর্যালোচনা চলে না। এদের ইতিহাস অনুশীলনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধ হ'ল হাঁড়ি-কলসী-হাতিয়ার ইত্যাদি পুরাতাত্ত্বিক বস্তুর ন্যায় এরা কখনও বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে অবস্থান করে না। কাজেই প্রাচীনতম ইতিহাস থেকে এদের কেবল পরোক্ষভাবেই জানা যেতে পারে, আর জানা যায় ঐতিহাসিক উপকরণসমূহের উপর এদের সুস্পষ্ট প্রভাব বিচার করে। অর্থাৎ একটা বিশেষ যুগের উচ্চতর সংস্কৃতির নব নব রূপায়ণের মধ্য থেকেই সেই দেশের অতীত লোকায়নের উপকরণসমূহ অনুসন্ধান করে নিতে হয়। সেই জন্যেই আধুনিক লোকায়ন-চর্চায় পুরাতত্ত্ব বিভাগ অন্তর্ভুক্ত চারুকলা-সমালোচনা পদ্ধতি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সুদূর পুরাকালে কয়েকজন রাজা ও অভিজাতের নামের সঙ্গেই মাত্র আমরা পরিচিত বলে যে সে-যুগের অগণিত অজ্ঞাতনামা জনসাধারণের কোন অস্তিত্বই ছিল না একথা যেমন বলা চলে না, তেমনি অতীত যুগের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতাকে মোটেই তার অনস্তিত্বের প্রমাণরূপে উল্লেখ করা যায় না। ঐতিহাসিক ঘটনা ও উপকরণাদি সর্বদাই স্বাগত; কিন্তু ঐতিহাসিক উপকরণের পারম্পর্যতার ফাঁক থেকে কখনই এ-যুক্তি অবতারণা করা চলে না যে এমন যুগ থাকতে পারে যার কোন ইতিহাস নেই। তবে একটি বিষয়ে স্থির নিশ্চিত

যে, এ-সব পারম্পর্যহীনতার ফাঁক পূরণের জন্য প্রচুর পরিশ্রম প্রয়োজন, আর সেইজন্য রূপকথার ইতিহাস আলোচনা খুবই আয়াসসাধ্য।

ইতিহাসের অতলস্পর্শিতার কথা ছেড়ে দিলেও, ভারতের ন্যায় এক বিরাট দেশের বিশাল ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের কথাও স্মরণ করা আবশ্যক। চিরায়ত ভারততত্ত্ব গবেষণায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস যে প্রভূত পরিমাণে উপেক্ষিত তার একটিমাত্র সহজ কারণই হল যে, যে-সব লেখ্য-সাহিত্যিক উপকরণের উপর এ-সব গবেষণার সকল প্রয়াস নিবদ্ধ ছিল তারা উচ্চতর সাংস্কৃতিক তলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ হারিয়ে একটা পিণ্ডাকৃতি একীভূত রূপ গ্রহণ করেছিল। অথচ একটু গভীরে অনুপ্রবেশ করলেই বুঝতে অসুবিধে হবে না যে কি রাজনৈতিক কি সামাজিক কোন ক্ষেত্রেই সারাভারত জুড়ে এই একীভূত রূপ সম্ভব নয়। উচ্চতর সংস্কৃতির এই যেখানে অবস্থা সেখানে লোকসংস্কৃতিকে চিনে নিতে আমাদের কোন অসুবিধেই হয় না। কারণ লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গভীর এক আঞ্চলিকতার স্পর্শ; এই আঞ্চলিকতা একাধারে যেমন এর বলিষ্ঠতার পরিচায়ক, তেমনি এর দুর্বলতার নিদর্শনও বটে। সকল লোকসংস্কৃতিই পরস্পরের সঙ্গে সাধারণভাবে সম্পর্কিত হলেও নির্দিষ্ট লোকসংস্কৃতির উৎকর্ষ নির্ভর করে তার আঞ্চলিকতার ছাপ, একটি নিটোল স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষেত্রে কোন কোনটির অগ্রাধিকারের উপর। লক্ষ্য করা গেছে যে, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক একটা লোকসংস্কৃতি যুগের পর যুগ একেবারে পাশের গ্রাম থেকেও স্বতন্ত্র এক অস্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করে চলেছে। বাংলার বিভিন্ন জিলা বা অঞ্চলের পোড়ামাটির পুতুলের বৈচিত্র্যের দিকে তাকালেই এ পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে।

কিন্তু রূপকথার ক্ষেত্র একটু স্বতন্ত্র। ভারতের অধিকাংশ মৌখিক-রূপকথা কয়েকটি মাত্র গণ্ডীবদ্ধ অঞ্চল থেকেই সংগৃহীত; কিন্তু কাঠামো বা বিন্যাসে এদের অনেকগুলিতেই এমন যথেষ্ট সুচারু বর্ণনা দেওয়া নেই যাতে এদের প্রত্যেকটির উৎসস্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা জন্মাতে পারে। এই জন্যেই শ্রীমতী স্টোক্স-এর এমন গুরুত্বপূর্ণ রূপকথার সংকলনটি (Miss M. Stokes: Indian Fairy Tales. Ellis & white, London, 1880)

পাঞ্জাবী লোককাহিনীরূপে পরিগণিত; অথচ মহান ফরাসী লোকায়নিক কসৃক্যা ইতিমধ্যেই এদের অধিকাংশেরই বাঙালী চরিত্র আবিষ্কার করেছেন (M. Emanuel Cosquin : Contes populaires delorraine, Paris 1886, 1890)।

রূপকথার স্থান কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যার সৃষ্টি করেছেন এবং করছেন শিশু সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদরা। শিশুদের শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্যে কিংবা নিছক মাধুর্য সৃষ্টির জন্য রূপকথা রচনা করতে গিয়ে এঁরা নিজেদের অজ্ঞাতেই এমন এক অপকর্ম করছেন যা চিরদিনের জন্য বহু মৌখিক-রূপকথাকে ইতিহাসের অতলে সমাহিত করে দিচ্ছে। এঁরা যতই সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হ'ন না কেন, ভারতের সকল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত রূপকথা সঞ্চয় করে একটিকে অপরের সঙ্গে মিলিয়ে এবং ইচ্ছেমত সংশোধন করে তাদের সব স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বিলোপের পর 'ভারতের রূপকথা' এই অতি সাধারণ শিরোনামায় প্রকাশ করছেন। [এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এ দেশের বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি থেকে শুরু করে আজকের সাধারণ শিশু সাহিত্যিকেরা পর্যন্ত বহু বিদেশী রূপকথা উপকথাকে দেশীয় পোষাকে সাজিয়ে উপস্থিত করেছেন। সতর্কতার অভাবে এরা বাংলার সম্পদ বলে গৃহীতও হচ্ছে। দ্রষ্টব্যঃ "ভুবনের মাসী," বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, cf. the young Thief and his mother, Fable No 44, The Fables of Aesop, Ed. by Joseph Jacobs. London 1925; হারাধনের দশটি ছেলে, হাসিখুশী ১ম ভাগ যোগীন্দ্রনাথ সরকার, cf. Ten little nigger, Negro song of USA; ঠাকুরমার ঝুলি: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, দেবসাহিত্য কুটির cf. Grimms' Fairy Tales.] এই সব বিকৃতির দরুণ আজ আর এই সব রূপকথার প্রথম মৌখিক প্রকাশের সূত্র উদ্ধার সহজসাধ্য নয়। মুখে মুখে বলা ভারতের মৌখিক রূপকথার বিশদ অনুশীলনের কাজে এরা আজ একেবারেই মুল্যহীন হয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই আঞ্চলিক রূপ অস্পষ্ট করে এদের উপরে এমন এক সাধারণ ভারতীয় চরিত্র আরোপ করা হয়েছে যা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট হবার পূর্বে বস্তুতই এইসব রূপকথায় ছিল না। এসব রূপকথাকে যত

বিরাট শিল্পকৃতি বা শিক্ষার সহায়ক বলে মনে করা হ'ক না কেন, এগুলি নাড়াচাড়া করবার সময় গবেষকদের চরম সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। গভীর মনোনিবেশ সহকারে এই পদ্ধতির অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, অতীত যুগে যেভাবে লোকায়নিক উপকরণসমূহের বিকৃতি করা হয়েছিল আজও সেই প্রক্রিয়া একই ধারায় চলেছে। উচ্চতর শিল্পকৃতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে সর্বদেশেই মানুষের উন্নত সমাজগুলি খাঁটি লোকসংস্কৃতিকে নূতন ছাঁচে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করে। কাজেই দেখা যায়, গবেষকদের যে কেবলমাত্র অতীতের উপকরণ নিয়েই বিব্রত হতে হয় তা নয়, সমকালীন উপকরণের প্রতিকূলতাও তাদের কম অতিক্রম করতে হয় না। এইসব বিভিন্ন কারণে ভারতের যে কোন অঞ্চলের রূপকথার সঠিক ঐতিহাসিক সময়, ভৌগলিক অবস্থান ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুবই আয়াসসাধ্য। এইসব সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূল অবস্থার কথা মনে রেখেই আমাদের বাংলার রূপকথা **(Bengalisch Marchen)** অনুশীলনে অগ্রসর হতে হয়েছে।

বাংলার রূপকথার সার-সংক্ষেপ করতে গেলে প্রথমেই এর একটি বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে ওঠে; ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মৌখিক-রূপকথা এবং লেখ্য-চিরায়ত সাহিত্য-সংগ্রহে জন্তু-কাহিনীর **(beast tales)** যে অতুলনীয় সম্পদ বিদ্যমান এতে কিন্তু তার আপেক্ষিক অনটন লক্ষ্যণীয়। আমাদের এই বক্তব্যকে যেন এই বলে ভুল করা না হয় যে বাংলার রূপকথায় কোন জীবজন্তুর উল্লেখ নেই বা তারা সেখানে নগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ব্যাপার মোটেই তা নয়; বরং বাংলা রূপকথায় জীবজন্তুরা এমন এক একটি গল্পের ধারায় **(Tale Type)** আত্মগত যেখানে মানুষ ও অপ্সরাগণ তাদের সঙ্গে সমভাবে কাহিনীর মর্ম-বিন্দুতে অংশভাগী। ধারা-সংগ্রহের পরিভাষায় এর অর্থ হ'ল, অপেক্ষাকৃত কম বাংলা রূপকথাই প্রথম ৩০০টি ধারার মধ্যে পড়ে, এদের অধিকাংশেরই শুরু ৩০০ থেকে। এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ বাংলা লোক-কাহিনীই খাঁটি রূপকথার অন্তর্ভুক্ত [এখানে ধারা-সংখ্যার যে উল্লেখ করা হয়েছে তা **Aarne/Thompson**কৃত **the Types of the Folktale, Helsinki, 1964** অনুসারী]। ডরোথী এ. এল. স্পীডের একটি মন্তব্য এ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৩৫ সালে ইণ্ডিয়ান কালচার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে

তিনি বলেছেন যে, পাশ্চাত্ত্য জগতে ভারতের বিরাটতম দান হ'ল তার জীবজন্তুর কাহিনীগুলি। ভারতীয় ও ঈসপীয় ধারার জীবকথাগুলির মধ্যে পার্থক্য টেনে তিনি বলেছেন যে ঈসপীয় ধারায় জীবজন্তুরা জীবজন্তুর ভূমিকাই অনুসরণ করেছে, আর ভারতীয় ধারায় এরা মানুষের মত আচরণ করেছে। ভারতীয় ধারা বলতে শ্রীমতী ষ্টীডের কথার তাৎপর্য হ'ল, মানব-সম্পর্কের সামাজিক বিধানগুলি জীবজগতে আরোপিত হয়েছে, আর তার ফলে জীব-জীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি ঐতিহাসিক ধারার মানবীয় পশ্চাদপট রচিত হয়েছে।

ষ্টিডের বক্তব্যের গভীরতাকে অস্বীকার না করেও একটি কথা বলা দরকার, ভারতীয় রূপকথাই যে এক্ষেত্রে একেবারে অনন্য তা কোনক্রমে বলা চলে না। আফ্রিকান বা আদিম আমেরিকান রূপকথাগুলিতেও প্রায়ই জীবজন্তুকে মানুষের মত কথা বলানো বা আচরণ করানো হয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে একটি বিরাট ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। ঐ ধারার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়, আফ্রিকান বা আমেরিকান রূপকথাগুলিতে যেখানে আদিম কৌম-সমাজের (Primitive Tribal Society) ছাপ পাওয়া যায়, ভারতের রূপকথাগুলিতে সেখানে জীবজন্তুকে উন্নত শ্রেণী-সমাজে (Class Society) সংস্থাপন করা হয়েছে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই ধারার ভারতীয় রূপকথাগুলি ইতিহাসের বিচারে পরবর্তীকালের। ডরোথী ষ্টিডের মতে, গ্রীক উপকথাগুলিতে জীবজন্তুরা যদি জীবজন্তুর মতই আচরণ করে তাহলে এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ সূত্রের ব্যতিক্রম বৈ আর কিছু নয়, যা আমরা ভারতীয় ও অভারতীয় সব রূপকথাতেই পেয়ে থাকি। এমন কি ভারতীয় চিরায়ত সাহিত্য-ধারাতেও যদি পুরণো লোকায়ত-ধারার ন্যায় জীবজন্তুকে মানুষের সঙ্গে আত্মগত করার পথ বিসর্জন না দিতে পেরে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে ভারতের উচ্চতর শিল্পকৃতির উপরে তার লোকসংস্কৃতির প্রভাব কি প্রচণ্ড।

যদি উল্লিখিত বিভিন্ন বিভাগের একটি তুলনামূলক ঐতিহাসিক পারম্পর্য বিচার করতে হয় তাহলে আমরা তাকে নিম্নলিখিত ছকে উপস্থাপিত করতে পারি [এই ছকটি আমার শিক্ষক প্রখ্যাত জার্মান পুরাতাত্ত্বিক ও লোকায়নিক

অধ্যাপক ডঃ হাইন্‌শ মেডে-কৃত]

১) প্রাচীনতম উপকথাগুচ্ছঃ কৌমধারার সমাজ প্রভাবিত জীবজন্তুর গল্প। এই বিভাগে পূর্বোল্লিখিত আফ্রিকান আমেরিকান জন্তুকাহিনী ছাড়াও কৌম ধারার ভারতীয় কাহিনীগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

২) উন্নততর সমাজের উপকথাঃ ভারতীয় মৌখিক রূপকথা। বাংলার রূপকথাগুলিকে এই বিভাগে ফেলা যায়। এখানে জীবজন্তুর জীবনে উন্নততর সমাজের চিত্রের প্রতিফলন স্পষ্ট।

৩) ধর্মীয় ও নীতিকথাঃ এই বিভাগ ভারতের অধিকাংশ লেখ্য সাহিত্যিক রূপকথা নিয়ে গঠিত। এরা সংস্কৃতিগতভাবে পরিমার্জিত এবং এক উন্নত সমাজের সামাজিক কাঠামোর রীতিনীতি ও ধর্মের অনুশাসনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। তবুও চতুর্থ বিভাগের চেয়ে প্রকৃত লোকশিল্পের সঙ্গে এদের ব্যবধান অনেক কম।

৪) মনুষ্য সমাজ থেকে পৃথকীকৃত উপকথাঃ প্রকৃতি রাজ্যের জন্তু জীবন থেকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পৃথকীকৃত মানব সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সর্বাপেক্ষা উন্নত কাহিনীসমূহ। ঈসপ ইত্যাদির গল্পগুলি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

জীবজন্তুর কাহিনীগুলি এ রকম চারটি বিভাগে বিভক্ত করলেও পরবর্তীকালের ইউরোপীয় রূপকথায় আমরা ভারতীয় (বিভাগ-২) এবং গ্রীক (বিভাগ) উভয় ধারার প্রভাব সম্বলিত দুইটি সমান্তরাল ঝোঁকই দেখতে পাই। জার্মান রাইনেক ফুক্‌স (Reineke Fuchs) উপকথাগুলিতে (শেয়ালের গল্প), বিশেষ করে গয়টের প্রতিভায় উদ্ভাসিত সংগ্রহে, আমরা এই দুই ধারার একটা অপূর্ব মিশ্রণও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানেও উন্নততর সমাজ-পরিচয় সম্বলিত ভারতের রূপকথা অধিক প্রেরণা জুগিয়েছে বলে মনে হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দুটি সিদ্ধান্ত সহজেই করা যায়: [১] ভারতের মৌখিক রূপকথাগুলির আপেক্ষিক বয়স; [২] ইউরোপীয় রূপকথার উপর ভারতীয় রূপকথার প্রভাব। ভারতের মাটিতে ঐতিহাসিক

প্রক্রিয়ার যে ধারা সুদূর অতীতে চার হাজার বৎসর অবধি অনুসরণ করা যায় (অন্তত হরপ্পা যুগ অবধি) ইউরোপে একমাত্র গ্রীস ছাড়া আর কোথাও তার তুলনা মেলা ভার। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রীসের সঙ্গে হরপ্পার যে আসমান জমিন ফারাক তাও আমাদের নজর এড়ায় না। সামাজিক উন্নতির শিখরে উঠে গ্রীস ক্রমেই লোকসংস্কৃতির পথ ছেড়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পথে যাত্রা শুরু করে; কিন্তু ভারতে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া লোক-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের সাম্প্রতিক যুগ অবধি প্রসারিত। ভারতীয় মৌখিক রূপকথাগুলি একই সঙ্গে তাই এখানকার সাহিত্যিক রূপকথা সংগ্রহের তুলনায় প্রাচীনতর আবার তাদের পরবর্তীও বটে। চার হাজার বছর আগের সামাজিক পরিবর্তনসমূহ ভারতীয় রূপকথাকে সামাজিক অগ্রগতির এই বিশিষ্টতা দান করেছে, যা বাংলার রূপকথায় সবচেয়ে সার্থকভাবে পরিস্ফুট। এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই বাংলার রূপকথা এক গভীর বৈপ্লবিক মানবিকতায় ভরপুর হয়ে রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, বহু পরবর্তীকালে পরিমার্জিত ও পাশ্চাত্যের (বিশেষত পারসিক ও কিয়দংশে গ্রীক) উন্নততর সমাজ-প্রভাবিত ভারতীয় সাহিত্যিক-রূপকথার ধারাসমূহ একেবারে ভূমধ্যসাগরের তীর অবধি রপ্তানী হতে শুরু করে এবং ইউরোপ পরোক্ষভাবে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির প্রভাবাধীন হয়।

দীর্ঘকালব্যাপী একাদিক্রমে বৈদেশিক সংঘাতের ফলে ভারতের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠিক তদ্রূপ ঘটেনি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে উত্থান ও অবরোহনের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট থাকলেও ভারতের লোক-সংস্কৃতি চিরকালই বৈদেশিক প্রভাব-বিরোধী এক দৃঢ় ও স্থায়ী রূপ ধারণ করেছিল। এই বৈদেশিক প্রভাব-নিরোধের জন্য যে মূল্য ভারতকে দিতে হয়েছে তাকেই বিদেশী ইতিহাসবেত্তাগণ ভারতের ইতিহাস-বিরোধী মনোভাব বলে বিকৃত করেছেন। কিন্তু তাঁরা দেখতে পাননি যে ইতিহাস থেকে এই পশ্চাদ্বর্তন বিদেশী সংঘাত ও প্রভাব থেকে একটি উন্নত সংস্কৃতির আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এই আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল বলেই যুগে যুগে ভারতীয় ধারার রূপকথা তাদের অন্তর্নিহিত মানবতাবোধ ও বৈপ্লবিক চরিত্রের জন্য সারা বিশ্বে প্রাধান্য লাভ করতে পেরেছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের মধ্যে সাংস্কৃতিক নিবিড়তা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে।

ভারতীয় রূপকথার এই বিশিষ্ট পরিবেশে বাংলা রূপকথার আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই নজরে আসে মানুষ, জীব-জন্তু ও অপ্সরাদের অবাধ রূপ পরিবর্তন (অথবা অর্ধ-মানব, অর্ধ-দেবতা রূপগ্রহণ)। প্রধানত রাক্ষস, ভূত, দেবলোকের রমণী বা অপ্সরা এবং দৈবশক্তিসম্পন্ন কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাংলা রূপকথায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। এদের আবাস ও আচরণ সর্বদাই মানব সমাজের সঙ্গে তুলনীয় এবং একটা সুচির পার্থক্য বিভেদের প্রাচীর গেঁথে রেখেছে: মানব-জগতের নায়কগণ এদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, তাদের আক্রমণ সয়ে, আবার কোন অভীপ্সিত কার্যে তাদের সাহায্যও লাভ করে থাকে। বাংলা রূপকথায় এই দুইটি স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব থাকলেও এদের সঙ্গে তুলনীয় কিংবা এদের কোন একটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিশুদ্ধ জন্তুজগতের অস্তিত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। জীবজন্তুরা যে মানব জগতে ঘুরে বেড়ায় তা হয় মানুষের নয় পরীর আকৃতিতে। তারা দেখা দেয় কোন বিকলাঙ্গ মানুষ অথবা মানুষের অতি-পরিচিত কোন একটি জীবের অবয়বে পরী হয়ে। এসব দেখে মনে হতে পারে যে কোন এক প্রাচীন ও স্বয়ংপ্রধান জীবজগৎ পরী ও দৈত্যদানোর জগতে ক্রমশঃ বিলীন হয়ে গেছে এবং ঐ প্রথমোক্ত সমাজের যা কিছু ধ্বংসাবশেষ ছিল তা এই নূতন দৈত্য-দানোর জগতে কিংবা নিজেদের সঙ্গী মানুষের সঙ্গে মিশে গেছে। এখানেও আবার বাংলা রূপকথাগুলির ঐতিহাসিক অবস্থানের নির্দেশ মেলে; এরা হল আদিম কৌম-স্তর ও সুস্পষ্ট পৌরাণিক ও ধর্মীয় গণ্ডী দ্বারা সুনির্দিষ্ট পূর্ণবিকশিত শ্রেণীসমাজের মাঝামাঝি সময়ের। একথাও বলা চলে যে বাংলার এইসব মৌখিক রূপকথা কতকটা সাবেকী ও অপ্রচলিত ধরণের; ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রূপকথার সঙ্গে এখানেই এর মৌলিক পার্থক্য। এই সাবেকীয়ানার (archaic) পরিচয় পাওয়া যায় আর একটি বিষয় থেকে। লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে বাংলা রূপকথা একদিকে যেমন উচ্চতরশ্রেণীর উন্নত সাহিত্যধারার প্রভাব থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত, তেমনি অন্যদিকে তার চারিপাশের সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিদের রূপকথা জগতের সঙ্গে গভীর শ্রেণীসম্পর্কে একাত্ম।

সাঁওতালদের কথা এসে পড়ায় একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। সাঁওতালী ও বাংলা রূপকথার তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে অনেক মিল নজরে

পড়বে ; কিন্তু সে সকল মিলে দেখা যায় যে বাংলা উদাহরণগুলি বুঝতে সুবিধে হয় বেশী এবং তাদের রচনা-শৈলী অনেক বেশী নিটোল। সাঁওতালী রূপকথাগুলি এদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত, কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক আচার-আচরণের জন্য এদের পক্ষে সম্ভবত বাংলা রূপকথা জগতের সূক্ষ্ম বিষয়বস্তুগুলি আত্মস্থ করা সম্ভব হয়নি ! কেউ কেউ মনে করেন যে বাংলা রূপকথা ঐ সব পার্শ্ববর্তী রূপকথা থেকে উদ্ভূত ; কিন্তু তা মোটেই সম্ভব নয়। বাংলার মৌখিকরূপ কথায় আদি শ্রেণীসমাজের গ্রামীণ পরিবেশের যে নিটোল ছবি পরিস্ফুট তার সঙ্গে বর্তমান কালের অতি অগ্রসর সাঁওতাল জীবনও থাপ খায় না। অতীতে এই উভয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য নিশ্চয়ই আরও বেশী ছিল।

কিন্তু দীর্ঘদীন ধরে উভয়ের এই ঘনিষ্ঠতায় অন্য একটি ফললাভ হয়েছে মনে হয়। সুদুর অতীতে আদিম উপজাতীয় শিকারীদের জীবনে চারিপাশের গাছপালা ও জীবজন্তু যেমন মানস-গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছিল ঠিক তেমনি-ভাবেই এইসব আদিম উপজাতীয় সমাজগুলি তৎকালীন গ্রামীণ বাসিন্দাদের কোন কোন দিক থেকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। বাংলা রূপকথার দৈত্য-দানব ও অপ্সরাজগতের ক্রমপরিবর্তনশীল ধারণার মূলে হয়তো তারা আদর্শের কাজ করেছিল। পার্শ্ববর্তী কৃষক প্রতিবেশীদের প্রতি এই সব উপজাতিদের নিয়ত পরিবর্তনশীল মৈত্রী বা বৈরীভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকতে পারে বাংলার বিভিন্ন বিপরীতধর্মী মৌখিক রূপকথার ধারায়, যাতে কখনো রাক্ষসেরা হিংস্র হলেও বন্ধুরূপে চিত্রিত, আবার কখনো রক্তপিপাসু এমন ভয়াল ভয়ঙ্কররূপে অঙ্কিত যে পশুশক্তি কিংবা চাতুর্যপূর্ণ কৌশল ছাড়া তাদের দমন করা যায় না। তবে মনে রাখা দরকার, এই জাতীয় প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণার পূর্বে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়।

● রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষক

ক লি কা তা।

লোকভাষা

[Folk dialect]

সুধীর কুমার করণ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা দু'হাজার সাতশো ছিয়ানব্বুই। ডায়ালেকট্ বা উপভাষার সংখ্যা যুক্ত হলে ভাষার সংখ্যা আর ও অনেক পরিমাণে বেড়ে যাবে। এই কয়েক হাজার ভাষার একহাজার ভাষাই আমেরিকার রেড্ইণ্ডিয়ানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা। আফ্রিকার নিগ্রো অধিবাসীদের ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা পাঁচশো। আরও পাঁচশো ভাষায় কথা বলে এশিয়া এবং প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের ছোট ছোট জন গোষ্ঠী।

ভাষার প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসারে ঐ কয়েকহাজার ভাষাই "ভাষা" বা ল্যাংগুয়েজ—অর্থাৎ মনোভাব প্রকাশের বাক্-বাহন। তবু, মাত্র তেরোটি ভাষাই ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে অগ্রগণ্য ভাষা। ভাষাতত্ত্বের নিরিখে ভাষার প্রধান-অপ্রধান ভেদ থাকার কথা স্বীকৃত নয়। তবু মাত্র তেরোটি ভাষার-১ দিকে তাঁদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, – তার কারণ উক্ত কয়েকটি ভাষায় বাচক জনসংখ্যা। এই তেরোটি ভাষা তেরোটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এদের মধ্যে কয়েকটি ভাষা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রসার লাভ করেছে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রসারণশীলতা এবং প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ইংরাজীভাষাই প্রথম স্থানের অধিকারী। তারপর যথাক্রমে ফরাসী, স্পেনীয়, রুশীয় এবং জার্মান ভাষায় অধিকার।

---

*১ জনসংখ্যার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ভাষাগুলি পর্যায়ক্রমে উল্লেখযোগ্য : চীনা। ইংরাজী। হিন্দুস্তানী (হিন্দী এবং উর্দু সহ)। রুশী। স্পেনীয়। জার্মান। জাপানী। ফরাসী। ইন্দোনেশীয়। পোর্তুগীজ। বাংলা। ইতালীয়। আরবী।
এ ছাড়া আরও শতাধিক ভাষার নাম উল্লেখযোগ্য যাদের বাচক সংখ্যা অনেক। ভারতীয় ভাষাবর্গের তেলেগু, বিহারী, তামিল, মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, রাজস্থানী, কন্নাড়ী, মালয়ালম্, ওড়িয়া, সিন্ধী, পাহাড়ী, অসমীয়া প্রভৃতি এর মধ্যে পড়ে।

প্রধান তেরোটি ভাষার মধ্যে চীনা, জাপানী, হিন্দুস্তানী, ইন্দোনেশীয়, বাঙলা, আরবী প্রভৃতি ভাষা মূলতঃ দেশের সঙ্গেই সংযুক্ত। চীনা ভাষা কিছু পরিমানে প্রসারলাভ করেছে মালয়-ইন্দোচীন-থাইল্যাণ্ডে। আরবী ভাষীজনের সংখ্যা তুলনায় কম হলেও মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের বাহন হিসাবে এ ভাষার প্রভাব আছে মধ্যপ্রাচের দেশগুলিতে, উত্তর আফ্রিকায়, রুশ-ভারত-পাকিস্তান-আফগানিস্থানে।

এর মধ্যে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে এই তেরোটি প্রধান ভাষার মধ্যে চীনা, জাপানী, ইন্দোনেশীয় এবং আরবী ভাষা এক একটি একক ভাষা-গুচ্ছের প্রতিনিধি। অন্য সমস্ত ভাষাই একটিমাত্র মূলভাষার সঙ্গে জ্ঞাতিসূত্রে আবদ্ধ—যার নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা।

এইসব ভাষার ডায়ালেক্ট্ বা উপভাষার সংখ্যাও অনেক।

বস্তুতঃ এই তথ্য মেনে নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে যে, পৃথিবীর সব ভাষারই উপভাষা আছে। কোন কোন ভাষার উপভাষা সংখ্যায় কম। আবার কোন কোন ভাষার উপভাষাভাষী জনসংখ্যা কোন কোন ভাষার জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। —২

॥ ২ ॥

ভাষা এবং উপভাষার ভেদ যখন স্বীকৃত হয়েছে, তখন বিধিগত ভাবে উক্ত দুটি শব্দের সংজ্ঞার তারতম্যও নির্ধারিত হয়েছে।

সাধারণতঃ যদি এই কথাই বলা যায় যে, যে-বাক্রীতিকে অবলম্বন করে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, তারই নাম ভাষা,—তাহলে ভাষা এবং উপভাষাকে পৃথক করে দেখা যায় না। তাই ভাষাতাত্ত্বিকগণ চরিত্র বিচার করে ভাষা এবং উপভাষার লক্ষণ নির্ধারিত করেছেন।

আচার্য সুনীতিকুমার ভাষার এই সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন—(ভাষা প্রকাশ বাংলাব্যাকরণ) "মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত,

*২ চীন দেশের কোন কোন উপভাষায় এত বেশীসংখ্যক লোক কথা বলে যে, সেগুলিকে ভাষা নামেও অভিহিত করা যেতে পারে।

তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।" বলাবাহুল্য সংজ্ঞাটি ব্যাকরণ-শাস্ত্রসম্মত হলেও ভাষাতত্ত্বসম্মত নয়। ভাষাতত্ত্বের বিচার একটু অন্যধরণের। ভাষার সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি সূত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত।

(ক) ভাষা হচ্ছে সেই ধরণের বাক্‌বাহন, যা সরকারী ভাবে, জাতীয়ভাষা বলে গৃহীত।

(খ) ভাষা হচ্ছে সেই ধরণের বাক্‌মাধ্যম যাকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচিত হয়।

(গ) ভাষা হচ্ছে, ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি উপভাষার অন্যতম, বিশেষধরণের সুযোগ সুবিধালাভের ফলে যা' মর্যাদার আসন লাভ করেছে।

এই তিনটি সূত্রের মধ্যে প্রথম দুটি সূত্রের মধ্যে অ-পরিপূর্ণতা আছে। একটি মুলতঃ রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর বাহন, অন্যটি সাহিত্যিক এবং বিদগ্ধ দৃষ্টিভংগীর বাহন। প্রথম সূত্রটি গৃহীত হলে কোন কোন ভাষা ও ভাষানামের অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'তে পারে। বিহারে মৈথিলীভাষা সরকারী তালিকা-ভুক্ত নয়। অথচ মৈথিলী একটি সম্পূর্ণাঙ্গ ভাষা। দ্বিতীয় সূত্রটির মধ্যেও এক-দেশদর্শিতা বর্তমান। সাহিত্য এবং মননের বাহন নয়, এমন সব ভাষাই এই সূত্রের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায়। আফ্রিকা এবং আমেরিকায় অনেক উপজাতিক ভাষা আছে যার মাধ্যমে সাহিত্য রচনা করা হয় না।

তৃতীয় সূত্রটি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। উপভাষা নামে কথিত অনেক ভাষা ও ভাষার মর্যাদা লাভ করতে পারে। অতএব এই কথাই মেনে নেওয়া ভালো যে ভাষা হচ্ছে মনোভাব প্রকাশের বাক্‌বাহন যা কতকগুলি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ এবং সেই নিয়মগুলি অভ্যাস করে একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষ পরস্পরের কাছে বোধগম্য হয়।৩

*৩ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Mario Pei বলেন—

Language is a set of rules tacitly agreed to and accepted by common consent of all the speakers.

খ্যাতিমান ভাষা-পণ্ডিত Otto Jespersen বলেন— পর পৃষ্ঠায়

কিন্তু তা'সত্ত্বেও ভাষা এবং উপভাষার ভেদ যখন স্বীকৃতসত্য তখন উপভাষার কিছু সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতেই হয়। প্রাথমিকভাবে মেনে নিতেই হয় যে এর কোন সরকারী স্বীকৃতি নেই এবং এর মাধ্যমে স্বীকৃত সাহিত্যও রচিত হয় না। বলা যেতে পারে, উপভাষা হচ্ছে, এক বিশেষ কথ্যভাষা যার অধিষ্ঠান কোন এক বিশেষ ভাষা অঞ্চলের কোন একটি ভৌগোলিক সীমানাভুক্ত; সাহিত্যিক সূত্রে প্রতিষ্ঠিত 'ভাষার সঙ্গে যার উচ্চারণগত, রূপগত এবং বাক্‌রীতিগত লক্ষণীয় পার্থক্য আছে এবং তা'সত্ত্বেও ভাষা নামে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশিষ্ট উপভাষার সঙ্গেও যার আত্মীয়তা এমনভাবে বিধৃত যে তাকে অন্য একটি বিশিষ্ট ভাষা রূপে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

লক্ষ্য করা গেছে কোন কোন ভাষার উপভাষার সংখ্যা বেশী নয়, আবার কোন কোন ভাষার উপভাষা অনেক। ইংরাজী ভাষাভাষীজনের মধ্যে উপভাষার সংখ্যা নানা কারণেই বেশী। কেবল ইংল্যাণ্ডের মধ্যেই তার সংখ্যা চল্লিশের ও বেশী। লণ্ডন নগরের নীচুতলার মানুষের 'কক্‌নী' ছাড়া ও এর মধ্যে আছে কর্নওয়াল-ডেভন-সমারসেট-নর্দাম্বারল্যাণ্ড, নরফোক, ওয়েল্‌স, প্রভৃতির উপভাষা।

একই শব্দের বিভিন্ন আঞ্চলিক বা উপভাষিক উচ্চারণ ইংরাজী ভাষাতেও যথেষ্ট।৪ আমেরিকায় প্রচলিত ইংরাজী ভাষাতেও আঞ্চলিকতার অস্তিত্ব আছে বলে, ভাষাবিৎগণ স্বীকার করেছেন।

॥ ৩ ॥

বাংলাভাষার কয়েকটি উপভাষার দিকেও পণ্ডিতেরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই উপভাষাগুলি প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক নামেও অভিহিত করা হয়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলাভাষার চারটি প্রধান উপভাষার কথা বলেছেন। তাদের নাম রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী ও কামরূপী। স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন মেদিনীপুরে দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের ভাষাকে 'সাউথ-ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গলী' বা দক্ষিণ-পশ্চিমী বাংলা নামে অভিহিত করেছিলেন। এই ভাষা সম্পর্কে

> **The language of a nation is the set of habits by which the members of the nation are accustomed to communicate with one another.**

পরবর্তী সময়ে বিশদ্ গবেষণা করা হয়েছে। আচার্য সুনীতি কুমার এই উপ-ভাষাকেও বাংলাভাষার অন্যতম উপভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইদানীং পশ্চিমসীমান্তবাংলার ভাষাকে 'ঝাড়খণ্ডী' নামে অভিহিত ক'রে গবেষণাকার্য হয়েছে।[৫]

উপরি-উক্ত পাঁচটি উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যথাযথ সুযোগ পেলে সেগুলি ভাষা-তে পরিণত হ'তে পারতো। এই সব উপভাষার মধ্যেও

---

*৪ উদাহরণ : ইংরাজী daughter শব্দের বিভিন্ন আঞ্চলিক উদাহরণ

Cornwall ..dafter.
Cumberland dowter.
Norfolk . darter.

ইংরাজী mother—

Cumberland.. mudder.
Devonshire.. meuther.
Northumberland muthor.

ইংরাজী heart—

Devonshire hort.
Lancashire . hert.
Northumberland hairt.

ইংরাজী crown

Cumberland Crwoun.
Lancashire...Creawn.
Northumberland . Croon.
Yorkshire . Crahn.

Mario Pei বলেন—

Some of the English dialects still use "thou" and "thee" instead of 'you', a practice which in America is followed only by a few conservative quakers. 'Thik' is Westfordshire dialect for "this"; Gloucestershire uses 'thak' for "that"; "hoo" is yorkshire dialect for "she", and it may be added that the Yorkshire speech is normally quite incomprehensible to the average American.

যথেষ্ট আঞ্চলিকতা বর্তমান এবং এক একটি অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলে সুবোধ্য নয়। প্রচলিত লোকবাক্য অনুসারে 'প্রতি পাঁচক্রোশে ভাষার পরিবর্তন' ঘটে। ভাষার মূল কাঠামোর না-হোক্ শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ কথার গুরুত্ব আছে। জেলাভিত্তিক উপভাষা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে একই জেলাতেও "আঞ্চলিকতা" বিশেষ ভাবেই বর্তমান।

সাধারণ চলিত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত "আমি যাবো না"—এই বাক্যটির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। লক্ষ্য করা যাবে বাংলাভাষী বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় এর রূপ দাঁড়াবে—

আমি যাবনি
আমি যাবুনি
আমি যাব নাই
আমি নাই যাব
আমি যামু না
আমি ন যাইম
আঞি ন যাঞিম্
আমি যাবা নি
মুই যাব না
মুই যাব নি
মুই যামু নি

"তুমি যাবে" এবং "তুই যাবি" এর আঞ্চলিক রূপ হবে,—তুমি যাবা, তুমি যাব, তুই যাবিস্, তুঁই যাবিস্, তুই যাবু, তু যাবি ইত্যাদি। 'বললাম'

---

*৫ ঝাড়খণ্ডী নামটি রাজনৈতিক বলে বর্জনীয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি উক্ত আঞ্চলিক ভাষাকে 'সীমান্তরাঢ়ী' নামে অভিহিত করি। কারণ রাঢ়ী উপভাষার সঙ্গে তার মৌলিক যোগসূত্র বর্তমান। অতএব রাঢ়ী উপভাষার একটি সাব্-ডায়ালেক্ট্ বা প্রত্যন্ত আঞ্চলিক উপভাষা নাম দিলে তার মর্যাদা কমে না। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে এই ভাষার মধ্যে লোকভাষার বহু বিশিষ্ট নিদর্শন রক্ষিত আছে।

শব্দের বিভিন্ন রূপ হবে, বললুম, বনুমু, বনুমুম্, বইলুলম, বলুলি, বন্নি ইত্যাদি।*৬

পূর্বরাঢ় ভূমির ভাষাই বর্তমানে বাংলাভাষা নামে কথিত। এই ভাষাই অন্য সমস্ত আঞ্চলিক বাংলাভাষীদের পোষাকী কথ্য ভাষা। এই ভাষাই পঠন-পাঠনের মাধ্যম হিসাবে গৃহীত। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও এই ভাষাই প্রযুক্ত হয়। মোটের উপর এ কথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে, এই বাংলাভাষাকে অধিগত করতে হয় বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহের জনগোষ্ঠীকে। এই ভাষার মাধ্যমেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমাগত মানুষের মিলিত সভায় মনোভাব প্রকাশ করতে হয় যে, কোন বক্তাকে। অতএব ভাষা-উপভাষার সূত্র ধরে 'ভাষা' বা "ল্যাংগুয়েজের" আর একটি বিশেষ লক্ষণ আমরা এভাবেও আবিষ্কার করতে পারি যে, যে উপভাষাটি তার স্বগোত্রের অন্য সমস্ত আঞ্চলিক মানুষের কাছে বোধ্য এবং গ্রাহ্য, সেই উপভাষার অন্য নাম ভাষা। দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে চট্টগ্রামের বা উত্তরবঙ্গীয় ভাষা, ভিন্ন গোত্রের মনে হতে পারে এবং এর বিপরীতেও তাই হতে পারে। এদের সকলের কাছেই কিন্তু সাধারণ গ্রাহ্য ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে রাঢ়ী উপভাষা, যার উপর ভিত্তি করেই 'বাংলাভাষার' উদ্ভব।

---

*৬ উত্তমপুরুষ 'আমি' শব্দের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ :

পশ্চিম রাঢ়ী—মুই, মুইরা, মোকে, মোহর ইত্যাদি

পূর্ব রাঢ়ী—আমি, আমরা, আমার, আমাদের, আমাকে, আমায় ইত্যাদি

দক্ষিণ-পশ্চিমী—আমি, মুই, আমান্নে, মোন্নে, মোরমন্কার, আমান্নেকার, মোরাধিনু, আমানু ইত্যাদি

বারেন্দ্রী—পূর্বরাঢ়ীর অনুরূপ

সীমান্তরাঢ়ী—হামি, হামরা, হামাকে, হাম্কে, আমি, হামদের ইত্যাদি

উত্তরবঙ্গীয়
(দিনাজপুর)—হামি হামরা হামার, হামাক্ ইত্যাদি

উত্তরবঙ্গীয়
(কামরূপী)—মুই, মই, মোঁ, হামি, মোক্ মোৎ, হামা, হামাক্ ইত্যাদি

পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম
(বাঙ্গালী)—মুই, আমি, মোরা, আমরা, মোর, আমার, আমাগো ইত্যাদি

পূর্ব দক্ষিণ বাঙ্গালী—আঁই, আওঁয়া, আঁয়া, আঁয়ার ইত্যাদি...

এ কথা অবিসংবাদিত রূপে সত্য যে, যে ভাষায় মনের চর্চা অধিক, সেই ভাষার প্রসার এবং উন্নতি ও অধিক। ভাষাচর্চার ফলে ভাষার শব্দসম্পদ বেড়ে যায়। মনোভাব প্রকাশের জন্য যে ভাষায় অনেক বেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়, সে ভাষা অনেক বেশী জীবন্ত এবং গতিশীল। যে ভাষা সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানচিন্তা প্রকাশের বাহন, সে ভাষার শব্দসংখ্যা ক্রমবর্ধিত হতে থাকে। এই ধরণের জীবন্ত এবং গতিশীল ভাষাই শিষ্ট ভাষা বা কালচার্ড ল্যাংগুয়েজ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ভাষাই হয় শিষ্টজন বা শিক্ষিত জনের কথ্য ভাষা।

সমাজে যেমন সাংস্কৃতিক স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায় তেমনি ভাষার মধ্যেও সাধারণ ভাবে কয়েকটি স্তরভেদ বর্তমান। প্রশস্তরূপে স্তরবিভাজনে ভাষার তিনটি রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এক—সাহিত্যিক ভাষা; দুই—শিষ্টজনের কথ্য ভাষা; তিন—গ্রামীন কৃষক শ্রমিক এবং অর্থ নৈতিক অসাম্যের ফলে অশিক্ষিত মানুষের কথ্য ভাষা।৭

সাহিত্যিক ভাষা মূলত: লেখ্য ভাষা, তাই তার চেহারাতে অলংকরণের প্রাচুর্য থাকে এবং নানাকারণে এ ভাষা কথ্যরূপে গৃহীত হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত কথ্য ভাষার দুটি রূপই ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রধান স্থানের অধিকারী হয়। শিষ্টজনের কথ্য ভাষায় আঞ্চলিকতার বিলুপ্তি ঘটতে থাকে এবং সে ভাষা বিভিন্ন উপভাষী অঞ্চলেও সাধারণ প্রচলিত কথ্য ভাষার পর্যায়ভুক্ত হ'তে থাকে শিষ্ট কথ্য ভাষা যে উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে উপভাষার মধ্যে ও দুটি অনিবার্য স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়, যার প্রথমটি হচ্ছে শিষ্টভাষার পর্যায়ভুক্ত এবং দ্বিতীয়টি গ্রামাঞ্চলের মানুষের কথ্য ভাষা। এর সঙ্গে জ্ঞাতিসূত্রে শিষ্ট-ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ট হলেও তার নিজের চেহারাতে গ্রাম্যতার ছাপ বেশ স্পষ্ট। মানসচর্চার প্রয়োজনে এই গ্রামীন ভাষা গৃহীত হয় না বলে সাংস্কৃতিক শিষ্টভাষার সঙ্গে তার পার্থক্য ঘটে যায়। উচ্চারণ রীতি এবং শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান বেশী ক'রে স্পষ্ট হয়।৮) বস্তুতঃ, গ্রামীন সমাজের সঙ্গে

*৭ ইংরাজী ভাষায় এদের বলা হয়—**Literary language, Standard Colloquial language** এবং **Colloquial Spoken.**

*৮ রাঢ়ী উপভাষায় (শিষ্ট) বলা হয় 'কোথায় যাবে?' 'আমি বোললাম'। 'সে যাবে না রাঢ়ী উপভাষার গ্রামাঞ্চলিক রূপ—কোজ্জাবে? আমি বোনুন্থ। সে যাবে নে ইত্যাদি।

নাগরিক বা নগরপুষ্ট শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বাক্‌রীতির তারতম্য দেখে ভাষার এই বিভাজন সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। যাঁরা কথ্য ভাষায় শিষ্টরীতির ব্যবহার করেন তাঁদের উচ্চারণ শুনে সহজে বোঝা যায় না, তাঁরা কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী; কেননা, বিভিন্ন অঞ্চলের শিষ্ট-শিক্ষিত জনকে এই ভাষায় কথা বলতে হয় বলে তাঁদের প্রত্যেককেই শিষ্টবাক্‌রীতি অধিগত করতে হয়। এই সাধারণ চলিত কথ্যভাষাকে যদি সাহিত্যরচনার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তা' হলে সাহিত্যের ভাষাতেও এই শিষ্টকথ্যরীতির প্রভাব নিশ্চয়ই পড়ে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভাষার স্তরবিভাজন পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় একই নিয়মে আবদ্ধ, তা নয়। বাংলার এবং উত্তর ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে যে স্তরগুলি লক্ষ্য করা যায়, তা' হয়তো ইংরাজী বা অন্য ভাষায় ঠিক সেইরূপে সুলভ নাও হতে পারে। ইংরাজী ভাষায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-ভাষা থাকলেও মূলতঃ ইংরাজীর শিষ্ট ভাষা হচ্ছে কিংস ইংলিশ; বাকী সব-ই পিপ্‌লস্ ল্যাংগুয়েজ।

বাংলার রাঢ়ী উপভাষায় (শিষ্ট) যে ধরণের স্তর বিন্যাস, সেই ধরণের স্তর বিন্যাস অন্যান্য বাংলা উপভাষায় নেই। তার কারণ রাঢ়ী ছাড়া বাকী সব উপভাষাই নিছক লোকভাষা। তার কোন শিষ্ট চেহারা নেই। কেবলমাত্র সামাজিক স্তরভেদের জন্য কিছু কিছু রীতি পার্থক্য লক্ষিত হয় মাত্র।

'বাংলাভাষার' স্তরবিন্যাসের সূত্র ধরে বাংলা উপভাষার বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। সাধারণ চলিত বাংলাকে মৌলিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে অন্য উপভাষাগুলিকে তার সাঙ্গীকরণের ক্ষেত্রে নিয়ে আসা অবাস্তব। এইসব উপভাষাকে নিছক 'লোকভাষা' বলাও কষ্টকর হয়ে ওঠে, কারণ—

অনেক উপভাষাই শিষ্ট-অশিষ্ট সকলেরই আঞ্চলিক কথ্য ভাষা। নগর জীবনে শুধু তার ব্যত্যয় ঘটে যায়।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে উপভাষাই লোকভাষা। কিন্তু সব উপভাষার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। উপভাষার ও স্তরভেদ আছে। রাঢ়ী উপভাষার সাধারণ চলতি রূপ আর আঞ্চলিক গ্রামীন রূপ ঠিক এক নয়। অন্যান্য উপভাষিক অঞ্চলেও উপরতলার সঙ্গে নীচের তলার প্রাত্যহিক ভাষার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই ইংরাজীতে যাকে বলা হয় colloquial

spoken তাকেই আমরা যথার্থ লোকভাষা নামে অভিহিত করতে পারি। গ্রামীণ, অশিক্ষিত জন সমাজের মধ্যেই তার অবস্থিতি। সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রাথমিক পর্যায়ভুক্ত কৃষক-শ্রমজীবী মানুষের প্রাত্যহিক ভাবপ্রকাশের বাহন এই লোকভাষাই ভাষার মূল বনিয়াদ। শিল্প চর্চার বাহন রূপে এর ব্যবহার নেই। কেবলমাত্র আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের এবং প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে স্বাভাবিক স্থান। এ ভাষায় কোন কৃত্রিমতা নেই। প্রকৃতির মতই এ ভাষা নিরাবরণ নিরলংকৃত এবং স্বচ্ছ। এ ভাষা কোন নির্দিষ্ট ব্যাকরণের গণ্ডী মানে না; প্রবাহমান লোকশ্রুতির উপরই তাঁর নির্ভরতা অধিক। লোকভাষার বাচক সচেতনভাবে কোন শব্দ ব্যবহার করে না; তাই অঞ্চলভেদে শব্দের তারতম্য ঘটতেই থাকে। লোকসমাজের মুখে মুখে শব্দের প্রসার ঘটতে থাকে; ব্যাকরণসম্মত রীতি-নীতি মেনে চলার জন্য এ ভাষা প্রস্তুত থাকে না। ব্যাকরণ শাস্ত্র পাঠ ক'রে লোকভাষা আয়ত্ত করা যায় না; একমাত্র লোক-সমাজের মানুষই স্বাভাবিকসূত্রে এই ভাষার অধিকার অর্জন করে। এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, কোন কোন লোকভাষার সাধারণ ক্রিয়ারূপ শব্দরূপ প্রভৃতি সঙ্গে পরিচয় ঘটলেই লোকভাষা আয়ত্ত করা যায় না। কারণ লোকভাগায় বাক্‌রীতি, শব্দ প্রয়োগ কিছুটা বাচকের নিজস্ব খেয়াল-খুশীর সঙ্গে জড়িত।৯

এই ধরণের বাক্‌রীতি, পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে পিজ্‌ন্ (pidgin) ইংরাজীর উদ্ভব ঘটিয়েছে।

॥ ৪ ॥

লক্ষ্য করা যাচ্ছে শিষ্ট উপভাষা নগরকেন্দ্রিক এবং লোকভাষা গ্রাম-কেন্দ্রিক। এ ক্ষেত্রে বাকরীতির পার্থক্য বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। নগরপুষ্ট মার্জিত, শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের দৈনন্দিন কথ্য ভাষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

*৯ ইংরাজী লোকভাষায় শোনা যায় —

aint=I am not

It's me=It is me.

Who did you see—Whom did you see ?

বিবরনের ফল। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিবর্তন ও ঘটতে থাকে। লোকভাষার ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন ঘটতে থাকে; তবে তার গতি মন্থর। তার মৌলিকতা সহসা বিনষ্ট হয় না। ১০ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে উইলিয়ম কেরী তাঁর কথোপকথন নামক গ্রন্থে লোকভাষার বেশ কিছু নিদর্শন লিপিবদ্ধ করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে শিষ্টভাষার নিদর্শন ও রক্ষিত আছে। শুধু তাই নয়, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের লোকে কি ধরণের শব্দ এবং ইডিয়াম বা বাক্‌ধারার প্রয়োগ ক'রে সে বিষয়েও তিনি বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। গ্রামের নীচুতলার শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের বাক্‌রীতির নিদর্শন থেকে যথার্থ লোকভাষার চরিত্র সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়।১১ কেরী এ কথা ও জানতেন যে গ্রামের মেয়েদের ভাষা পুরুষদের ভাষার সঙ্গে ঠিক এক নয় — "Women speak a language considerably differing

---

*১০ সাধারণ চলিত কথ্য ভাষার নিদর্শন :—

দোকানে তেল কিনতে গেলুম। দোকানের মধ্যে ঢোকে, কার সাধ্যি। লোকে লোকারণ্য। ভীড় ঠেলে ঢুকতে হলো। ঢুকে দেখি দারুণ ঝগড়া। এমনি অকারণ ঝগড়া। তার না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু।

বীরভূমের আঞ্চলিক লোকভাষায় এর চেহারা দাঁড়াবে :—

দুকানে ত্যাল কিনতে গেইছিলম। যেঁয়ে দেখি, লুকে একেবারে গাদালপিটে আমায়। হাঁচুড়ে পাঁচুড়ে কষ্টমষ্ট করো্য কুন রকমে ত ঢুকলম, যেঁয়ে দেখি ল্যায় লেগেছে। ওইল ল্যায় মাশয়। তার মাথামুড় কিছু নাই।

*১১ তিয়রিয়া কথা :—

হাড়ে ভেগো মাচকে যাবি কি না আত্তিতো কোয়া কোয়া করছে। মুই ফুকারছি তুই ঘুমাইছিস।

বা। এক কাপকড়ে অইয়াছে। হ্যা ম্যাগ পড়িছে এখন কি জালে যাবাড় সময়। যা চেঁদে তুই মুইতো এখন যাব না। কালি ঢেড় আত্তি থাকিতে গিয়াছিহুঁ। যাড় বলে খাবার মাছ পেলু না, তাতো আজি ম্যাগ পড়িছে।

from that of the men, especially in their quarrels........."১২ এর নিদর্শন আছে "কন্দলের" ভাষায়।১৩

বাঙ্‌লাভাষী অঞ্চলের বিভিন্ন উপভাষা থেকে আহরণ ক'রে আরো কিছু কিছু লোক-ভাষার নিদর্শন তুলে ধরা যেতে পারে।১৪

---

*১২ উইলিয়ম কেরী রচিত Dialogues গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের Preface থেকে...............

*১৩ "ওলো। তোর শাপে আমার বাঁ পায় ধুলা মাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। থালো যা বারোদুয়ারি ভাড়ানি হাটবাজার কুড়ানি খানকি যা। তোর গালাগালিতে আমার কি হবে লো কুন্দলী।

*১৪ (ক) উত্তরবঙ্গের একটি চট্‌কা গানের ভাষা :

মোর সাধু আসিছে
তোক্‌ ছাড়া আর কাক্‌ কওঁ মুঞি
মোর সাধু আসিছে।
ও তুই খ্যাস্‌রে দিলু দাঁত
আঃ তুই না ট্যালাইস্‌ গাত্‌
আর ফাসার ফুস্থর না করিস্‌ তুই
ও মোর সরম লাগিছে।

(খ) উত্তরবঙ্গের লোকভাষার আর একটি নিদর্শন :

এক পা নড়বু না হারামজাদা। অনেক চুনকালি মুখোত্‌ মাখাইছু। আর বেশী তেড়িবেড়ি করিস না। পান্‌ঠি দিয়া সাট করে কেলামু।

(গ) পুরুলিয়া অঞ্চলের টুসু গান :

হামার টুসু সিনাই আল্য
পইরতে দিব কি।
বাসাকায় আছে ছিঁড়া কাঁথা
লঠাঁই আন্যে দি।
গুন্‌গুনায়েঁ আইস্‌লে ভমর
বইস্‌লে কন্‌ ফুলে।
লইতন ডালিম ফুল ফুট্যেছে
বইসবেক আস্যে ডালে।

বাঙ্‌লা ভাষার সব উপভাষারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। সমস্ত উপভাষার 'লোকভাষা'-র চেহারা ও স্বাভাবিক কারণে এক নয়। তাই লোকভাষার বা ফোক্‌ল্যাংগুয়েজের কোন সার্বিক চরিত্র আবিষ্কার করা সহজ নয়। তবু লক্ষ্য করা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকভাষার কতকগুলি বিশিষ্টতা আছে। সেই সব বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে আমরা তার সাধারণ চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হতে পারি।১৫

লোকভাষার বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণ:—

১। শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধ্বনিগত বিকারের প্রাধান্য:

উদাহরণ: ত্যাল, খ্যাশ, ট্যাকা, টেকা, টাঁকা, ব্যাঁকা ইত্যাদি।

সীমান্তরাঢ়ী উপভাষায় — লোক>লক। ছোট~ছট। চোর>চর, চুর
জোড়া>জড়া। ঘোড়া>ঘড়া। গোটা>গটা
পাখি>পাইখ। রাত্তি>রাইত। নীল>লীল
নদী>লদী। অমাবস্যা>আমাবস্যা
হাঁতী, সাঁপ, ঘাঁস, চাঁ।

২। ক্রিয়া-রূপের আঞ্চলিক বিভিন্নতা।

৩। বাক্যে বিশেষ ধরণের আঞ্চলিক সুরের প্রয়োগ।১৬

(ঘ) দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙ্‌লা (মেদিনীপুর)

জানলু মালাঝি। মুঞি ক্যানো মড়ামড়ীর আশৈ করিনিক। লিজের গতরটা সুখে থাউ কমন? যে হো মা তোর ই মস্তরটা ভারি কাফিজালিম রকম। এরু মৈধে মোকে উশ্বাস মাড়েঠে। ই বিদ্দ্যা কাইনু শিখছু গো!

*১৫ বলাবাহুল্য লোকভাষার বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ ঠিক একইরূপে বাঙ্‌লার সব উপভাষিক অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়। এ ক্ষেত্রে মূলতঃ পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

*১৬ আঞ্চলিক লোকভাষায় সর্বত্র সমানভাবে এর প্রভাব নেই। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে সর্বত্রই কোন না কোনরূপ Intonation বা স্বরের প্রয়োগ আছে। মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি

৪। নাগরিক বা শিষ্ট সমাজে অব্যবহৃত এমন সংখ্যাহীন গ্রামীণ শব্দের প্রয়োগ। কৃষিসংক্রান্ত এবং শ্রমসংক্রান্ত শব্দের আধিক্য।
উদাহরণ: (কৃষিসংক্রান্ত) মুঠ, কেতে, হালা, আলুই, দাওন, হালপোনানে, কিসেন, মাইনদার, গোলা (গৃহস্থ), মুনিশ, কামিন, বাগাল বাইদ, বহাল, কানালী, টাঁইড, কাদানো; চুয়া, (অন্যান্য) কেতের (জলের অভাব), পারবা (তত্ত্ব) চুল্‌হা, চুলহি, ইত্যাদি।

৫। ভাবগত শব্দের অপ্রাচুর্য, ক্ষমা, প্রেম, প্রীতি, স্নিগ্ধতা, ভব্যতা প্রভৃতি শব্দের অর্থপ্রকাশক গ্রামীণ শব্দের অল্পতা।

৬। দেশী শব্দের প্রাচুর্য।

৭। তৎসম শব্দের অতি অল্প ব্যবহার। অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার বেশী। উদাহরণ: জ্যোৎস্না>জ্যোছ্‌না, জুন, জোন্‌হা, জোন, জন ইত্যাদি।

৮। বাক্‌রীতিতে গ্রামীন প্রবাদ-প্রবচন এবং 'ইডিয়ামের' বহুল প্রয়োগ, যা শিষ্টভাষায় প্রায় অজ্ঞাত কিংবা অপ্রযোজ্য।১৭

জেলায় এই রীতি সহজশ্রাব্য। পশ্চিমসীমান্ত বাঙ্‌লার বাক্‌রীতিতেও এর প্রভাব আছে। তা'ছাড়া গ্রামের উন্মুক্ত প্রান্তরে, উচ্চগ্রামে আহ্বান করার সময়ও স্বরের ব্যবহার লক্ষণীয়।

•১৭ কিছু উদাহরণ:

(১) কায়েত মরে জলে ভাঁসে
কইও বলে কুন্ ছলে আছে।

(২) চাষার আক্যুৎ কাস্তের খুবা।

(৩) আপনার ঘর হেগেমুতে ভর,
পরের ঘর থুথু ফেলতে ডর।

(৪) ভাঁড়কে মাছের টিরিকবিরিক ক'দিন!

(৫) কুকুর কাহার ভেরে তিন না
যায় ধীরে।

(৬) জ্যান্তে দিলেক না টুঁড়ে
মরলে পরে দিয়ে আসবে কেনা
গাছের মুড়ে।

(৭) কানা পুতে চুষে। রানী ঝিএ চুষে

(৮) ধানের মত ধুন যদি না লাগে বেস্তে,
ভেয়ের মতন বন্ধু নাই
যদি না করে হিঁসে।

(৯) ভাত দেয় কি ভাতারে
ভাত দেয় আমার গতরে।

(১০) ডু নায়ে দিঁয়ে পা।
পোঁদ ফাট্যে মরে যা।

৯। শিষ্টভাষায় অব্যবহৃত সংখ্যাহীন আঞ্চলিক শব্দের প্রাত্যহিক ব্যবহার —

উদাহরণ : ছেলে=ছা, ছেলিয়া, ছেল্যে, ছেনা. ছানা, মুনু, পো, বেটা, বিটা।

মেয়ে=ঝি, মাইয়া, মেয়্যা, মুনী বেটী, বিটি ইত্যাদি।

১০। কুসংস্কারজাত এবং লোকবিশ্বাস জনিত শব্দের ব্যবহার —

সাপ=লতা

বাঘ=বড় শিয়াল

১১। গুরুজনের নাম উচ্চারণের ক্ষেত্রে, বিকৃত শব্দের ব্যবহার —

রাম=ফাম

হরি=ফরি ইত্যাদি।

১২। বাক্যে, অনুকারক শব্দের প্রয়োগের আধিক্য :—

(বিভিন্ন পশুপাখির ডাক ইত্যাদি) ম্যাম্যা, ভ্যা, ভ্যা, ভুক্‌ভুক্‌, গোঁ গোঁ, উর্‌র্‌ ইত্যাদি।

---

(১১) পথে গেলম কামার।
ফাল পাঁজাই দে আমার।

(১২) ত্যালে জলে রূপ।
ডেলে ভাতে বুক।

(১৩) আগুন নাই মানে অদা (=ভিজে)
রাজা নাই মানে দাদা।

(১৪) আঘন মাসে চুটিয়ার সাত বহু।

(১৫) বৌ ও না হারে (=রোগা হয়)
বাথার ও না কমে।

(১৬) একডুম বিনতিরিজ হওয়ার উপায় নাই।

(১৭) বেঙ বিঁধতে সনার কাঁড়।

(১৮) গুড়ি লিয়ে চাষ, বুড়হি লিয়ে বাস।

(১৯) প্যাটের বাছা বাড়ীর গাছা।

(২০) কাড়া শব্দ যোগে বাক্‌ধারা —
রা কাড়া, সান কাড়া
লতা কাড়া, ছাই কাড়া
হাড়ি কাড়া, ফেনা কাড়া
ঝাঁটা কাড়া, গোহাল কাড়া
ইত্যাদি।

১৩ বিদেশী শব্দ ও বাঙ্‌লা শিষ্টশব্দের লোকায়তিক রূপের প্রয়োগ :— (হাঁসপাতাল) হাঁইসপাতাল, আঁইসপাতাল, টিকিস্‌, বুল্‌, ফুলোট, ডাইমন্‌, ডাক্তর, লম্ফ, খয়ের বাসকা, এ্যাল গাড়ী, গড়ুর, পিচাশ ইত্যাদি।

১৪। অঞ্চলভেদে শিষ্টশব্দের অপপ্রয়োগ :—

ক্রোধ অর্থে 'রাগ'>অনুরাগ (বাপ্‌রে কি অনুরাগ !)

কুমারী>অকুমারী (অকুমারী মেয়ের অনেক জ্বালা)

চঞ্চল>অচঞ্চলা (এখন অচঞ্চলা হোস্‌ না)

প্রচুর>বিপরীত (আমি আজ বিপরীত খাঁয়েছি)

১৫ অঞ্চলভেদে (বিশেষ করে পশ্চিমসীমান্ত বাঙ্‌লায়) নাম ধাতুর প্রচুর প্রয়োগ :

উদাহরণ : তেল=(তেলানো) কাদা=(কাদানো)
মাথা=(মাথানো) অম্বল=(আমলানো)
স্নান=(সিনানো) রোগ=(রোগানো)
ঢিল=(ঢেলানো) কিল=(কিলানো)
ফাবড়া=(ফাবড়ানো) হাত=(হাতানো)

অথবা — মাথা ব্যথাছে (ব্যথা)
লোকটা সিনাছে (স্নান)
গরুটা কাহরাই দে (বাহির)
গরুটা ভিতরাই দে (ভিতর)
জলটা গঁধাছে (গন্ধ)
জলটা বাসাছে (বাস)
গরুটা দেঁতেছে (দাঁত)
জিনিষটা টকেছে (টক)
ধানগাছ পাতাছে (পাতা বড় হয়েছে) ইত্যাদি

প্রাত্যহিক বাক্যে প্রচুর গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট বা স্ল্যাং শব্দের ব্যবহার :— মাগী, গতরখাকী, পেটফেলানী, বারোভাতারী, বাপভাতারী, থালভরা, পইগুয়া, মাল, ছুকরী, চুতিয়া, ছুঁড়ি, ছুঁড়ি, ছুড়া, ছোঁড়া, সাদাকাঠি (সিগারেট), খাকী (বিড়ি), ঢেমনা, রাখনী ইত্যাদি।

১৭। বিকৃত ভাবে নামের উচ্চারণ :

হরে, যদো, যদুয়া, মধো, মধুয়া, কেষ্টা, কিষ্টা, যুধা (যুধিষ্ঠির), রতনা, অর্জ্জুনা, ভীমে, ভীমা, সহদেব্যা, দুসা (দুঃশাসন) ইত্যাদি।১৮

১৮। একই নামের আদিতে পার্থক্যবোধক বিশেষণের লোকায়তিক প্রয়োগ :

নাম—অর্জুন=দরপড়া অর্জ্জুনা (আধপোড়া অর্জুন)

আশথতলিয়া অর্জ্জুনা,
নিমতলিয়া অর্জ্জুনা
নেট্‌রা অর্জ্জুনা ইত্যাদি।
চক্‌লা মধু
বাগাল মধু
বাঠিয়া মধু
সাতভায়া মধু…
তেঁতুলে জগন্নাথ ইত্যাদি।

মোটামুটিভাবে এই ধরণের লক্ষণ দেখে লোকভাষার চরিত্র বিচার করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য, উপভাষার চরিত্রের সঙ্গে এর আকাশপাতাল ব্যবধান নেই। তবুও একথা নিঃসংকোচে বলা যায় যে, উপভাষার মধ্যেও যে স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়, তারই প্রাথমিক স্তরের বনিয়াদ রচনা করেছে এই লোকভাষা।

---

*১৮ গ্রামীন অশিক্ষিত, নীচুতলার মেয়েদের ব্যবহৃত গ্রাম্যতা দোষদুষ্ট শব্দের ব্যবহার অনেক।

স্ল্যাং-এর বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ হিসাবে অনেকে 'গ্রাম্য' শব্দটি ব্যবহার করেন কিংবা স্ল্যাং মানে অশ্লীল (vulgur) মনে করেন। অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ ও লোকভাষায় যথেষ্ট। স্ল্যাং কিন্তু গ্রাম্য নয়, গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট। মূলতঃ ব্যক্তি থেকেই উদ্ভূত এবং পরিশেষে লোকসমাজে প্রচলিত। সহরেও প্রচুর স্ল্যাং এর উদ্ভব ঘটে। তা' সব সময় অশ্লীল ও নয় গ্রাম্য ও নয়

বাঙলাভাষী প্রদেশে (পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও — বিশেষ ক'রে বিহারের বাঙলাভাষী অঞ্চলে এবং বাঙলাদেশে) বাঙালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাত্ এবং সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের যে স্তর আছে সেই সব স্তরেও বাক্‌রীতির এবং শব্দব্যবহারের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম-সমাজের নীচুতলার জাতই লোকভাষার প্রধান ধারক। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চেহারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকভাষার চেহারাও বদলাতে থাকে।

॥ ৬ ॥

এই প্রসঙ্গে, লোকসাহিত্যে লোকভাষার প্রয়োগ সম্পর্কেও কিছু কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। সাহিত্য যে হেতু শিষ্ট মানসের রচনা, তাই ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও শিষ্টভাষার প্রয়োগের দিকে লেখকের স্বাভাবিক প্রবণতা।

লোকভাষাকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করা হয় না। এ ভাষায় অঞ্চলগতভাবে লোকসাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। লক্ষ্য করা গেছে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক, উপন্যাসের সংলাপে লোকভাষার প্রয়োগ করেন, তাঁরাও যথাসম্ভব তার উপভাষিক চেহারাটিকে কিছু পরিমাণে পরিমার্জিত করে ব্যবহার করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদন এবং দীনবন্ধুমিত্র, তাঁদের নাটকে উপভাষার প্রয়োগ করেছেন।

লোকভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর কৃতিত্ব অসাধারণ। লোক চরিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে উপন্যাসে বা নাটকে লোকভাষার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এর কিছু অসুবিধাও আছে। বাঙলাভাষার এক অঞ্চলের উপভাষা আরেক অঞ্চলের লোকের পক্ষে দুর্বোধ্য হয়ে যায় বলে লেখককে খুব সতর্কতার সঙ্গে কলম ধরতে হয়। মূলতঃ লোকভাষাকে অবলম্বন করেই হাস্যরস প্রকাশ করার রীতি ও ছিল।

লোকভাষার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্তমান। যাঁরা লোকসংস্কৃতির চর্চা করেন এবং যাঁরা ভাষাবিজ্ঞানী তাঁদের কাছে লোকভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। লোকভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় না থাকলে, লোকসংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে, লোকসংস্কৃতির

বিচিত্র সম্পদ সম্পর্কে ভাসা-ভাসা ধারণার শীকার হন অনেকেই। যাঁরা সমাজবিজ্ঞানী-সংস্কৃতিবিজ্ঞানী এবং ভাষাবিজ্ঞানী তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে লোকভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রূপে পরিচিত হওয়া।

যাঁরা আঞ্চলিক লোকসাহিত্যের গবেষক তাঁদের পক্ষে লোকভাষা জানা একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। যথার্থ লোকভাষায় এখনও সংখ্যাহীন লোকসংগীতের উদ্ভব ঘটে পশ্চিমসীমান্ত বাঙলায় এবং উত্তরবঙ্গে। লোকসংগীত নামে কথিত পল্লীগীতির সংগে এর পার্থক্য আছে।

উত্তরবঙ্গের গম্ভীরাগানে লোকভাষার প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবাঙ্‌লার আঞ্চলিক লেটো এবং আলকাপে ও লোকভাষার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এসব প্রয়োগ-ই শিল্প সৃষ্টির অপেক্ষা করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেটো আলকাপের অভিনেতারাই স্বভাববক্তা।

অন্যভাবে বিচার করলে, লোকভাষার অবশ্যই কোন ভবিষ্যৎ নেই। লোকসমাজের সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকভাষার ও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সে তখন, মার্জিত উপভাষার দিকে পদক্ষেপ করে। কিন্তু লোকভাষার প্রাণশক্তি সহসা দুর্বল হয়ে পড়ে না। ভাষাতাত্ত্বিকদের এবং লোকসংস্কৃতিবিদদের কাছে লোকভাষার গুরুত্ব সীমাহীন হলেও লোকভাষা কোন উচ্চধারণাকে প্রকাশ করার বাহন হতে পারে না। একথা অস্বীকার করা যায় না। শিষ্ট মানুষের কাছে এর কোন গুরুত্বই নেই।

Mario Pei লোকভাষাকে কেবলমাত্র বৈচিত্র্যের জন্যই স্বীকৃতি দিতে রাজী হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য Like other local differences of food dress and customs, dialects are often a nuisance. Yet they lead picturousque variety to language and variety is the spice of life.

মেরিও পেই-র এই উক্তি যদি ও পুরোপুরি অস্বীকার করা অসম্ভব, তবু এ কথা ঠিক যে, লোকজীবনে মর্মমূলে প্রবেশ করার চাবিকাঠি হচ্ছে লোকভাষা। একেই বলা যায়—Vox Populi Vox Dei, লোকভাষাই দেবভাষা।

গ্রন্থপঞ্জী

১। The Origin and Development of the Bengali Language — Suniti K. Chatterjee

২। The Story of Language — Mario Pei

৩। Language for everybody = **Mario Pei**

৪। Mankind, Nation and Individual = Otto Jespersen

৫। The Story of Language — Barber

৬। কথোপকথন — উইলিয়াম কেরী

৭। অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ॥

বিদ্যাসাগর কলেজ,
সিউড়ি

বাংলার লোকধর্ম ও লৌকিক দেবতা

গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু

বাংলার শহর বা উন্নত জনপদ হতে দূরে, নাগরিক সংস্কৃতি— উচ্চআদর্শ বা শাস্ত্রীয় দেবতার পূজাচার, বা প্রভাব বিস্তার করেনি, এরূপ পল্লী অঞ্চলে, ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গলের মাঝ দিয়ে শক্ত পায়ে মাড়ানো মেটে পথের ধারে বা জলাশয়ের তীরে, কোন কোন প্রাচীন গাছের তলায় বা পর্ণ কুটিরে (থানে) মাটির তৈরী বহু দেবতার মূর্তি, ঘট, গাছের শাখা, কিংবা পোড়া মাটির ক্ষুদ্রাকৃতি বাঘ, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতির মূর্তি বা দেবতার প্রতীক পূজিত হতে দেখা যায়।

এসকল দেবতা, পল্লী সমাজে প্রায় সর্বজনীন ও বহুজনপূজ্য হলেও এদের উল্লেখ কোন শাস্ত্রগ্রন্থে নেই। শাস্ত্রীয় বিধানেও পূজিত হয়না। পূজায় পৌরোহিত্য করেন ব্রাহ্মণেতর বর্ণের ব্যক্তি, এমন কি নিম্নতম বর্ণের হাড়ি ডোম। এসকল দেবতার পূজা পার্বন অনুষ্ঠিত হয় পূর্ণ লোকায়ত বিধানে গ্রাম-প্রধান বা মোড়লের নায়কত্বে। পূজায় বর্ণ ভেদাভেদ এমনকি সাম্প্রদায়িকতা বা কুসংস্কার দেখা যায় না।

ঐ সকল পল্লীদেবতার পূজায় আড়ম্বর বা নৈবেদ্যে বহুলতা নেই, দেবতার কাছে পূজকদের কামনা প্রার্থনা ও সামান্য স্বর্গ-মোক্ষ-যশ-সম্পদ নয়, তারা চায় সুফসল এবং হিংস্র জন্তু, ভূতপ্রেত, সর্পের দংশন, রোগ-ব্যাধিতে, ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত্যুর কবল হতে ত্রাণ।

জনপদ সমাজে এই সকল দেবতার প্রভাব-প্রতিপত্তি-ভক্তি শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয় দেবতা অপেক্ষা আজও অধিক।

ঐ সকল দেবতার পূজাপার্বন লক্ষ্য করলে অনুমান হয় পল্লীপ্রধান এদেশে, শাস্ত্রীয় দেবতার পূজক সংখ্যার তুলনায় পল্লীর অশাস্ত্রীয় দেবতার উপাসকদের সংখ্যা কম হবে না।

তবে এই সকল দেবতাদের অধিক সংখ্যক আঞ্চলিক অর্থাৎ ইহাদের পূজাচার একটি স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অন্যত্র প্রায় অজ্ঞাত, তাহলেও এদেশের সকল পল্লীতে এই জাতীয় দেবতাদের পূজাপার্বন শতাব্দীর পর শতাব্দী ও লোক পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে, শাস্ত্রীয় দেবতাদের পূজাচার আদর্শ বা প্রভাবে এসকল পল্লীদেবতার প্রতিপত্তি একেবারে কমে যায় নি।

এসকল অশাস্ত্রীয়-অব্রহ্মনী-অপৌরাণিক দেবতাদের স্বরূপ কি। এঁরা কোন যুগে ও সমাজে পরিকল্পিত বা উদ্ভুত? মনে প্রশ্ন জাগে।

সে বিষয়ে বলা যায়, এ দেবতাদের পূজাচারে লোকায়ত বিধান, ব্রাহ্মণেতর জাতির পৌরোহিত্য, গ্রাম-প্রধান বা মোড়লের নায়কত্বে গ্রাম বা সমাজগত পূজা-পার্বন অনুষ্ঠান, দেবতাদের মূর্তিতে উগ্রভাব, দেবতার প্রতি ভয়-মিশ্রিত ভক্তি, পূজায় অত্যধিক পশুপক্ষী বলি, নৈবেদ্যে বলি করা পশুপক্ষীর মস্তক বা রক্তদান, পূজায় মদ্য বা গঞ্জিকার বিশেষ ব্যবহার ও রুচি বিরুদ্ধ আচার দেবতার কাছে ভক্তদের পার্থিব স্বার্থপূর্ণ কামনা প্রার্থনা।

এগুলি লক্ষ করে অনুমান করা যেতে পারে এসকল দেবতা ও পূজাচার আদিমযুগে পরিকল্পিত।

আদিমযুগে মানব ধারণা করতো—তাদের জীবনযাত্রায় যা কিছু বিপর্যয়, মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগব্যাধি, পশু বা সর্প দ্বারা জীবন হানি, প্রভৃতি সব বিপদই এক অদৃশ্য মহাহিংস্র শক্তি ঘটিয়ে থাকে। কিছু যুগ পরে, আদিম মানব একটু উন্নত হলে, তাদের ঐ ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়, ধারণা করে, ঐ অদৃশ্য শক্তি ভীতিজনক হলেও, বশীকরণ নরবলি ও কৃপা প্রার্থনা দ্বারা যদি তুষ্ট করা যায়, তাহলে জীবন যাত্রায় বিপদ ঘটবে না। কালক্রমে এ ধারণাও আদিম সমাজে হল যে, ঐ বিপদ নিয়ন্ত্রক শক্তি একটি নয় বহু; হিংস্রপশুর, বিষাক্তসর্পের, রোগ-ব্যাধির, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে।

নব আদিমযুগে মানবদের কোন কোন কৌম বা শাখা আকস্মিক ভাবে চাষ করতে বা বন্যপশু বশ করতে অক্ষম হলে চাষের ও পশুরক্ষার দেবতা তাদের মধ্যে কল্পিত হল। এরপরে সেই অদৃশ্যশক্তির প্রতি ভয় কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়। তখন তারা ধারণা করতে আরম্ভ করল, ঐ সকল শক্তি কোপন স্বভাবের হলেও তাদের কৃপা প্রার্থনা ও তুষ্টি বিধান দ্বারা মঙ্গল হতে পারে, তারা ঐ বিষয়-উদ্যোগী হল, আদিম সমাজে ভিন্ন উপাস্যের পরিকল্পনা ও তাদের কৃপা প্রার্থনা দেখা গেল। এসময় তারা মৃত পূর্বপুরুষ, জড়পদার্থ, পশুপক্ষী, বৃক্ষাদি পূজা আরম্ভ করলে। তাদের মধ্যে কোন কোন নিজেদের বিশেষ বিশেষ পশু পক্ষী বা বৃক্ষের বংশধর বলে ঐ সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও হয়েছিল। কিন্তু পূজা বলতে ঠিক যা বোঝায় তার প্রবর্তন আদিম সমাজে হয়, ঐ সময় এদেশবাসী অষ্ট্রিক, মোঙ্গলীয় ও দ্রাবিড়দের দ্বারা। এরাই বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন দেবতাদের মূর্তিও কল্পনা করেছিল, এমনকি (কোন কোন মনীষী মন্তব্য করেছেন) 'পূজা' শব্দটি তাদের ভাষা থেকে এসেছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই সব পল্লীদেবতারা আদিম যুগীয় তার নিদর্শন কি এবং তাদের পূজা কি করে যুগযুগান্তর অতিক্রম করে পরবর্তী পরিবর্তন বিবর্তন বিভিন্ন উচ্চতর ধর্মের প্রভাবে ও প্রসারে লুপ্ত না হয়ে বর্তমানেও অস্তিত্ব রক্ষা করে আছে।

পল্লীর একান্ত দেবতাদের বা তাদের পূজাচারের মধ্যে আদিমযুগীয় ধর্মাচারের নিদর্শনগুলির কয়েকটির বিষয় উপস্থিত করা যায়। এসকল দেবতার উল্লেখ কোন শাস্ত্রগ্রন্থে নেই। উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও এদের পূজা করেন না, এদের প্রতিপত্তি-পূজা পার্বন, অনুন্নত শ্রেণীদের মধ্যে কতকটা সীমাবদ্ধ (অনুন্নতরাই বাঙলা ভুখণ্ডের আদি অধিবাসী।) এদের পূজা লোকায়ত বিধানে অনুষ্ঠিত হয়। পৌরহিত্য করে (বর্তমানে দু'এক স্থান ব্যতীত) অব্রাহ্মণ, এমন কি নিম্নশ্রেণী লোক—হাড়ি ডোম প্রভৃতি। দেবতার কাছে ভক্তের কামনা ব্যক্তিগত এবং পার্থিব সুখ-সুবিধা ও বিপদাদি হতে ত্রাণের জন্য। দেবতাদের প্রতি ভক্তদের ভক্তিমিশ্রিত ভয়। পূজাচারে বীভৎস আচার আচরণ, অত্যধিক পশু হত্যা, দেবতার নৈবেদ্যে বলিকরা পশু মুণ্ড ও রক্ত এবং মদ্য গঞ্জিকা দেওয়া। দেবতার উপর রাগ অভিমান করা বা তাঁরা অনিষ্টের

কারণও ভাবা। বৃক্ষ বা বৃক্ষ শাখা ও ছোট ছোট মাটির ঢিপি এবং স্বাভাবিক প্রস্তর খণ্ডকে দেবতা বা দেবতার প্রতীক বলে ধারণা করা। এ সকল দেবতাই আঞ্চলিক পূজ্য। পূজার ব্যাপারে বর্ণ সম্প্রদায় ভেদাভেদ না থাকা ও সাধনা প্রার্থনা কম কিন্তু পূজায় নাচগান আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি বেশি থাকা। দেবতা দেখতে পারে এই বিশ্বাসে মন্দিরে ঢিল ঝুলিয়ে দিয়ে মানত বা তাঁর কাছে কামনা বাসনা জ্ঞাপন করা ও 'জোড়া পাঁঠা খেতে দেব', এরূপ লোভ দেবতাকে দেখানো। এ সকল দেবতার পূজা কারুর ব্যক্তিগত ভাবে হয় না, সর্বদা গ্রাম-মোড়লের নায়কত্বে গ্রাম বা সমাজগত ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং পল্লীবাসীদের নিকট মাগুন (বা পূজার জন্য ফলমূল শস্য অর্থাদি সংগ্রহ) করে পূজার ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কোন কোন লৌকিক দেবতার নাম দুর্বোধ্য, প্রচলিত ভাষায় নয়। দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি পল্লী দেবতাদের সঙ্গে বাংলার কয়েকটি লৌকিকদেবতার বিস্ময়জনক সাদৃশ্য।

লোকধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ, কুমারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ব্রতগুলি, এ সকল আর্যপূর্ব মাতৃতান্ত্রিক সমাজে উদ্ভূত, তা সহজেই বোঝা যেতে পারে। এ ব্রতগুলিতে পশুপক্ষী, পৃথিবী, বৃক্ষ, নদ, নদী, সূর্য, চন্দ্র, প্রভৃতিকে আরাধনা করা হয়। পারিবারিক ও গ্রামসমাজের মঙ্গল উদ্দেশ্যে।

তবে সকল দেবতাই যে আদিমযুগীয় তা নয়, পরবর্তীকালে বিশেষ করে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম অপ্রিয় হলে, তন্ত্রযোগীদের বহু দেবতা ছদ্মবেশে বা নাম পরিবর্তন করে লৌকিকদেবতাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। মধ্যযুগে মুসলমানদের কয়েকটি বিখ্যাত মৃত পীর-গাজি-বিবিও গ্রামবাংলার লৌকিক-দেবতাদের দলভুক্ত হয়েছেন এবং জনপদ সমাজের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁদের উদ্দেশ্যে পূজা দিয়ে থাকে।

অপর প্রশ্ন—সেই আদিমযুগে পরিকল্পিত দেবতা ও তাঁদের পূজা-পার্বন ধারা কিভাবে যুগের পর যুগ অতিক্রম করে পরবর্তীকালের পরিবর্তন বিবর্তন বিভিন্ন উচ্চতর ধর্মের প্রচার প্রভাব নব নব ধর্ম (ধর্মীয়) সংস্কৃতির আদর্শে লুপ্ত না হয়ে বর্তমান কালেও প্রবাহিত থাকা সম্ভব হল! তার উত্তরে বলা যায়—উচ্চতর বা বহিরাগত ধর্মগুলির প্রচার বা প্রসার উন্নতস্থানের উচ্চকোটি সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে বিচ্ছিন্ন দ্বীপাবদ্ধ

প্রশস্ত নদনদী হতে দুরস্থ বনময় স্থানে বা অনুন্নত সমাজে প্রচার কিংবা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। উচ্চকোটি সমাজ পূর্বাগত ধর্ম ত্যাগ করে যেমন ভাবে নবধর্ম স্বীকার করেছে, অনুন্নতরা তা আদৌ করেনি, ধর্মাচার বিষয়ে তারা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, ঐতিহ্যবাহী, এমনকি আপোষ বিরোধী। পূর্বপুরুষগণ বংশ পরম্পরায় যে সকল দেবতা পূজা করেছেন যে বিধান পালন করেছেন পল্লীসমাজের লোকরা চিরদিনই তাই অনুসরণ করে আসছে, এমন কি বর্তমানেও শাস্ত্রীয় দেবতা অপেক্ষা ঐ সকলকে অধিক ভক্তি ও বিশ্বাস তারা করে থাকে। এই সকল কারণে আদিম যুগের দেবতার পূজাচার জনপদ সমাজে লুপ্ত হয়নি, হয়ত কিছু পরিবর্তন হয়েছে, নামে, বিশ্বাসে, মূর্তিতে বা পূজাচারে।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা প্রয়োজন বর্তমানে যে সকল আঞ্চলিক দেবতাদের লৌকিক বলা হয়, শহর বা উন্নত স্থান হতে দূরে পূজিত হন এবং ব্রাহ্মণ বা উচ্চকোটি সমাজ স্বীকার করবেন না, সেই সকল বা সেই জাতীয় দেবতাই ভারতে আর্য আগমনের পূর্বে সর্বত্র ও সর্বস্তরের ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিত হতেন; পরে যখন উচ্চকোটি ও উন্নত স্থানের অধিবাসীরা আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন, সে সময় আদি যুগের দেবতারা অনুন্নতদের পল্লী সমাজে অস্তিত্ব রক্ষা করেন এবং আঞ্চলিক হয়ে যান। কিন্তু তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি পূজাচার হ্রাস পায়না বর্তমানেও তাঁদের প্রতি ভক্তদের ধারণা বিশ্বাস শ্রদ্ধা নির্ভরতা পূর্বের মতই আছে।

প্রাচীন কোন চিন্তাধারা বা ধর্মীয় সংস্কার একবার কোন দেশে বা সমাজে প্রবেশ করলে পরবর্তীকালে (নানা পরিবর্তনের মধ্যেও) একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়না। ঠিক এই বিষয়ে পাশ্চাত্য গবেষক মনীষি Donald Makenzie তাঁর Indian Myth and Legend গ্রন্থে যা বলেছেন উদ্ধৃত করছি—"A people may change their weapons and their languages time and again, and yet retain ancient modes of thoughts."

বাংলার কয়েকটি লৌকিক দেবতাদের বিষয় আলোচনা করছি:— তার-পূর্বে একটি বিষয় বলা অবশ্য প্রয়োজন - লৌকিকদেবতাদের মধ্যে কয়েকটি

বিশেষ বিখ্যাত, তাঁদের ভক্ত সংখ্যা এবং পূজাক্ষেত্র অপর বহু দেবতা অপেক্ষা অধিক, তাঁদের প্রথম স্তরের বলা যায়। এরূপ প্রথমস্তরের দেবতাগুলি যথাক্রমে—ধর্মঠাকুর, দক্ষিণ রায়, পঞ্চানন্দ, চেলাইচণ্ডী, বাসলী—

ধর্মঠাকুর ॥

বাংলার জনপাদ সমাজে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, অধিক জনপূজ্য ও গবেষকদের মধ্যে বহু আলোচিত লৌকিক দেবতা—ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ। এঁর বিভিন্ন প্রকার মূর্তি, প্রতীক, বাহন, নাম ও আছে। ভক্তদের মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজার রীতিনীতি ও বিশ্বাস ধারণার কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

এই দেবতাটির স্বরূপ বিষয় গবেষক বা মনীষীদের মধ্যে মতভেদ আছে, তাঁদের বিভিন্ন ধারণাগুলির বিষয় উল্লেখ করছি :

১। ধর্ম ঠাকুর পূজা আদিম যুগের 'কূর্ম উপাসনা' থেকে এসেছে। এ দেবতার কূর্ম প্রতীকই সর্বাপেক্ষা অধিক পূজীত হয়। আদিম যুগে লোকে বহু পশুকে পূজা করতো (তাদের পূর্ব-পুরুষ ধারণায়)।

২। ডোম জাতির দেবতা—ধর্মঠাকুরের পূজায় বর্তমানেও ডোমজাতি অধিক ক্ষেত্রে পৌরোহিত্য করেন। কোন কোন মনীষী মন্তব্য করেছেন, ধর্মঠাকুর পূজার প্রবর্তক ও প্রচারক ছিলেন রামাই পণ্ডিত, তিনি জাতিতে ডোম ছিলেন এবং 'ডোম' শব্দ থেকে 'ধর্ম' শব্দ এসেছে। এসেছে অবশ্য চলতি কথার অপপ্রয়োগে (ভাষাতত্ত্বের রীতি অনুসারে নয়)। ডোমরাজ > ডোমরা > ধরম > ধর্ম। তুলনা যমরাজকে চলতি ভাষায়= 'যমরা' বলা হয়।

৩। ধর্মঠাকুর আদিম দেবতা—সে বিষয়ে প্রথম উল্লেখ করতে হয় এঁর প্রতীক ধর্মশিলা ও স্বাভাবিক প্রস্তর খণ্ড। ধর্মশিলা দেখতে মশলা পেষণের নোড়ার মত। প্রস্তর পূজা আদিম যুগের মানুষরা যে সময়, চেতন-অচেতন সকল দ্রব্যে ঐশীশক্তি আছে ধারণা করে পূজা করতো সেই (fetism) যুগীয়।

ধর্মঠাকুরের গাজন উৎসবে বিগ্রহের পাশে মদ্যপূর্ণ বৃহৎ কলস স্থাপন, ভক্তদের মদ্যপান, আগুন নিয়ে খেলা, অঙ্গে বাণ ফোঁড়া, পেরেক লাগানো

পাটাতনের উপর শয়ন, গ্রাম মোড়লের (কৌমপতির) নায়কত্বে গ্রামগত পূজা। পূজায় মাগুন করা, পৌরোহিত্যে সর্বপেক্ষা নিম্নবর্ণের জাতি ডোমেদের আধিক্য। বর্ণসম্প্রদায় বিষয় বাদ-বিচার হীনতা, এ সবই আদিম যুগীয় ধর্মাচারের লক্ষণযুক্ত দেখা যায়।

৪। ধর্মঠাকুর রাজা দেবতা :—আমাদের দেশে (অন্যত্রও) রাজা বা ধর্মনেতাকে দেবতার মর্যাদা দানের রীতি ছিল। কালক্রমে বহু রাজা বা ধর্মনেতা ভক্ত সমাজে দেবতায় উন্নীত হয়ে যান বা অপর কোন প্রচলিত পূজাচারের সঙ্গে তাঁদের পূজা মিশ্রিত হয়। (ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের ব্যাপারে বোধহয় সেরূপ হয়েছিল। সীমান্ত বাংলার ছাতা পরবে ও রাজার পূজা দেখা যায়)।

এ ধারণা হয় ধর্মঠাকুরের (কোন কোন স্থানের। গাজন উৎসব লক্ষ্য করলে। ধর্মঠাকুর এখানে ধর্মরাজ, রাজপোষাক পরেন ও সিংহাসনে বসেন, ভক্তদের কয়েকজন নগর কোটাল, দ্বার রক্ষক রূপে মন্দির কক্ষ ঘিরে থাকেন, কক্ষের মধ্যে শুধু থাকেন, ধর্মের পণ্ডিত (ধর্ম ঠাকুরের ও লৌকিক চণ্ডীর পুরোহিতদের 'পণ্ডিত' বলা হয়, অনুন্নত শ্রেণীর লোক ও ধর্মের বা চণ্ডীর পণ্ডিত হতে পারেন), পূজারকালে ভক্তরা মন্দির প্রাঙ্গণে বসে তাঁর আরাধনা করতে থাকেন। পূজা অন্তে পুরোহিত গ্রাম্য লোকদের একটির পর একটির নাম ডাকেন। একে 'ধর্মের ডাক' বা গোয়াডাক (গুয়াডাক) বলা হয়। গ্রামের লোকরা একজন করে দেবতার বিগ্রহের সম্মুখে এসে তাঁর পায়ের উপর রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে যায়। (রৌপ্যমুদ্রা সিকি আধুলি হলেও চলে)। কোন কোন ধর্মঠাকুরের মন্দিরের শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা প্রচার করেন ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতা, আবার দু'এক স্থানে এঁকে যম বা যমরাজ বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে নাথ ধর্ম বহু প্রাচীন, নাথ যোগীরা ধর্মঠাকুর পূজায় পৌরহিত্য করেন, তাঁদের ধারণা ধর্মঠাকুর বুদ্ধদেবের অবতার। এ বিষয়ে একটা কথা মনে হয় নাথ ধর্ম-তান্ত্রিক শৈবধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ধর্মপূজা মিশ্রণে সৃষ্ট। তান্ত্রিক ও তন্ত্রযানী বৌদ্ধদের ধর্মে বহু আদিম দেবতার পূজা মিশ্রিত ও প্রচলিত হয়েছিল, সে কারণ নাথদের ঐ জাতীয় ধারণা হতে পারে। কিন্তু তাঁদের ধর্মঠাকুর পূজায় এমন কয়েকটি বিধান ও আবার দেখা যায় যেগুলি আদিম যুগীয় বলে মনে হয়।

দক্ষিণ রায় ॥

দক্ষিণ রায় সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদেবতা বলেই অধিক খ্যাত, এর অন্য পরিচয় আছে। বাংলার লৌকিক দেবকুলে দক্ষিণ রায়ের স্থান একেবারে উচ্চে। এঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্নকালে বহু মনীষী ও গবেষক দীর্ঘকাল ব্যাপী যে অনুসন্ধান ও প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন, তা অপর কোনও অশাস্ত্রীয় দেবতার ভাগ্যে ঘটেছে বলে জানা যায় না।

সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাঘ্রভীতি থেকে এই দেবতা কল্পিত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু অন্য অভিমতও আছে, আদিম যুগে মানব দু'টি কারণে ব্যাঘ্র পূজা করতো. একটি ব্যাঘ্রদের বা ব্যাঘ্রদের নিয়ন্ত্রণকারী অদৃশ্য শক্তিকে তুষ্ট রাখার জন্য, অপর কারণ হল — আদিম মানবদের কোন কোন কৌম নিজেদের ব্যাঘ্র বংশীয় ধারণা করতো, পূর্বপুরুষ পূজা আদিম যুগে প্রচলিত ছিল। ধারণাগুলি যাই হোক, দক্ষিণরায় পূজার উৎপত্তি ব্যাঘ্র পূজা থেকে হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরে ব্যাঘ্রপূজার সঙ্গে দক্ষিণরায় (তিনি হয়ত দক্ষিণ অঞ্চলে রাজা বা ধর্ম সমাজ রক্ষক ছিলেন) পূজা মিশ্রিত হয়ে যায়, আদি দেবতা বা ব্যাঘ্র দক্ষিণরায়ের বাহন হয়ে যান। কিন্তু পূর্ব ধারণা স্থির থাকে, অর্থাৎ দক্ষিণরায় ব্যাঘ্র-কুলের নিয়ন্ত্রক বা অধিদেবতা ও অরণ্যরাজ্যের অধিপতি। ব্যাঘ্রদেবতার আদিতে কোন নাম বা রূপ না থাকাই সম্ভব, মনে হয়-রূপ বা মূর্তি পরে হয়েছে। 'দক্ষিণরায়' নাম ও সুন্দর আকৃতি মধ্যযুগের পূর্বে হতে পারে না। রূপ ও নাম পরিবর্তিত হলেও ভক্তদের তাঁর প্রতি ধারণা ভক্তি বা পূজাচারে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। এখনও সুন্দরবন প্রবেশ কালে, সকল মৌলে (মোম-মধু সংগ্রহকারী), বাউলে (কাঠুরিয়া বা কাঠ ব্যবসায়ী), মালঙ্গী (নুন প্রস্তুতকারক), আবাদকারী শিকারীরা (হিন্দু অহিন্দু সকলেই) ব্যাঘ্রের গ্রাস হতে রক্ষা পাবে বিশ্বাসে দক্ষিণরায়ের থানে পূজা-হাজোত দেন। বনাঞ্চলে দক্ষিণরায় পূজায় পুরোহিত থাকে না।

দক্ষিণরায় চব্বিশ-পরগণা জেলার দক্ষিণতম অঞ্চলের প্রায় সর্বজনীন দেবতা এবং শাস্ত্রীয় না হয়েও শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদা ঐ অঞ্চলে পেয়ে

থাকেন, উন্নত জনপদে বা স্থানে এর পূজায় যে সকল থানে বা মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাঁর পূজা করেন সেরূপ ক্ষেত্রে, মিশ্রিত (শাস্ত্রীয় ও লৌকিক) বিধানে পুজা করা হয় ; পুরোহিতরা নানারূপ প্রচার করেন দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে। কোন কোন পুরোহিত বলেন ইনি শিবপুত্র, অন্যে প্রচার করেন ইনি গনেশের বিচ্ছিন্ন মুণ্ড হতে পূর্ণাক্রান্ত ধারণ করেছেন। (অতএব শাস্ত্রীয় দেবতা) পৌষ সংক্রান্তি অথবা ১লা মাঘে, সারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় এই দেবতার মুর্তি বা মুখচিত্রিত ঘট প্রতীক (বারা) সর্বত্র পূজিত হয়ে থাকে। এঁর বড় বড় স্থায়ী থান এমনকি পাকা মন্দির ও দেখা যায়, যে সকল স্থানে সারা বৎসর প্রতি শনি-মঙ্গলবারে নিয়মিতভাবে দক্ষিণ রায়ের পূর্ণমুর্তি পূজিত হয়। দক্ষিণ রায়ের মত সুশ্রী আকৃতির লৌকিক দেবতা বিরল, পৌরাণিক রাজা বা যোদ্ধার বেশ, হাতে ঢাল অপর অপর অস্ত্র-শস্ত্র, কোন কোন স্থানে বন্দুক, পাশে ব্যাঘ্রমুর্তি ও দেখা যায়। পূর্ণমুর্তি দক্ষিণ রায় ব্রাহ্মণ পৌরাহিত্য করেন। ঘট বা বারার প্রতীক পূজায় অব্রাহ্মণকে ও পৌরহিত্য করতে দেখা যায়। প্রতীক ঘট সর্বদা দুটি থাকে-একটি দক্ষিণ রায়ের অপরটি নারায়ণী বা তাঁর মাতার বলে কথিত। দক্ষিণ রায় পুজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত গণেশের মন্ত্র ব্যবহার করেন কিন্তু অন্যত্র বাংলাও সংস্কৃত মিশ্রিত ছড়া ব্যবহৃত হয় তার দু'একটির স্থান বিশেষ উদ্ধৃত করছি :—

> 'চন্দ্রবদন-চন্দ্রকায়, শার্দ্দুল বাহন দক্ষিণরায় বা সাগরসঙ্গম সুন্দরকায়, ঘোটক বাহন দক্ষিণ রায়, ঢাল তলোয়ার টাঙ্গি হস্তে, দক্ষিণ রায়, নমোহস্তুতে।'' বীজ মন্ত্রও ব্যবহৃত হয়- ওঁ দম্ দম্ দম্।
>
> এঁর বারা বা ঘট (মুণ্ডমূর্তি) উহা পূজা কালে ব্যবহৃত ও হয়—তার মন্ত্র

> "মুণ্ডমাতা, মুণ্ডপিতাং নারায়ণঃ নারায়ণী।
> ক্ষেত্রপাল মহালক্ষী, গণেশায় নমো নমঃ।।''

বার্ষিক সাপ্তাহিক ব্যতীত দক্ষিণ রায়ের একটি পূজা হয় সুন্দর বনের বসতি অঞ্চলে—তাকে জাঁতাল পূজা বলে, এ পূজা দু'টি বৃহৎ আকারের মুখচিত্র অংকিত বারা বা ঘট থাকে, একটি দক্ষিণ রায়ের অপরটি তাঁর ভ্রাতা কালুরায়ের প্রতীক।

এ পুজার কোন নির্দ্ধারিত দিন থাকে না, ধান কাটা শেষ হলে—পৌষ

বা মাঘ মাসের যে কোন রাত্রে জাঁতাল পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ঘন জঙ্গল মধ্যে কোন জলাশয় তীরে পূজার স্থান নির্বাচন আবশ্যক। সেস্থানের মধ্যভাগে একটি বড় বেদী মাটি দিয়ে তৈরী করা হয় (কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাঘ্রের ভয়ে শারা পূজা বা উৎসব ক্ষেত্রটি গরান বা হেঁতাল গাছের বড় বড় খুটি দ্বারা ঘিরে রাখা হয়)। পূজাক্ষেত্রের চার দিকে বড় বড় মশাল জ্বালা থাকে। জয় ঢাক, ঢোল, কাঁশি প্রভৃতির বাদ্য এবং নৈবেদ্যে নানারূপ মাদক দ্রব্য, বলি করা ছাগ, হাঁস, মুরগীর মস্তকঅংশ ও রক্ত দেওয়া লোকায়ত বিধান। পূজা অধিক সময় ধরে হয়না—বাউলে বা অঞ্চল পুরোহিত বাংলায় একটি ছড়া আবৃত্তি করেন ও দেবতাহুজনের উদ্দেশ্যে শালফুল দেন। দক্ষিণ রায়ের এই জাঁতাল পূজায় সময়, বিশেষত বলির কালে, বাদ্যের উৎকট শব্দে ও ভক্তদের ভয়াবহ চিৎকার ও উল্লাসে শুধু পূজাক্ষেত্র নয়-ই বনভূমি কম্পিত হতে থাকে। বলি করা পশু-পক্ষীর রক্তে পূজাক্ষেত্র ভেসে যায়, ভক্তরা মাদক দ্রব্য সেবন করে মশাল হস্তে নৃত্য করে থাকে।

এই জাঁতাল পূজার আচার-আচরণ ও কৃত্যগুলি লক্ষ্য করলে ধারণা হবে ঐগুলি বা জাঁতাল পূজা, আদিম যুগীয় পূজাচারের লুপ্তাবশেষ। তবে বর্তমানে এ পূজা প্রায় লোপ পেয়েছে।

দক্ষিণ রায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে এঁর ভক্তজনের এবং গবেষকদের বিভিন্ন ধারণা-গুলির কয়েকটি উল্লেখ করছি।

১. ইনি আদিতে ব্যাঘ্র, এঁর পূজা আদিম যুগের ব্যাঘ্র উপাসনা থেকে এসেছে।

২. আদিম যুগে কল্পিত ব্যাঘ্রকুলের অধিদেবতা (সে সময় কি নাম ছিল জানা যায়না, তবে দক্ষিণ রায় রূপে যিনি ছিলেন তিনি ব্যাঘ্র ছিলেন না ধারণা হয়।)

৩. আর্যেতর অষ্ট্রিক দ্রাবিড় দেবতা। (অষ্ট্রিক দ্রাবিডরা আদিম কাল থেকে আর্যদের আগমন-সময় পর্যন্ত বাস করতেন ঐ স্থানে)

৪. দক্ষিণ রায় মানুষই ছিলেন, জনভক্তিতে দেবতাপদে উন্নীত হয়েছেন। কোন কোন গবেষক বলেন, এককালে বাংলার এক অধিপতি ছিলেন 'মুকুট রায়' নামে তাঁর অধীনে আলোচ্য দক্ষিণ রায় ঐ রাজ্যের

দক্ষিণতম অংশ (সুন্দরবন) শাসন করতেন। তিনি ধর্ম ও সমাজ রক্ষক জননেতা ছিলেন, সে কারণ তাঁর সঙ্গে বিধর্মী প্রচারকদের সংঘর্ষ হয়েছিল এবং তিনি বিজয়ী হন।

৫. দক্ষিণ রায় আরণ্যক সমাজে প্রথমে সভ্য কৃষকদেরও দেবতা, এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় তাঁর অপর নাম ক্ষেত্রপাল' হতে।

৬. দক্ষিণ রায় আরোগ্য দেবতা। দক্ষিণ রায়ের কোন কোন মন্দিরে ঔষধাদি দেওয়া হয়।

গবেষকদের নানারূপ অভিমত থাকলেও একটি মিল আছে যে, দক্ষিণ রায় পূজা (বিভিন্ন নাম পরে হলেও) আদিম যুগে আর্যতর সমাজে উদ্ভূত।

ঢেলাইচণ্ডী বা বৃক্ষ দেবতা

বৃক্ষ-পূজা আদিম যুগের একটি ধর্মীয় সংস্কার। পরবর্তীকালে, কোন কোন বৃক্ষ, যথা—তুলসী, বট, অশ্বত্থ, বেল প্রভৃতি উচ্চকোটি হিন্দুদের মধ্যে শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনই সমাজে বহু বৃক্ষ যথা — বাঁশ, খেঁজুর, ডুমুর, কলাগাছ, সেওড়াগাছ লৌকিক দেবতা বা প্রতীক মর্যাদা লাভ করে বহুকাল অবধি পূজ্য হয়ে আছেন। ইং ১৯০২ সাল নাগাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর নৈহাটির বাসভবনের কিছুদূরের একটি পল্লীতে একটি খেঁজুর গাছ 'ঢেলাইচণ্ডী' নামে পূজা হতে দেখে সেসময়ের বিদ্বান্ সমাজে জানান। ঐ সময়ের চব্বিশ পরগণা জেলা পরিচিতি (বা **Gazettear**) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়...**A curious form of survival of tree worship which still practised in the district under the name of DhelaiChandi was discovered by Mohamohopadya Haraprasad Sastri.**

শাস্ত্রীমহাশয় নৈহাটির নিকট মাঝিপাড়া পল্লীতে যে "খেঁজুরগাছটির পূজা দেখে ছিলেন সেটি বর্তমানে নেই, ঠিক সেই স্থানে, অপর একটি খেঁজুর গাছ পূজিত হয়। শুধু ঐ খানে নয় নিকটস্থ-হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি উন্নত স্থানে পথের ধারে কয়েকটি গাছকে পূজা করতে দেখা যায়। এ পূজায়

পুরোহিত কোন মন্ত্র, এমন কি নৈবেদ্য বলতে যা বোঝায় তাও থাকেনা; ঐরূপ পূজ্য গাছের সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতকারীরা গাছের তলদেশে একটি মাটির ঢেলা শ্রদ্ধাসহ অর্পণ করেন—এই হল পূজা। বজবজের নিকট বাখড়াহাট পল্লীতে একটি প্রাচীন গাছ বেশ সমারোহের সহিত নিয়মিতভাবে শনি মঙ্গলবারে পূজিত হয়, পূজার স্থানটিকে 'বড়-কাছারি' বলে। ভক্তেরা এখানে গাছটির মূলদেশে মদ্য মাংস ফলমূল দিয়া পূজা করে, পুরোহিত সময় সময় থাকেন, বিশেষ পূজা কালে।

মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদের পল্লী বিশেষে এরূপ গাছ পূজা দেখা যায়। তবে মেদিনীপুরে পূজ্য-গাছগুলি-কোন দেবতা, উপদেবতা, মৃত মহাপুরুষ বা ফকীরের অধিষ্ঠান বিশ্বাসে পূজিত হয়ে থাকে, কতকটা হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, নৈবেদ্য বিশুদ্ধ ঢেলা। রাঢ় অঞ্চলে ইঁদ পূজা-শাল গাছের এবং করম পূজা করম গাছের পূজা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। উত্তরবঙ্গে সেওড়া গাছ পূজা হয় বনদুর্গার অধিষ্ঠান বিশ্বাসে। দিনাজপুর রংপুরে ক্ষেত্রপাল ও মহারাজ পূজা আদিতে বাঁশ পূজা থেকে এসেছে। যেমন মানকুমার পূজা এসেছে কলা গাছ পূজা থেকে।

বহুমনীষী মন্তব্য করেন দুর্গা পূজার অঙ্গ নবপত্রিকা আদিমকালের নয়টি গাছের পূজা থেকে এসেছে। দুর্গার একটি নাম 'শাকম্ভরী'-অর্থাৎ শস্য দেবী।

সুবিখ্যাত লোক সংস্কৃতি গবেষক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

The greatest Bengali national festival Durga Puja seems to be based on the cult of some vegetation spirit in as much as the worship of the nine plants known as Navapatrika, forms an important item of its various rituals. Sometimes the nine plants are addressed as the goddess Durga herself.... The nine plants which are ceremoniasly worshipped on the occasion of the Durga Puja have been supposed to represent the deities of vegetation of pre-historic Bengal.

"Cult of Tree-deities of Bengal" by A. Bhattacharji Indian Folk Lore 1958. Oct.

বৃক্ষ দেবতাকে কোন কোন স্থানে নারী বলে বিশ্বাস করা হয়। লৌকিক-দেবতাদের মধ্যে নারী বা দেবীর সংখ্যা কম নয়, তার কয়েকটির পরিচয় দেওয়া গেল :

ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডী ॥

বিসূচিকা বা কলেরা রোগ নিরাময় কারিণী দেবী।

হাড়িঝি চণ্ডী ॥

মন্ত্র-তন্ত্রের ও সর্পবিষ হারিণী। গুণিনদের প্রায় একান্ত উপাস্য।

বনবিবি ॥

বনরাজ্যের ও ব্যাঘ্রকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, হিন্দু মুসলমান সকলেরই উপাস্য। বিশেষ করে সুন্দরবনে যাতায়াতকারীদের।

বনদুর্গা ॥

উত্তরবঙ্গে পূজিত হন, সেওড়া গাছ প্রতীকে শস্য দেবী বিশ্বাসে।

বাবাঠাকুর পঞ্চানন্দ ॥

'বাবাঠাকুর'—'পঞ্চানন্দ'—'পঞ্চানন', প্রভৃতি একই নামে আলোচ্য দেবতাকে অভিহিত করা হয়। অনুমান করা যেতে পারে যে, এই লৌকিক দেবতার 'বাবাঠাকুর' নামটিই আদি কালের শুদ্ধ ভাষার নামগুলি পরবর্তী সময় ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে হয়েছে। ইনি লৌকিকদেবতা হলেও আঞ্চলিক নন, এঁর পূজা-পার্বণ বাংলার বিভিন্ন জেলায় এবং বর্তমানে বর্ণ-হিন্দু সমাজেও প্রায় শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদায় ও বিধানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং ব্রাহ্মণ পৌরাহিত্য করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে পঞ্চানন্দের পূজায় নাথযোগীদের পৌরাহিত্য করতে দেখা যায়। সে সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধান পালিত হয় না। কলকাতা, হাওড়া প্রভৃতি শহরেও পঞ্চানন্দের পূজা হয়। ইনি শিশুরক্ষক দেবতা বলেই অধিক খ্যাত। মহাদেবের সঙ্গে পঞ্চানন্দের আকৃতিগত এবং বেশভূষায় সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু এই দেবতার গাত্রবর্ণ-লাল এবং মুখের ভাব উগ্র। পঞ্চানন্দের বহু বাহন যথা—বামন, গোভূত, মামদো, হরিণ, বৃষ, ভল্লুক, বৃশ্চিক প্রভৃতি। পঞ্চানন্দের অনুচর রূপে দুটি বীভৎস আকৃতির পরিচয় দেখা যায়, তারা

'পেঁচ খেঁচ' বা ধনু-টঙ্কার' বলে পরিচিত। পঞ্চানন্দের মুণ্ডমূর্তি ও ঘটপ্রতীক ও পূজিত হয়। এঁর বিশেষ পূজায় ছাগবলি আবশ্যিক লোকায়ত বিধান।

যে সকল নারীর গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায়, যার সন্তান জন্মাবার কিছু দিনের মধ্যে মারা যায় বা শিশু-সন্তান ধনুষ্টঙ্কার (বা পেচয় পাওয়া কি পুঁয়ে পাওয়া) অর্থাৎ রিকেট রোগে আক্রান্ত হয়, সেই সন্তানদের মা পঞ্চানন্দের একান্তভাবে শরণাপন্ন হন বা সন্তানকে পঞ্চানন্দের অভিভাবক করে দেন বা উৎসর্গ করেন। একে বলে পঞ্চানন্দের 'দোরধরা', সন্তানটির পরিচয় হয় পঞ্চানন্দের 'দোরধরা-সন্তান'। সন্তানটির নাম হয় পঞ্চানন্দচরণ বা পঞ্চানন্দ-দাস প্রভৃতি পঞ্চানন্দ যুক্ত। থানের পুরোহিত শিশুর পায়ে রক্ষাকবচ হিসাবে একটি লোহ বলয় 'ভাড়ুকা' পরিয়ে দেয়। শিশুটি বিশেষ কাল পর্যন্ত ঐ বলয়টি পরে থাকে ও মাথার চুল কাটে না।

পঞ্চানন্দকে পৌরাণিক আভিজাত্য প্রদানের চেষ্টায় এঁর ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা প্রচার করেন—কোন রমণীর গর্ভে শিবের ঔরসে পঞ্চানন্দের জন্ম (এই প্রচারটির মধ্যে পঞ্চানন্দের স্বরূপ বিষয়ে গবেষকরা কিছু তথ্য পেতে পারেন)। ইনি একটি বটুক ভৈরব বলেও পঞ্চানন্দের পরিচয় আছে। নাথ যোগীরা ধারণা করেন—ধর্মঠাকুর ও পঞ্চানন্দ অভিন্ন। কোন কোন গবেষক মন্তব্য করেছেন—পঞ্চানন্দ মিশ্র দেবতা, শিব ও আর্যেতর কোন আদিম জাতির রক্ত-মূর্তিবিশিষ্ট দেবতার সমাহার, অথবা আর্য-স্বীকৃতির পূর্বকালের শিব বা রুদ্র-দেবতার একটি অভিনব সংস্করণ। পল্লীবিশেষে পঞ্চানন্দ বৃক্ষাধিষ্ঠাতা ভৈরব বা ক্ষেত্রপাল বিশ্বাসেও পূজিত হন। কোন কোন স্থানে ইনি শ্মশান দেবতা বলে খ্যাত। পঞ্চানন্দের দানব বলে খ্যাতি বা অখ্যাতি আছে। উপাস্যের প্রতি দানব ধারণা আদিম যুগীয়। এই দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে ধরা যায় পঞ্চানন্দ দেবতা (তখন কি নাম ছিল জানা যায় না) আদিম যুগে পরিকল্পিত। ভক্তদের বিশ্বাস পঞ্চানন্দ আরোগ্য দেবতা।

প্রসঙ্গত একটি অল্পখ্যাত লৌকিক দেবতার উল্লেখ করছি, ইনি মাকাল বা মাকাল ঠাকুর নামে পরিচিত (কোন কোন স্থানে ইনি দেবী বলেও পূজিত হন)। বর্তমানেও এঁর কোন মূর্তি নেই, দুটি বা তার অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্রাকৃতি মাটির স্তূপ প্রতীকে পূজা হয়। জেলে মালাদের একান্ত দেবতা,

পূজায় পৌরাহিত্য তারাই করে, সম্পূর্ণ লোকায়ত বিধানে মাকাল পূজিত হন-নৈবেদ্য গাঁজা, ঘুঘনী ও মাছ দেওয়া হয়, পশু বলির রীতি ও আছে, পূজার নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই, তবে জলাশয় তীরে স্থাপন করা আবশ্যিক বিধান। মাকাল দেবতাটি অপ্রধান হলেও গবেষণাকারীদের নিকট এঁর প্রতীক ও পূজাচার মূল্যবান বলে মনে হবে।

● রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষক
মজিলপুর
২৪ পরগণা

লোককাব্যের ছন্দ

নীলরতন সেন

'চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা করে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা হয়েছে সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে ভোলাবার ও ঘুমপাড়াবার ছড়ায়, ব্রতকথায়।' *রবীন্দ্রনাথ ঃ বাংলাভাষা পরিচয়

উচ্চারণ রীতির দিক থেকে বাংলা ছন্দকে মুখ্য তিনটি শ্রেণীতে বিন্যাস করা যেতে পারে : (১) কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত (moric), (২) মিশ্র বৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত (composite moric) এবং (৩) দলবৃত্ত বা লৌকিক (syllabic)। —এর মধ্যে মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত রীতিকে মূলতঃ কলামাত্রিক বা কলা-একক ভিত্তিক ছন্দ বলা যেতে পারে ; আর লৌকিক রীতিকে দলমাত্রিক বা দল একক ভিত্তিক ছন্দ হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশ্য একথা স্বীকার্য, বিশুদ্ধ দলমাত্রিক ছন্দ বাংলায় নেই। লৌকিক ছন্দের দলমাত্রার অন্তরালে কলা বা সময় একক-সমতার একটা প্রচ্ছন্ন হিসেব থাকে।

ছন্দবিদ্‌রা জানেন, এ-কালের মাত্রাবৃত্তে মুক্তদল (open syllable) এক কলা (single time unit) এবং রুদ্ধদল (closed syllble) দুই কলা (double time-unit) হিসাবে উচ্চারিত হয়। এ ছন্দের চলন লঘুযতি ভিত্তিক ; পর্বগুলি সাধারণত সমপর্বিক,—চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রায় রচিত হয়। মিশ্র পর্বের পরীক্ষাও কবিরা কিছু কিছু করে থাকেন। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতায় (ব্রজবুলি গীতে) এ ছন্দের প্রাচীন একটা রূপ পাওয়া যায়। আরও পিছনে তাকালে জয়দেবের গীতগোবিন্দে বা প্রাকৃত অপভ্রংশ গীতে, আদি বাংলা চর্চাগীতে এর প্রাচীনতর রূপটি মেলে। — সেখানে মুক্তদলের লঘু-গুরু উচ্চারণগত তারতম্যে এককলা ও দুইকলা দুই ধরণের রূপ পাওয়া যায়। মাত্রাবৃত্তের আধুনিক রূপ রবীন্দ্রনাথের হাতেই ঠিকমত গড়ে উঠেছে।

অক্ষরবৃত্ত মিশ্র উচ্চারণরীতির ছন্দ। রুদ্ধদল শব্দপ্রান্তে দ্বিকলা, অন্যত্র যুক্তবর্ণের বানান থাকলে এককলা, অযুক্তবর্ণে লেখা হলে কোথাও এককলা কোথাও বা দুইকলা হিসেবে উচ্চারিত হয়। কবিরা এই অযুক্তবর্ণের রুদ্ধদল ব্যবহারে উচ্চারণগত কিছুটা স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন। মুক্তদল মাত্রাবৃত্তের মতো অক্ষরবৃত্তেও এককলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। —এছন্দের চলন দীর্ঘতর অর্ধযতি বা পদযতি-ভিত্তিক ; সাধারণত যুগ্ম-সংখ্যক হয়, আট ও দশ মাত্রায়

পদক্ষেপ ঘটে। সমগ্র মধ্যযুগের কাহিনীকাব্য—অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের অনুবাদ কাব্য, মঙ্গলকাব্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব জীবনীকাব্য এবং লৌকিক গীতিকাব্যে এ-ছন্দের ব্যবহার লক্ষিত হয়। মধ্যযুগে এ-ছন্দের ব্যবহারে যে নমনীয়তা (flexibility) বা উচ্চারণগত স্বাধীনতা কবিরা ভোগ করতেন উনবিংশ শতকে এসে সেটা আর রইল না। ছাপাখানার দৌলতে শ্রাব্যকাব্য যখন থেকে পাঠ্যকাব্যে রূপান্তরিত হল, তখন থেকে ধীরে ধীরে পঠনভঙ্গি বদলে গেল। সম্ভবতঃ ইংরেজি কাব্য পঠনরীতির সুরবর্জিত আদর্শটি বাংলায় অনেকাংশে প্রভাবিত হল; সেইসঙ্গে উচ্চারণে সুনির্দিষ্টতা এল, কবির এতদিনকার নমনীয় ছন্দ ব্যবহারের স্বাধীনতা খর্ব হল।

দলবৃত্তে বা লৌকিক ছন্দে দল বা syllable মাত্রার একক (unit of measure) রূপে গণ্য হয়। রুদ্ধ মুক্ত নির্বিশেষে, সাধারণত চারটি দলে এর লঘু চালটি ফোটানো হয়। ছেলেভুলানো ছড়া, ঘুমপাড়ানী গান, বাউলগীত, লোকগাথা, ব্রতকথা, শুভঙ্করীর আর্যা, খনার বচন ইত্যাদিতে এর যে লৌকিক রূপটি পাওয়া যায় দীর্ঘকাল ধরেই কুলীন সাহিত্যে তার প্রবেশাধিকার মেলেনি। মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের কল্যাণে শিষ্ট সাহিত্যে এখন দলবৃত্তের ব্যবহার সুপ্রচলিত হলেও পাশাপাশি লোককাব্যের ধারাটি গ্রামীণ সমাজে অব্যাহত রয়েছে। শিষ্ট সাহিত্যে এ ছন্দের সুনির্দিষ্টতা এসে গেলেও গ্রামীণ লোকগীতে এখনো উচ্চারণগত নমনীয়তা (flexibility) যথেষ্ট পরিমাণে রয়ে গেছে। পুরোনো একটি ছড়ার পাঠ পাওয়া গেছে,—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান।
'শিবু ঠাকুরের' বিয়ে হল 'তিন কন্যে' দান॥
'এক কন্যে' রাধেন বাড়েন 'এক কন্যে' খান।
'আর এক কন্যে' গোসা করে বাপের বাড়ী যান॥

এখানে 'শিবু ঠাকুরের' পর্বটি পঞ্চদল, 'তিন কন্যে' বা 'এক কন্যে' পর্বগুলি ত্রিদল, 'আর এক কন্যে' চতুর্দল তবে বলার ওজনে ভারী। কিন্তু শিশুদের সুরাশ্রয়ী নমনীয় পঠনভঙ্গিতে বাকী পর্বগুলির সঙ্গে ও গুলিও বেশ খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু ভদ্র পোষাক পরিয়ে একেই পরিমার্জিত করে লেখা হয়েছে,

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।

এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান,
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান ।।

[ছেলেভুলানো
ছড়া, নিত্যানন্দ
বিনোদ গোস্বামী
সংকলিত]

'শিবঠাকুর শেয়ালপণ্ডিতের নাম। আর একটি ছড়ায় সরাসরি 'শেয়ালের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যা দান' লেখা হয়েছে। সুতরাং শিষ্ট সমাজের মার্জিত উচ্চারণে ছন্দের ক্রটি ঢাকতে 'শিবুঠাকুর' কে 'শিবঠাকুর করা হয়েছে সন্দেহ নেই। এই একই ছন্দ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছড়া জাতীয় একটি রচনায় কিভাবে ব্যবহার করেছেন দেখা যেতে পারে,—

কবে বৃষ্টি পড়েছিল বান এলো সে কোথা।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল কবেকার সে কথা ।।
তিন কন্যে বিয়ে করে কি হল তার শেষে।
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে ।।
কোন ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান।
বৃষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান ।। [শিশু :
বৃষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর]

'তিন কন্যে' পর্বটি ছাড়া কবি এখানে লৌকিক দলবৃত্তের চতুর্দল পর্ব রচনার আধুনিক পদ্ধতি কোথাও লঙ্ঘন করেননি। ওই 'তিন কন্যে' পর্বটি ঢাকবার ফলেই প্রাচীন ছড়ার ক্ষীণ আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। নইলে, একে মার্জিত, পোষাকী, আধুনিক ভদ্রসমাজে পাঠ্য ছড়ারূপেই চিহ্নিত করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশু, শিশু ভোলানাথ, খাপছাড়া, ছড়ার ছবি, ছড়া প্রভৃতি ছোটদের জন্যে লেখা কাব্যগুলিতে লৌকিক দলবৃত্তকেই মুখ্য ছন্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তবে প্রায় কোথাওই চতুর্দল পর্বসীমা লঙ্ঘন করতে চাননি। কণিকা, পলাতকা ইত্যাদি বয়স্ক পাঠকদের জন্যে লিখিত কাব্যে এ ছন্দের নিয়মনির্দেশ আরও সুনির্দিষ্ট।

কিন্তু পল্লীগীত ও লৌকিক ছড়ায় এমন কৃত্রিম সুনির্দিষ্ট নিয়মের বাঁধন চলে না। এতে তার প্রাণের সহজ বিকাশোন্মুখ স্বাচ্ছন্দ্য ক্ষুণ্ণ হয়। দল বিন্যাসের শৈথিল্য সত্ত্বেও প্রস্বর দোলায়িত ঢেউ খেলানো চমৎকার উচ্চারণ-ভঙ্গিটি আঞ্চলিক লোকভাষার ছড়াগানে কেমন ফুটে ওঠে এখানে তার দু-একটি দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে,—

আবু আমার। পক্ষীটি গো॥
কোন্ না বিনে। চরে। I
আবু কৈয়া। ডাক দিলে॥
উড়্যা আইয়া। পড়ে॥ I
আয় চাঁদ। লৈড়্যা,॥
ভাত দিবাস। বাইড়্যা,॥
সোনার ক। পালে আমার॥
টুক্ দিয়া। যারে॥ I

মৈমনসিংহ অঞ্চলের এই ছেলেভুলানো ছড়ার মোট এগারটি পূর্ণপর্ব রয়েছে, তারমধ্যে চারটি ত্রিদল, একটি (আয় চাঁদ) দ্বিদল. বাকীগুলি চতুর্দল। তাতে উচ্চারণের দিক দিয়ে কোন শিশু পল্লী মায়েদের কোন অসুবিধার কারণ কোন কালেই ঘটেনি। পর্বের প্রথমে সামান্য ঝোঁক দিয়ে এবং পূর্ণ-অপূর্ণ সব পর্বেই ছয় কলার (mora) সুর টেনে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে থাকেন। চতুর্দল এ-ছন্দের পূর্ণপর্ব মতো, তাকে কমিয়ে তিন বা দু দলে স্বচ্ছন্দে আনা চলত। তবে এর পেছনে ছয় কলামাত্রার সুর রক্ষা করে ধ্বনিসাম্য রক্ষিত হত। আর একটি দৃষ্টান্ত তুলি.—

তাঁতির বাড়ি। ব্যাঙের বাসা॥ কোলা ব্যাঙের। ছাঁ, I
'খায় দায়' 'গান গায়' তাইরে নারে না।
… … …
একটা ছিল 'কোলা ব্যাঙ' বড়ই সেয়ানা
লেখন পাঠায়ে দিল পরগণা পরগণা।

[ছেলেভুলানো ছড়া-৫৪]

এখানে 'খায় দায়' বা 'গান গায়' দ্বিদল পর্ব, 'কোলা ব্যাঙ' ত্রিদল পর্ব। চতুষ্পর্বিক পংক্তিমাপ হল: ৪। ৪॥ ৪। ১I বা ৪। ৪॥ ৪।২ I। পংক্তিশেষের

ওই একদল অপূর্ণ পর্বটিও ছয়কলার সুর টেনে পড়তে হয়। তাতেই এ ছন্দের ধ্বনির আদলটি ফুটে ওঠে। উপরের দুটি দৃষ্টান্তেই কিছু পর্ব মিলছে যেখানে দলের ঘাটতি কলা সুর প্রসারণের সাহায্যে পুষিয়ে নিতে হচ্ছে। এমন দৃষ্টান্তও কিছু দুর্লভ নয় যেখানে দলের আধিক্য আবার কিছুটা উচ্চারণ সংকোচনের সাহায্যে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। যেমন,—

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে।
'বড় সাহেবের' বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
... ...
বকুল ফুল 'কুড়ুতে কুড়ুতে' পেয়ে গেলুম মালা,
রামধনুকে বাদ্যি বাজে সীতানাথের খেলা।

[ছেলেভুলানো ছড়া-৫৩]

এখানে 'বড়োসাহেবের পর্বে পঞ্চদল, কুড়ুতে কুড়ুতে' পর্বে ষট্‌দল। স্বভাবতই এ-দুটি পর্ব ওজনে ভারী। কিছুটা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের সাহায্যে আবৃত্তিকারকে সামলে নিতে হয়। কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরেই পল্লীর বালক-বালিকারা স্বচ্ছন্দভাবে এ-সব ছড়া পড়ে চলেছে। কোনো পল্লীকবি চতুর্দল পর্বের নিয়মে যে একে সংশোধনের প্রয়োজন বোধ করেননি সেটাই লক্ষ করবার বিষয়।

আসল কথা, এ-সব ছড়া গীতের পঠনভঙ্গি ঝোঁকালো, সুরাশ্রয়ী, ছয় কলার ওজনটা ঠিক রেখে, পর্বে পর্বে তানের ঝোঁক রক্ষা করে, যেখানেই কলার ওজনে কিছু কম পড়ছে সেখানে 'মীড় টেনে'১ এবং যেখানে দলের সংখ্যা কিছু

---

১. এই 'মীড়' বা সুর টানার মাধ্যমেই যে লৌকিক ছন্দের আসল উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে সেটি রবীন্দ্রনাথের কানেও ধরা পড়েছিল। 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন,

যাঁরা অক্ষর গণনা করে নিয়ম বাঁধেন জানিয়ে রাখা ভালো যে, স্বরবর্ণে টান দিয়ে মিড় দেবার জন্যেই প্রাকৃত বাংলা ছন্দে কবিরা বিনা দ্বিধায় ফাঁক রেখে দেন; সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ, সে সব জায়গায় ধ্বনির রেখা কিছু কাজ করবার অবকাশ পায়।

[রবীন্দ্রনাথ : ছন্দ (২য় সং-প্রবোধ সেন সম্পাদিত) পৃ. ৬৩]

বাড়তি হচ্ছে সেখানে উচ্চারণে সংশ্লিষ্টতা এনে লৌকিক দলবৃত্তের প্রাণস্পন্দন পল্লীর স্বভাব আবৃত্তিকাররা স্বচ্ছন্দে ফুটিয়ে তোলেন। এই স্বভাব আবৃত্তিকারের দলে পল্লীর ছেলে-বুড়ো, বউ-ঝি-মা-ঠাকুমা সবাই পড়েন।

হাল আমলের শিষ্ট সাহিত্যে দলবৃত্তের ব্যবহারে এ ছন্দের কৌলীন্য বেড়েছে সন্দেহ নেই। তাতে পোষাকী, মার্জিত, বেশ পরিচ্ছন্ন একটি রূপাদর্শ বা প্যাটার্ন চালু হয়েছে। কিন্তু পল্লীর এই পালিশহীন, স্বরাশ্রয়ী নমনীয় ছন্দে, যে বৈচিত্রময় প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়, খাঁটি গ্রাম্য আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারণের যে আমেজ পাওয়া যায় শিষ্ট সাহিত্যের আসরে সেই প্রাণের উত্তাপটুকুর অভাব বোধ করি।

লোকগীতির একটি বড়ো অংশ কাহিনীধর্মী, গীতিকা, বারমাস্যা, পুরাণ-কথা ইত্যাদি এই শ্রেণীতে পড়ে। এ জাতীয় রচনায় চার-চার-চার-দুই বা আট-ছয় মাত্রা বিন্যাসে পয়ারের কাঠামো বেশী এসেছে। যেমন—

মাঘ না মাসেতে রাম রে বনবাসে যায়।
অভাগিনী রামের মাগো কান্দিয়া বেড়ায়॥
রাজা অইতা রাজ্য নইতা মনে ছিল সাধ।
কেকই মা পাষাণী অইআ ঘটায় পরমাদ॥
আহা পুত্র রামচন্দ্র কৌশল্যানন্দন।
কিরূপে রইলা বনে তোমরা তিনজন॥

যাঁরাই এ-জাতীয় গীতের স্বরাশ্রয়ী আবৃত্তি শুনেছেন তাঁরা অনুভব করবেন, এখানে পূর্ণ পংক্তিটি চারটি প্রস্বরে, চতুষ্পর্বে বিভক্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পর্বে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্বের তুলনায় ঝোঁক বেশী। মাত্রার হিসেব নিতে গেলে দেখা যাবে এখানে দলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের পারস্পরিক এলাকা যেন মিলে মিশে রয়েছে। প্রথম পংক্তির 'রে' ধ্রুয়াটি পৃথকভাবে রাখলে, 'মাঘ না মাসেতে রাম বনবাসে যায়' এবং পঞ্চম পংক্তি 'আহা পুত্র রামচন্দ্র কৌশল্যানন্দন' অক্ষরবৃত্তের আদর্শে ৮॥৬ মাত্রার (দ্বিপদী) পয়ার হিসেবে পাঠ করবার প্রবণতা জাগে। কিন্তু বাকী সমগ্র গীতাংশটি

দলবৃত্তের পর্বভাগের আদর্শে পড়লেই পাঠক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। মনে হয়, মধ্যযুগের লোকগীতিতে (বোধ হয় শিষ্ট সাহিত্যেও কিছুটা) পয়ার ত্রিপদী বন্ধের রচনায় দলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের উচ্চারণগত পার্থক্য সর্বত্র সুনির্দিষ্ট ছিলনা। একের এলাকায় অপরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ এক ধরণের কুলীন অকুলীনের মেশামেশি বলা চলে।

লোকগীতের সব থেকে বড়ো ঐশ্বর্য, এর আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বৈচিত্র্য। চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর, ঝাড়খণ্ড থেকে শ্রীহট্ট—সমগ্র বাংলার বিচিত্র কথ্য বাচনভঙ্গি লোকগীতিতে প্রায় এক ছন্দ ও সুরবদ্ধ হয়ে আছে। সেটা সম্ভবপর হয়েছে এই নমনীয়, ঝোঁক এবং সুরের টান সমম্বিত, প্রাস্বরিক দলবৃত্তভঙ্গিম পঠনরীতির প্রভাবে। ভাষার এত বৈচিত্র্য মাত্রাবৃত্তে, অক্ষরবৃত্তে,—এমনকি পরিমার্জিত শিষ্টসমাজে প্রচলিত দলবৃত্তে ফোটানো সম্ভবপর নয় বলেই মনে করি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করছি।—

সাওতাল পরগণার ঝুমুর গান :

ঘ রে ত অন্ধন বাহিরেত গরুবাছুর
সব কিছু মিছা।
বনের কঠে গঁয়ের আগুন
সঙ্গে নিয়ে যায়॥ [বাংলার লোক সাহিত্য (১ম সং)
পৃ ১৭৪]

এখানে দলবৃত্তের আমেজ থাকলেও পর্বের দলসংখ্যা সমান নয় : পদ বা পংক্তি-শেষে মিলও নেই। মূলত: পর্বগুলির ঝোঁকালো, সুরেলা উদাহরণই ছন্দের বাঁধুনি রক্ষা করছে।

রঙপুর অঞ্চলের সোনাপীরের জাগগান,—

পীরের বরে জন্ম নৈল পুন্নমাসীর চান।
বাপে মায়ে রাখল তার সোনারায় নাম॥

... ...

ছাওয়াল তুলিয়া দাই কোলে তুল্যা নিল।
নাওয়াইয়া ধোওয়াইয়া তারে আসুত্ত করিল ।।
তোমার ছাওয়াল তুমি লওমা আমারে কিবা দিবা।
শুন্যা বাণ্ডা পাঁচ তঙ্কা দাইয়ের হাতে দিলা ।। ঐ : পৃ ১৮০]

এখানে অক্ষরবৃত্তের তুলনায় দলবৃত্তের পয়ারাদর্শই বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অক্ষরবৃত্তে শব্দপ্রান্তিক রুদ্ধদল দুইকলা হিসেবে উচ্চারিত হয়; লঘু চতুর্মাত্রিক যতির পরিবর্তে দীর্ঘতর আট, ছয় বা দশ মাত্রার যতি গুরুত্ব পায়। মুখ্য দুটি বৈশিষ্ট্যেরই অভাব এখানে চোখে পড়ে। সে তুলনায় ৪। ৪।। ৪।১/২ ‖ দলমাত্রার লঘু, প্রাস্বরিক প্রয়োগ অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জলপাইগুড়ির ভাওয়াইয়া গান ;—

কুকিলার কুহু কুহুরে—
(আরে মেরে) ময়ওরের ফ্যাকম্—
কোন দেশে থাকিয়া ও মোর বন্ধু, দেখালু স্বপন।
বালাই দেঙ তোর পিরীতের মাথাত রে।।
ধন্ কাঙালী সাউধের ছাইলা রে—
(আরে মোর) ধনক নাইগো মন,
ঘরে থুইয়া কাঞ্চা সোনা (ও মেরে বন্ধু) বৈদেশে গমন।
বালাই দেঙ্ পিরীতের মাথাত্ রে ।। [ঐ : পৃ ১৮৫]

সুরাশ্রয়ী এ-গীত অতিপর্বিক দোলায় সমৃদ্ধ। 'আরে মেরে', 'ও মেরে বন্ধু' শব্দগুচ্ছে একটি পৃথক দোলা সৃষ্টি করে; সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় হসন্তপ্রধান শব্দের যে ধ্বনি প্রবাহের আমেজ ফুটে উঠেছে সেটি দোতারা সহযোগে ভাওয়াইয়া,—বিরহাত্মক প্রেমের গান, — যারা শুনেছেন অনুভব করতে পারবেন। ঘরে কাঁচা সোনা সদৃশ বিরহিনী নবযৌবনা প্রেমিকাকে রেখে সাধুর ছেলের বাণিজ্য করে সোনা আনতে বিদেশ গমনের সার্থকতা কোথায়। কোকিলের কুহুতান, ময়ূরের পেখমতুলে নৃত্য বিরহিনীকে আরও আকুল করে তুলেছে। সেই আকুলতা গানের ছন্দে ও সুরে ফুটে উঠেছে। ভাব-অনুসারে পংক্তিগুলি অসমান, তবে চতুর্দল পর্ববন্ধন রয়েছে; প্রান্তিক মিল রয়েছে,—সে মিল কিছুটা শিথিল; সেই সঙ্গে রয়েছে 'বালাই দেঙ্ পিরীতের

মাথাত্‌রে' 'ধুয়া'টির আবর্তন। সব মিলিয়ে গীতটিতে এক পল্লী যুবতীর প্রেমবিরহের আকুলতা যেন বাক্‌ধ্বনিময় মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

ময়মনসিংহের জারী গান,—

দিশা : হায় হায় কাসিদ ভালো,
হায়, হায় কাসিদ !
মায় না ভজিলে তারে
ভজিবে এজিদ কিরে
হায় হায় কাসিদ !
হায় হায় কাসিদ ভালো ॥

বয়াত : মরবার বেলা একখান্‌ কথা কইয়া গেছিল্‌ ভাই
দখিনারে দিতাম্‌ বিয়া কাছুমালীর ঠাঁই
গো যদি না রয় একরার ;
আখেরে দোজখী অইব শুন সমাচার ॥ (হায়)
হায় কাসিদ···

[মোমেনশাহী লোকসাহিত্য : রওশান ইজদানী সংকলিত]

'দিশা' অংশটি গানের 'ধুয়া'; 'বয়াত' কাহিনীর বর্ণনাংশ। সুর এবং ছন্দোবন্ধে উভয়াংশের মধ্যে পল্লীকবি পার্থক্য রেখেছেন। তবে লৌকিক দলবৃত্তের ছাঁদে সবটাই রচনা করেছেন। মিল এবং পর্ববন্ধনও রয়েছে। প্রতি চারপংক্তি কাহিনীধর্মী গীতের পর 'হায় হায় কাসিদ ভালো···' দিশা বা ধুয়াটি বার বার ফিরে এসেছে।

কুমিল্লার উমালীবাড়ার গীত, (বিবাহোৎসবে আয়োজিত ধানভানার গীত। ঢেকির পাড় দেবার তালে তালে গাওয়া হয়।)

ঢাকা জিলার চাকরী করে
ফিইর‍্যা চিডি পাডায় না'
অ কন্যা মনের গোস্বা রাকক না"
তোমার কতা মনে আইলে
আতের কলয় ঘুরে না।

তোমার লাইগ্যা কিন্‌ছি সাড়ী
মার ডরে পাডাই না ॥
তোমার লাইগ্যা কিন্‌ছি বেলাইজ
বৈনের ডরে পাডাই না।
অ কন্যা মনের গোস্যা রাখিস না ॥

[লোক সাহিত্য-৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

স্পষ্টতই দলবৃত্তে রচিত। প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম পংক্তিগুলি পূর্ণাঙ্গ, ৪। ৪।। ৪।৩। দলপর্বে রচিত। দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ পংক্তি অভিন্ন, 'ধুয়া' হিসেবে ফিরে ফিরে এসেছে, গঠনেও পার্থক্য রয়েছে তিনমাত্রায় অতিপর্বিক দোলাসহ ৩) ৪।৩। মাত্রাভাগে রচিত। ঠিক এই ঢঙে রজনীকান্ত সেন তাঁর বিখ্যাত হাসির গান "বুড়ো বাঙ্গাল'২ রচনা করেছিলেন। সেখানে পর্বে চতুর্দল বিন্যাস নিয়মিত। গঠনে এবং ভাবে—উভয়দিক থেকেই শিষ্ট সাহিত্যের কৃত্রিমতা সেখানে ফুটে উঠেছে। এখানে অকৃত্রিম পল্লীগীত সুলভ মিল কিছুটা শিথিল, কবি প্রায় এক মিল সর্বত্র রেখে গেছেন। রজনীকান্তের গীতে দ্বিপদী চৌপদীর মিশ্র বন্ধে পংক্তি-মিল ও পদমিলের সচেতন বিন্যাস লক্ষিত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কাহিনীধর্মী লোকগীতিগুলিতে অক্ষরবৃত্ত ও দলবৃত্তের উচ্চারণগত কিছুটা সংমিশ্রণ ঘটেছে। পয়ার পংক্তিতে ৮।।৩ মাত্রায় পদযতি রক্ষিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দপ্রান্তিক রুদ্ধদলের প্রসারিত দ্বিকলা উচ্চারণের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট এককলার উচ্চারণ এসে গেছে। তাছাড়া এমন বহুপংক্তি পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে ৮।।৬ মাত্রার পদযতির পাশাপাশি ৪। ৪।। ৪।২ মাত্রায় লঘু পর্বযতিও ফুটে উঠেছে। পূর্ববঙ্গগীতিকা থেকে দু-একটি দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে—

২. বাজার হন্দা কিন্যা আন্যা, ঢাইলা দিচি পায় ;
তোমার লাগে কেমূনে পারুম্, হৈয়া উঠ চে দায়

রাইতের আন্ধার কাইট্যা গেল ভোরের আলো আইসে।
সন্ন্যাসী এক আইল সেইনা ভাঙ্গা দেউলের পাশে ॥
শিরে বান্ধা জটা চুল লম্বা মুছ দাড়ি।
আইল সন্ন্যাসী এক হাতে লইয়া খড়ি ॥
কন্যা দেইখ্যা সন্ন্যাসী যে ভাবে মনে মনে।
এ কোন্ বিধির কাম ঘটিল এই বনে ॥

[প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা :
১ম খণ্ড : বাইদ্যাকন্যা মহুয়া :
ক্ষিতীশ মৌলিক সম্পাদিত,
পৃ ৬৯]

প্রথম দুটি পংক্তিতে দলবৃত্তের উচ্চারণভঙ্গি অর্থাৎ লঘু চতুর্দলে ঝোঁকানো উচ্চারণের অবকাশ লক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তী চারটি পংক্তিতে আট ছয় মাত্রাভাগের অর্ধযতি এবং অক্ষরবৃত্ত ভঙ্গিম কিছুটা নিস্তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের প্রবণতা রয়েছে।

গীতিকায় পয়ারের ব্যবহারই বেশী। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর দ্বিপদী ও ত্রিপদীর ব্যবহার ও অল্পস্বল্প লক্ষিত হয়। উচ্চারণ রীতিতে অক্ষরবৃত্তের প্রভাবই সুস্পষ্ট, তবে মাঝে মাঝে লঘু পর্বভাগে দলবৃত্তের আভাস ফুটে উঠেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১০।৮ মাত্রার মহাপয়ার ;

গেরামের নাম না জানিবে বন্ধু,
তুমি জিগাইয়া লইও পথে।
বাইদ্যার দলের বাসা নেই না
আমি কইলাম বিধি মতে ॥ [ঐ ১খণ্ড : বাইদ্যাকন্যা
মহুয়া, পৃ ৩৮]

অবশ্য, এখানে প্রথম পংক্তির 'বন্ধু' এবং 'তুমি' ও দ্বিতীয় পংক্তির 'আমি' শব্দকে অতিপর্ব গণ্য করে, সেই সঙ্গে উচ্চারণে সংশ্লিষ্টতা এনে দলবৃত্তের

৪। ৪।। ৪।২ মাত্রাভাগে এ-ছন্দ পড়া চলতে পারে। পল্লীকবি কোন্ ভঙ্গি বেশী পছন্দ করেন জানবার কৌতূহল রইল।

৮।।৮।।১০ মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী :

সুধামাখা গানে তার কুকিলা মানয়ে হাইর
বীণাযন্ত্রী লাজেতে মৈলান।
যুবতী ব্যাকুল ঘরে যইবন্ সে আইসে ফিরে
নদীনালা বহেতে উজান।। [ঐ ৩য়খণ্ড লীলা কন্যা কবি কঙ্কপালা পৃ৩৫]

এখানে অক্ষরবৃত্তের উচ্চারণ অনেক স্পষ্ট হতে পেরেছে, হাইর, যইবন, আইসে-জাতীয় শব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও এ পংক্তিগুলি দলবৃত্তে পড়া কোনো-মতেই সম্ভবপর নয়।

আঞ্চলিক ভাষায় লোকগীতের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। একই গীত ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে কেমন রূপান্তর লাভ করেছে তারও নানা নমুনা দেখানো যেতে পারে। তবে ছন্দের আলোচনায় তার বেশী প্রয়োজন নেই। লক্ষ করে দেখা গেছে, শুধু বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নয়, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং মৈথিলী ভাষাতেও একই লোকগীতি ছন্দ, বিশেষ করে প্রস্বর প্রভাবিত চতুর্দল পর্বভাগের দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার ঘটেছে।

'ছড়া' এক ধরণের সংক্ষিপ্ত ছন্দবদ্ধ রচনা। তার পংক্তি সংখ্যাও যেমন কম থাকে, অনেক সময় পংক্তি দৈর্ঘ্যও খুব ছোট মাপের হয়। এখানে আলোচনায় ছেদ টানবার আগে ছোট ছোট, নানা মাপের কিছু ছড়ার নমুনা তুলছি।—

বোধহয় ধাঁধা জাতীয় ছড়াই মাপে সবচেয়ে ছোট।—

১। (ক) ধরে'
দিল ভরে। (জুতা)

(খ) হাঁটে
আর চাটে। (শামুক)

(গ) চিকাচিকা
ভুঁই নিকা। (দোকান)

(ঘ) মামার ছাগল
ছুঁলেই ম্যামায়। (হারমোনিয়ম)

(ঙ) একটুখানি গাছে
রাঙা বৌটি নাচে। (লঙ্কা)

(চ) রাঙা রাতা
উছুত্ মাথা। (মোচা)

প্রবচনও বেশ ছোট মাপের পাওয়া যায়।—

২। (ক) বিয়ে ফাঁদতে কড়ি।
ঘর বাঁধতে দড়ি ।।

(খ) পাথরে ভুলোনা হাত।
পরাজয় নির্ঘাত।।

(গ) পচা মরিচের দর যেমন।
দুবার বিয়ের বর তেমন ।।

(ঘ) বিয়ে বাকী যতদিন।
লেখাপড়া ততদিন ।।

(ঙ) ঝি জব্দ শিলে।
বউ জব্দ কিলে ।।

(চ) কড়ি পেলে
হরি মেলে।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি যেমন দলবৃত্তে পড়া চলে তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্রাবৃত্তেও পড়া চলে। অনেকগুলি মাত্রাবৃত্তেই যেন বেশী স্পষ্টতা পায়। যেমন, প্রথমগুচ্ছের প্রথম তিনটি দৃষ্টান্ত, এবং দ্বিতীয় গুচ্ছের খ, গ, ঘ এবং ঙ দৃষ্টান্তগুলি। তৎসত্ত্বেও মনে রাখতে হবে, লোকগীতির কবিরা মাত্রাবৃত্তে গান বাঁধেননি। তাঁরা অধিকাংশই লৌকিক দলবৃত্তে, এবং কাহিনীধর্মী কিছু রচনায় অক্ষরবৃত্তের ব্যবহার করেছেন।

৬ লোকগীতির রাজ্যটি হল, যাকে ইংরেজিতে বলে unsophisticated, অকৃত্রিম গ্রামীণ সমাজের সামগ্রী। এতে যেমন আঞ্চলিক বৈচিত্র্যময়

বাচনরীতি এবং সমাজ ভাবনা ও আনন্দ বেদনার খাঁটি ছবি ফুটে উঠেছে, তেমনি এক নমনীয়, সুরেলা ও েঁাকানো ছন্দভঙ্গিও ধরা পড়েছে। শব্দের ঐশ্বর্য, উপমার অভিনবত্ব, আঞ্চলিক বাক্‌রীতি এবং কথা সুরের মিতালী লোকগীতে যে গ্রামীণ টাটকা সৌরভের আমেজ এনে দিয়েছে শিক্ষিত সমাজের 'শিষ্ট সাহিত্যে' সেই অকৃত্রিম তাজা প্রাণের উত্তাপের অভাব অনেকেই বিশেষভাবে অনুভব করবেন। আজকাল এত জিনিষের রেকর্ড করা হয়, এই স্বভাবের ঘরের হীরকদ্যুতিময় ছড়া, লোকগীত, কেচ্ছা, গাজীর গীত ইত্যাদির কিছু রেকর্ড করার কথা লোকসংস্কৃতি প্রেমীরা ভাবছেন কি? পল্লীজীবনের অকৃত্রিমতা দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। শহুরে সভ্যতার চাক্‌চিক্যে পল্লীর অনেক খাঁটি সম্পদই তার মূলরূপটি হারাতে বসেছে। আরও ক্ষতি হবার পূর্বে অন্ততঃ কিছু খাঁটি জিনিষ রেকর্ডে ধরে রাখবার জন্যে লোকসংস্কৃতির গবেষকদের অনুরোধ জানিয়ে এ-আলোচনা শেষ করি।

● বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিভাগের প্রধান
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা লোকনাট্যে জীবন পাঠ

মানিক সরকার

লোক সমাজের চিত্তরঞ্জন ও নৈতিক শিক্ষার জন্য উদ্ভূত এবং অনুষ্ঠিত নাটকীয় ক্রিয়াকলাপ লোকনাট্যের উৎসভূমি। পূর্বের শ্রেণীহীন, বর্ণহীন, সম্প্রদায়হীন সমাজই লোক সমাজ। এ সমাজে উৎপাদন ও তার বণ্টনে প্রথা অনুসারে সমষ্টির ক্রিয়াকলাপ ও চেতনাই প্রধান ছিল।

লোকনাট্য (ফোক ড্রামা) নাট্যশাস্ত্রের আলোচিত নাটক নয়। তাই শাস্ত্রীয় আলোকে লোক নাট্যের যথার্থ পরিচয় পাওয়া অসম্ভব।

লোকনাট্যে নাটকের পূর্ণাঙ্গতা নেই, কিন্তু নাটকের বিশিষ্ট লক্ষনগুলি বীজাকারে রয়েছে। এই বীজগুলিই সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্রম বিকশিত হয়ে নাটক হয়েছে। তাই নাটকের ভিত্তি লোকনাট্য।

লোকধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং সামাজিক উৎসবাদিতে একটি অংশ প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করে, প্রত্যক্ষ অংশ নেয়; অপর অংশ তাতে উপস্থিত থাকে, সেই ক্রিয়াকলাপ দেখে, অনুভব ক'রে তারা পরোক্ষে অংশ নেয়। এই ক্রিয়াকলাপ নৃত্যে-গানে, কাহিনীতে, অঙ্গভঙ্গীতে একত্রিত হয়ে দৃশ্যাত্মক হয়ে ওঠে। এটাই লোকনাট্য। লোকনাট্য জাদুমুলক ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানের আদিম স্তর কোনো না কোন ভাবে অতিক্রম করে উদ্ভব হয়েছে। এর স্মৃতি লোকনাট্যে পাওয়া যায়।

লোকসাহিত্যের আলোচনা বাংলায় উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে সূচিত হয়। বিংশ শতকে এ আলোচনা আরও প্রসারিত হয়। লোকসাহিত্যের আলোচনা লোকসংস্কৃতিতে উন্নীত হয়। বর্তমানে একটি স্বতন্ত্র শাখারূপে

লোকনাট্যের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশের পরিবর্তে লোকনাট্যকে নিয়ে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ণের প্রয়াস চলেছে। এই 'মূল্যায়ণ'-এর পটভূমিতে এই আলোচনা আরম্ভ করা হচ্ছে।

বাংলায় লোকনাট্য শব্দটি অর্বাচীন, কিন্তু 'নাটগীত' শব্দটি বেশ প্রাচীন। এখানে ১৬শ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীবদনের রচিত মনসামঙ্গলের কয়েকটি পঙক্তি উল্লেখ করা যাক :

"ইহা দেখি ভক্তিভাবে যত গোপগণ।
দীপ ধূপে বলিদানে করয়ে পূজন ॥
নানামতে করে তথা বাদ্য নাট গীত।
হেন কালে এক কাজি আসি উপস্থিত ॥১

পুনরায়,

"জঙ্গলে নদীর কূলে   মিলিয়া সব রাখাল
নাটগীত মহোচ্ছবি করি ॥২

আরও

"নাটুয়ারা নাট করে গায়নে গায় গীত"২(ক)

মধ্যযুগের বিশাল মঙ্গলকাব্যে বাংলা ইতিহাসের বহু সত্য লুকিয়ে আছে।৩ মনসামঙ্গলের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির প্রথমটিতে দেখা যাচ্ছে, পূজা উপলক্ষ্যে মধ্যযুগের বাংলায় "নানামতে করে তথা বাদ্য নাটগীত"। আবার দ্বিতীয়টিতে আছে "জঙ্গলে নদীর কূলে। মিলিয়া সব রাখালে। নাটগীত মহোচ্ছব" করে। প্রথমটিতে গোপগণ এবং দ্বিতীয়টিতে রাখালগণ এ নাট গীতের কুশিলব। তাই" দেবালয়ই ছিল প্রথম রঙ্গালয়"৪ সর্বাংশে হয়তো সত্য নয়।

নাটগীত শব্দটি মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে বেশ প্রচলিত। নাট-গীতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া সাধারণভাবে ইহাকে নাটগীত বলিত"৫ মধ্যযুগে নৃত্য এবং গীত শব্দ দু'টি অজ্ঞাত ছিলনা। সেকালের কবিরা বহুস্থানে নৃত্য এবং গীত শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'নাটগীত' এবং 'নৃত্য-গীত' একই অর্থবহ হলে স্বতন্ত্রভাবে তাঁরা এ দু'টি শব্দের ব্যবহার করতেন না।

নাটগীত স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার হত। সম্ভবত যে নৃত্যগীতে নাটকীয়তা ছিল তাকেই 'নাটগীত' বলা হত।

মধ্যযুগের নাটগীতের ক্রমবিকাশেরও ইতিহাসে আছে, তারও গোড়ার কথা আছে। তাতে 'Magic Drama' অর্থাৎ জাদু-নাটকের' পর্বের ৬ কথা মনে রাখতে হয়। বাংলার 'হুদুমাদেও'—সেই জাদু-নাটকের স্মৃতি এখনও বহন করে চলেছে। লৌকিক ব্রতেও তার স্মৃতি এখনও আছে (৬ক)।

'নাট' কথাটির সঙ্গে কাহিনী, চরিত্র, অঙ্গভঙ্গী এবং গান-নাচ-বাদ্যযন্ত্র, দর্শক প্রভৃতি সবই যুক্ত হয়ে পড়ে। তাই প্রাচীন বাংলার 'নাট-গীত'ই বাংলা লোকনাট্যের অন্যতম উৎসরূপেই বিবেচনা করা যেতে পারে।

লোকনাট্য দিয়ে সম্প্রতি বাংলাভাষায় আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। কিছুকাল আগেও লোকসাহিত্যের ইতিহাসচর্চ্চায় কিন্তু লোকনাট্যের স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে বিশেষ কোন স্থান ছিল না। লোকনাট্য নিয়ে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস বিশারদগণ একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে বিশেষ আলোচনা করেননি, এমনকি বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে লোকনাট্য তার স্বকীয়তার মর্যাদা পায়নি। এ বিষয়ে লোকসংস্কৃতির গবেষকদের উপেক্ষা কম দুঃখজনক হয়।৭

সম্প্রতি এ আলোচনার মধ্যে লোকনাট্যের সংজ্ঞাগত ব্যাখ্যায় একাধিক অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে' গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখেমুখে প্রচারিত হয় তাই লোকনাট্য'' ।৮

অপরমতে 'লোকাশ্রিত কাহিনী, কাহিনী-আশ্রিত চরিত্র, চরিত্র অনুযায়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি, সহজ, সরল বলিষ্ঠতার সঙ্গে লোকগীত, নৃত্য, স্বল্প সংলাপ এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে ঋজুদৃঢ় ভাবভঙ্গীর দ্বারা লোকাকীর্ণ উন্মুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্যে যা' প্রকাশ হয় তা-ই সাধারণ অর্থে লোকনাট্য (ফোক-ড্রামা)'' ।৯

সংজ্ঞায়িত না করলেও বাংলার বিদগ্ধ-সমালোচক ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়, লোকসংস্কৃতি চর্চ্চার বিশিষ্ট ক্ষেত্র গবেষক শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব প্রমুক

বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে লোকনাট্য প্রসঙ্গে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করছেন। ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ লেখেন। রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে ১৯৭০ সালে বাংলা লোকসংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনাচক্রে লোকনাট্যের বিষয়ক মূল্যবান একটি প্রবন্ধ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ পাঠ করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে লোকনাট্যের সাতটি সাধারণ লক্ষণ তুলে ধরেন।১০

সাতটি সাধারণ লক্ষণ নিম্নরূপ :—

"এক লোকনাট্য সাধারণ লোকেদের দ্বারা সাধারণ লোকদের কাছেই পরিবেশিত হয়। এর রচয়িতা, শিল্পী গোষ্ঠী ও দর্শক সকলেই লোকায়ত স্তরের মানুষ।

"দুই শহর এবং বিদগ্ধ ও অভিজাত সমাজ থেকে দূরে গ্রামের মাটিতে মাঠ, ঘাট ও বারোয়ারী তলায় এই নাটকের উদ্ভব ও অভিনয় দেখা যায়।

"তিন খোলা আকাশের নীচে মুক্ত ও অবারিত আঙিনায় লোকনাট্যের অভিনয় হয়…।

"চার লোকনাট্য নির্দিষ্ট শিল্পশাসনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তার আকার ও আয়তন নিত্য পরিবর্তনশীল, দর্শকদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী তাতে নতুন নতুন উপাদান কেবলই প্রবেশ করতে থাকে।

"পাঁচ লোকনাট্যের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মমূলক। যেসব ক্ষেত্রে মানবিক বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয় সে সব জায়গাতেই ধর্মও নীতির সর্বজনমান্য আদর্শ জোরাল-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকনাট্য চিরকাল লোকশিক্ষার বাহনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সনাতন ভাবধারা ও ঐতিহ্য লোকনাট্যের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।

"ছয় লোকনাট্যের মধ্যে সাধারণত সংলাপ অপেক্ষা সঙ্গীতেরই প্রাধান্য…।

"সাত লোকনাট্যের অভিনয়ে আবৃত্তি ও সুরের প্রাধান্য আসা স্বাভাবিক, সূক্ষ্মভাবে অভিব্যক্তি অপেক্ষা জোরাল ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনই সেখানে বেশি। অতি শয়িতভাবে প্রকাশের জন্য সেই অভিনয়ে বহু জায়গায় মুখোস ব্যবহার হয় (পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি- তথ্য্ও জনসংখ্যা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ১২৯-৩০)।

এই সাতটি সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে আরও তিনটি লক্ষণ সংযোজন করার প্রস্তাব করা হয়। যথা:

"এক. লোকনাট্যের একটি বিশিষ্ট অংশ লোকনৃত্য। অভিনেতাদের সাজসজ্জা অতি সাধারণ। লোকনাট্যে লৌকিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

"দুই. ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, হাস্যকৌতুক (কখনও কখনও তা আদিরসাত্মক) প্রভৃতির আধিক্য রয়েছে, অর্থাৎ লোকনাট্যে হাসি, ঠাট্টা, তামাসা ইত্যাদির মাধ্যমে দর্শকদের রিলিফ দেওয়া হয়। কখনও আবার ব্যঙ্গের কষাঘাতে দর্শকদের পুলকিত করা হয়।

"তিন. লোকনাট্য প্রধানত অলিখিত। চরিত্রগুলি সংলাপের অনুশাসনের মধ্যে থাকে না। আসরের মধ্যে অনুষ্ঠান চলাকালে কি গানে কি সংলাপে নূতন নতুন বাক্যের নিত্য সংযোজন হয়ে থাকে। লেখনীর শাসন না থাকলেও লোকনাট্যের গান বা সংলাপ শৃঙ্খলাবিহীন যথেচ্ছ নয়। একটা অলিখিত কিন্তু অভিজ্ঞতাজাত শৃঙ্খলা জেনে চলে। এ ধরণের স্বাভাবিক, সহজ শৃঙ্খলা আছে বলেই লোকনাট্য নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে

মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে দর্শকদের মনকেও টেনে
রাখে'' বাংলা লোকনাট্যের ধারাও আলকাপ :
মানিক সরকার, 'মূল্যায়ণ', ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা,

লোকনাট্যকে একটি স্বতন্ত্র নাট্যশাখা হিসাবে বাংলাভাষায় উপস্থিত করবার আন্তরিক প্রয়াসের এটাই হল সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

লোকনাট্য শুধু শ্রবনীয় নয়, দর্শনগ্রাহ্যও। মুদ্রণযন্ত্র আবির্ভাবের পূর্বে এর কাহিনী 'মুখে মুখে রচনা এবং' 'মুখে মুখে প্রচার' হলেও একে দর্শনীয় করে তুলতে হয়েছিল। দর্শনীয় না হলে লোকনাট্য হয় না। এখানেই লোকগীতের সঙ্গে লোকনাট্যের একটি বড় পার্থক্য। যদিও লোকনাট্য। কখনই লোকগীতকে বর্জন করেনি। লোকনৃত্য দর্শনগ্রাহ্য। কিন্তু সকল লোকনৃত্যই লোকনাট্য নয়। বেশ কিছু লোকনৃত্য আবার লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। ছৌ-নৃত্য এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

লোকনাট্যের প্রাচীনরূপ পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। বর্তমানে যা পাওয়া যাচ্ছে তার একটির অংশ বিশেষ উপস্থিত করা যাক। নাম "রসিয়া" পালা।

রসিয়া বা রসিক গোয়ালা বংশজাত একজন যুবক। গ্রামের এক যুবতীকে সে ভালবাসে। গ্রামের মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। কখন বাঁশী বাজায়। যুবতীকে দেখলেই সে প্রেম নিবেদন করে।

কিন্তু যুবতী প্রেমিকের প্রেমনিবেদনকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না।
রসিয়ার প্রেমনিবেদনের চিত্র নিম্নরূপ :

রসিয়া—

শুনে আগে শুনগে আই
হামার ভাঙ্গা ঘরোৎ আলো করেক
আর কী আসিব তুই ?
তোক না দেখিয়া শুনে সে আই
বাউড়া হয়াছে পরাণ

পাছা পাড়্যা শাড়ী পরোৎ
তার খাচ্ছরৎ কি খুচ্ছরৎ কি চটক দেখতে মুই।
হামার কাছো আসি পরিত পাইত
হাটের বাছা বাছা শাড়ী
কানোৎ দিত সোনার মাকুড়ী।

যুবতী—

লজ্জা করিয়া ক্যামনে জানাই
তোরকে রসিয়া।
লজ্জা সরম নাই কি তোর
শুনিস না কি ওরে।
ঘরোৎ ত তোর নাই কি ভাঙা চটিখান
কানোৎ ক্যামনে দিব মাকুডী।
হালগরু কিছুই নাই
শেষেতে যায়া কি খাব ?
নাই খাব পান গুড়া,
ঘরোত যায় কি খাওয়াব।
এতই যদি হাউস থাকেরে
তিন কুড়ি পান দিয়া
লজ্জা হরবে বেট্‌টা।

রসিয়া—

নাইবা থাকিলো টাকা পয়সা
তোক বানালু বাইন্যা
হামি যত্ন বর,
হামরা দু'জনে সকল সময়
নিজের হাতে কাম করিব
ভরিয়া তুলিব প্রাণের টানে
নাইবা থাকিলো টাকা কড়ি
হামি আছি আর আছে মোর যৈবন।

যুবতী—

তুই হলি গোয়ালার ছৈলা
তোর সনে মুই না করি পীরিত

রসিয়া—

আর বিধি কি হইল বাম
ওরে কানতে কানতে মই লো
তোমার ছাওয়াল
ক্যামনে হদিশ পায়।

যুবতী—

কোন্টে গেল রসিয়া মোর
ওগো রসিয়া
না পার মুই থাকতে ঘরোৎ
মনটা করছে হরোৎ-ফরোৎ
আগুন জলে হিয়ার মাকোৎ
কোন্টে গেল রসিয়া মোর।১১

(সংগ্রাহক : চিত্তরঞ্জন দেব)

লেখার মাধ্যমে উপস্থাপিত এই দৃষ্টান্ত এবং "রসিয়া" পালার মঞ্চস্বরূপ এক নয়। মঞ্চে পালার শেষ অংশে নায়িকার বিরহ নানাভাবে তীব্র করে তোলা হয়। পালায় গান হয়, বাজনা বাজে, নাচ হয়। আরও হয় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, সংলাপও কিছু থাকে। সবটা মিলিয়েই হয় নাটকীয়তার সৃষ্টি।

লোকনাট্য শুধুমাত্র লোকরঞ্জনের জন্য নয়। গণশিক্ষার বিষয়ও তার মধ্যে রয়েছে। লোকনাট্যে যুবক-যুবতীর প্রেম, শুধু প্রেমেই পূর্ণ নয়। লৌকিক প্রেমের পূর্ণতা ঘর বাঁধার সার্থকতায় মূর্ত হয়ে ওঠে। পূর্বোক্ত সেই ঘর বাঁধার মধ্যে বিপত্তি আছে, সমাজের বর্ণগত কু-সংস্কারের বিপত্তি। 'গোয়ালার ছৈলার' সঙ্গে যুবতী কী করে 'পীরিত' করবে? তাই বিচ্ছেদ আসে। সে বিচ্ছেদ কার্য্যত আমাদের সমাজের বর্ণবিদ্বেষগত কুসংস্কারকে আঘাত দেয়।

বিচ্ছেদে বিহ্বল যুবতীর বেদনায় অতি সাধারণ শ্রদক সমাজ বর্ণতগত হীনমন্যতা ও বিদ্বেষকেই অভিশাপ দেয়।

লোকসাহিত্যের প্রভাবিত শিক্ষা 'অ', 'আ', 'ক', 'খ'-র মতো শিক্ষা নয়। এ শিক্ষা মনের, সমাজের, এ শিক্ষা সমগ্রের। "সমাজশিক্ষার এমন জীবন্ত বাহন দুর্লভ। ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন ও গানে বা লোক কথায় একদিকে যেমন চিত্তরঞ্জনের কাজ করে, অন্যদিকে আমাদের নৈতিক আদর্শ, সামাজিক ন্যায়বিচার, রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।"১২

লোকনাট্য ও লোক শিক্ষায় বাহন হয়েছে। "চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা স্ব স্ব কার্যে দক্ষতা, কর্তব্য কার্যে উৎসাহ, এ শিক্ষাই শিক্ষা। (লোকশিক্ষা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ পৃঃ ৩৯২)। শিক্ষা হিসাবে লোকনাট্যে পাপ-পুণ্যের বিষয়টি উত্থাপিত হয়। যে কোন অশুভ কাজই পাপ কাজ, সকল শুভকাজই পুণ্যের কাজ। এক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের বিচার একেবারেই পার্থিব। এতে অপার্থিব কিছু নেই। 'চোরচুরনী' পালায় চুরি, 'বনবিবি' পালায় দরিদ্র দুখের উপর ধনী মোনার অত্যাচার পাপ বলেই বিবেচিত হয়। দক্ষিণরায়ের হিংস্র কবল থেকে দুখেকে রক্ষা করাটাকে পুণ্যকাজ বলেই গণ্য হয়। আবার 'আলকাপে' স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া একটা পাপ কাজ। 'গম্ভীরা গানে' অবাধ্য পুত্রের কার্যকলাপ পাপ রূপেই চিত্রিত হয়। লোকনাট্য কোথাও এই পাপ-এর গৌরব ঘোষণা করেনি, পুণ্যের জয় চেয়েছে।

লোকগীতের ন্যায় লোকনাট্যেও কয়েকটি প্রিয় চরিত্র আছে। যথা, রাম-সীতা, রাধাকৃষ্ণ, হর-পার্বতী প্রমুখ। মহাকাব্য বা পুরাণের কাহিনীর বিশেষ অংশ নিয়ে লোকগীত আছে, আছে লোকনাট্যও। লোকনাট্য এই কাহিনী ও চরিত্রগুলির মাধ্যমে মানুষের চরিত্রের দৃঢ়তাকে বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে, তার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

'আলকাপে' নারী ও পুরুষের উক্তি এবং প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্যকে ফুটিয়ে তুলে সমাজবন্ধনের ভিত্তিমূল যে দাম্পত্য বন্ধনতাকেই

দৃঢ় করে তোলবার চেষ্টা হয়। 'আলকাপের' 'রঙ'-এ শেষ লাইনে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে স্বামী বলে :

গুড় মিষ্টি, মধু মিষ্টি, হে কন্যা আরও মিষ্টি চিনি।
তার চেয়ে অধিক মিষ্টি তোমার হাতের পানি।
হে কন্যা তোমার হাতের পানি।

(নিজস্ব সংগ্রহ)

পানির কোন স্বাদ নাই। কিন্তু স্ত্রীর হাতের পানি স্বামীর কাছে গুড়, মধু ও চিনির চেয়েও মিষ্টি। মিষ্টি এখানে দাম্পত্য সম্পর্কটি। স্ত্রীর হাতের পানি সেই মধুর সম্পর্কের দ্যোতক।

শুধু দাম্পত্য বা পারিবারিক নয়, সামাজিক সম্পর্ককে দৃঢ় করবার জন্যও লোকনাট্য সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি ও ঐক্যের মহৎ শিক্ষা দিয়ে থাকে। 'গম্ভীরা গানে' এর বহু দৃষ্টান্ত আছে, আছে 'আলকাপে'। গম্ভীরার কটি লাইন :

ওহে কাশীশ্বর,
আমরা সব হিন্দু মুসলমান,
মিলে হয়্যাছি সমান।
ওহে কাশীশ্বর।
মিলে হয়্যাছি সমান।

(নিজস্ব সংগ্রহ)

লোকনাট্যের বড় শিক্ষা মর্ত্যপ্রীতি, জীবনপ্রীতি, কর্মপ্রীতি ও সমাজ-প্রীতি। তাই 'আলকাপ' লোকনাট্যের গানে শোনা যায়—

"ও কৃষকদল,
এগিয়ে চল,
চল ভাই মাঠের কাজে।
মোদের দেহে আছে বল,
ক্ষেতে আছে জল,
ধর চেপে হাল সকাল-সাঁজে।

(নিজস্ব সংগ্রহ)

শিক্ষার দু'টি দিক—এক, পুঁথিগত-শিক্ষা, দুই, জীবন-শিক্ষা। লোকনাট্যে পুঁথিগত শিক্ষার কোন বিশেষ স্থান নেই। কিন্তু সেখানে মাটি মাখা জীবন ও জগতের পাঠ নেবার স্থান যথেষ্ট। এখানেই তার মহত্ত্ব।

রামায়ণ ও লোকবৃত্ত

পল্লব সেনগুপ্ত

০.১. রামায়ণ তথা সমস্ত মহাকাব্যেরই উৎস লুকিয়ে রয়েছে লৌকিক সাহিত্য প্রকরণের মধ্যে, শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হতে পারলে এই নিবন্ধের অবতারণা করার কোনো প্রয়োজন হত না। শুধু উৎসেই নয়, তার প্রবাহের মধ্যেও যে লোকবৃত্তের জোয়ার-ভাটা সদাসঞ্চরণশীল, আপাতত আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য সেইটিই।

০.২. আদিম মানুষের প্রথম সাহিত্য গড়ে উঠেছিল সৃষ্টি রহস্য, ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ, প্রাণের উদ্ভবের সূত্র প্রভৃতি বিষয়ে তাদের বিচিত্র কল্পনায় গড়ে তোলা এবং অ-লৌকিক নানান-সত্তা ও ঘটনাকে অবলম্বন করে। এগুলিকে বিশেষজ্ঞরা নাম দিয়েছেন 'মীথ্' বা লোক-পুরাণ বলে। প্রতিটি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীরই নিজস্ব সাংস্কৃতিক ইতিহাস গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে এই সব মীথ্গুলির অবদান অপরিসীম। তাদের ঈশ্বর ও দেব-কল্পনা, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত আচার-বিধি ইত্যাদি বিষয় বিবর্তিত হবার উৎসে এবং প্রবাহে লুকিয়ে থাকে এই সব মীথ্গুলি।

০.৩. কোনো-কোনো লোকবৃত্তবিশারদ মীথ্ সম্পর্কে এই বলে মন্তব্য করেছেন যে, এগুলি আসলে হল, "প্রাক্-বিজ্ঞান যুগের বিজ্ঞান-সন্ধিৎসার অভিব্যক্তি।" এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে লৌকিক-পুরাবৃত্ত সম্পর্কে খানিকটা পর্যন্তই ধারণা করা চলে, মীথের রূপান্তর ঘটে কেমনভাবে তার কোনো হদিশ এর থেকে মেলা সম্ভব নয়। সে বিষয়ে বরং সামগ্রিক একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এঙ্গেলস এবং মার্ক্স। তাঁদের মতে, সমস্ত লৌকিক পুরাবৃত্তই গড়ে উঠেছে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আদিম মানবসমাজের নানাবিধ কল্পনার ধাত্রীগৃহে; সমস্ত প্রাকৃতিক সংঘটনের পিছনে যে সমস্ত শক্তি নিহিত

থাকে, তাদের যথার্থ পরিচয় খুঁজে না বার করতে পারার জন্যই তাঁরা কল্পনার মাধ্যমে ঐ সমস্ত সংঘটনগুলিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করত, আর ঠিক সেই জন্যই যখন থেকে মানুষ ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করল, তখন থেকেই 'মীথ্' তার প্রাথমিক গুরুত্বও হারাতে লাগল এবং সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হতে লাগল 'লিজেণ্ড' এবং 'টেল্'-এ (পুরাণকথা এবং লোককথায়)।

১.১. মীথ্ গড়ে ওঠার যুগে আদিম মানুষ বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে যে সমস্ত দেবতা এবং উপদেবতাকে মুখ্য কুশীলব রূপে কল্পনা করেছিল, লিজেণ্ড এবং টেল্ গড়ে ওঠার পর্বে তাদের অনেকেই হারিয়ে গেল কাহিনী-মালা থেকে। প্রখ্যাত লোকবৃত্তবিদ গ্রীম-ভাইরা এই জন্যই লোক-কথাকে "ভেঙে-যাওয়া লোক-পুরাণ" আখ্যা দিয়েছেন।

১.২. মীথ্, লিজেণ্ড এবং টেল্ এই তিনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি তাহলে কি ? 'মীথ্ টেল্' এবং 'মীথ্ লিজেণ্ড,' এই সূত্র আমরা '০.৩' অনুচ্ছেদে নির্দেশ করেছি। কিন্তু টেল্ আর লিজেণ্ডের সম্পর্কটি তার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয় না। এখানে স্মরণ রাখতে হবে ভিন্নতর একটি সূত্র : মীথের নায়কের মধ্যে ঐশী বা দৈবীভাবের ব্যত্যয় ঘটে গেলে, অর্থাৎ মানবিক দোষগুণই প্রবল হয়ে উঠলে সেটি যেমন টেল্-এ পরিণত হয় ঠিক তেমনই কোনো মানব-চরিত্র কাহিনীর মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতাধর বা দেবতার অবতার হিসেবে চিত্রিত হলে সেই কাহিনী রূপান্তরিত হয় লিজেণ্ডে। অর্থাৎ :

(ক) মীথ্ − ঐশীভাব = টেল্

(খ) টেল্ + ঐশীভাব = লিজেণ্ড

∴ (গ) মীথ্ > টেল্ > লিজেণ্ড

১.৩. স্পষ্টতই, লিজেণ্ড হল ইতিহাসের যুগের সৃষ্টি, মীথ্ যেমন প্রাগিতিহাসের আমলের। টেল্ হল এই দুই পর্বের সন্ধিলগ্নের জাতক। তবে এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, সভ্যতার অগ্রগমনের ফলে মীথের মৃত্যু ঘটলেও, টেল্ এবং লিজেণ্ডগুলি পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের-কেও বদ্‌লে বদ্‌লে চলতে থাকে। অপরিবর্তিত থাকে শুধু তাদের মূল

অভিপ্রায় বা 'মোটিফ্'-গুলি। অসংখ্য মোটিফের সমাহারের ফলে গড়ে ওঠে 'এপিক্' ওরফে মহাকাব্য, যার মধ্যে আশ্রয় পায় অগুণতি লিজেণ্ড। মীথ্ — টেল্ — লিজেণ্ড ~ এর সবই ছিল মৌখিক (মীথ্ শব্দটিই এই মৌখিক-ধর্মের পরিচয়বাহী), এপিকের মোহানায় মিশে তাদের রূপান্তরণ ঘটল লিখিত সাহিত্যে। 'ফেব্ল' কিংবা পশুপাখীদের মানবিকগুণান্বিত নীতিগল্পগুলিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেখানে মেশে।

২.১. 'মোটিফ' কিংবা অভিপ্রায়ই হল তাহলে লোকবৃত্তের অপরিবর্তনীয় বস্তু-উপাদান। মানুষের জীবনচর্যার বিবর্তনের ইতিহাসে এদের গুরুত্ব তাই অসীম। মোটিফের মূল লক্ষণ হল অস্তস্বতন্ত্রতা বা ব্যতিক্রমধর্মিতা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মোটিফ-বিদ ষ্টিথ টমসন একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে এই লক্ষণটির বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন : মা স্নেহময়ী হওয়াটাই শাশ্বত ও সর্বজনীন ; নিষ্ঠুর জননী কদাচিৎ মেলে। সে জন্যই স্নেহময়ী-জননী কোনো কোনো বিশেষ মোটিফ নয়, কিন্তু নিষ্ঠুরা-মাতা অবশ্যই একটি বিশেষ মোটিফ্। 'পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া'র মধ্যে কোনো মোটিফ নেই, কিন্তু 'অদৃশ্য চেহারা ধারণ করে হেঁটে যাওয়া' অবশ্যই একটি বিশিষ্ট মোটিফ-সম্পৃক্ত বিবরণ।

২.২. মোটিফের আর একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য হল সর্বদেশে, সর্বকালে এরা এক ; দেশ-কাল, ভেদে ওপরের কাহিনীটার চেহারা পৃথক হতে পারে, কিন্তু ভিতরের অভিপ্রায়গুলি অভিন্ন। কাহিনীর 'টাইপ' বা প্রকার/প্রকরণ আলাদা হলেও, মোটিফের প্রাণবস্তু তা নয়।

২.৩. মোটিফের এই সর্বদেশিকতার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে : 'মহাপ্লাবন'-কেন্দ্রিক কাহিনী পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতি লোকপুরাণের মধ্যেই আছে ~ সুমেরিয়া থেকে ইষ্টার দ্বীপ, চিলি থেকে চীন, নরওয়ে থেকে দক্ষিণ-আফ্রিকা সর্বত্রই এই বিশ্ব-নিমজ্জনকারী প্লাবনের কাহিনী প্রচলিত। বাইবেলের নোয়া যে প্লাবন থেকে প্রাণীকুলের অস্তিত্ব রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তার সঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের 'প্রলয় পয়োধি জলে'র মোটিফ্‌গত কোনো ভিন্নতা নেই। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে, লোকবৃত্তের ভিত্তির ওপর ভর করেই ধ্রুবপদী সাহিত্য গড়ে ওঠে, তাই শুধু বাইবেল বা ব্রাহ্মণ

গ্রন্থেই নয়, অন্যান্য বহুদেশের ধ্রুবপদী গ্রন্থেও ঐ 'মহাপ্লাবনে'র মতো অজস্র মোটিফ সমাবৃত হয় ; এদিকে ত বটেই।

২.৬. এই ব্যাপারটি পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন মহাকাব্যেই ঘটেছে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডেসী, গিল্গামেশ, পোপোলভূঃ, বেউলফ্ প্রভৃতি প্রখ্যাত এবং প্রভাবশালী মহাকাব্য থেকে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় মহাকাব্যধর্মী গ্রন্থগুলি অবধি কোথাও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যেখানে মহাকাব্যের কাহিনীটির প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া গেছে ~ যেমন, ইলিয়াড সেখানে মোটিফগুলির অন্তর্নিহিত অলৌকিক-বিশ্বাস-সমূহ বর্জন করে বিশ্লেষণ করলেই, মহাকাব্যটির সামগ্রিক ঐতিহাসিক কাঠামোটুকু খুঁজে পাওয়া যায়। রামায়ণ কিংবা মহাভারত এখনও সেই ঐতিহাসিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

৩.১. সাম্প্রতিক কালে রামায়ণ-কাহিনীর উৎস-সন্ধান করতে গিয়ে এদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর একাংশের মধ্যে বিরাট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। রামায়ণ ইলিয়াডের প্রেরণাজাত কি-না, দশরথ-জাতকের সঙ্গে প্রচলিত রামায়ণের সম্পর্ক কি, ঋগ্বেদে রামকথার আদি উৎস লুকিয়ে আছে কি-না, ইত্যাদি বিষয়ে পণ্ডিতেরা নানান্ তথ্য ও তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। আরেকদল গবেষক রাম-কাহিনীর প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক ও অন্যান্য ধরণের বৈজ্ঞানিক-ভিত্তিও অনুসন্ধান করছেন। লঙ্কা কোথায়, রাক্ষসরা কারা, রাবণ শব্দের অর্থ কি, রামচন্দ্র আদৌ বিন্ধ্যপর্বত পার হয়েছিলেন কি-না, ইত্যাদি বিষয়ে এঁরা অনেক চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত করেছেন, যার অনেকগুলিই বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। এছাড়া আছেন ভক্তি বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা! এঁরা রামকে ঈশ্বরের অবতাররূপে ভজনা করেন, ইক্ষ্বাকু বংশের ঐতিহাসিকতা নিঃসন্দেহে তদগত চিত্তে মেনে নেন, রাম-কাহিনীকে ষাট হাজার বছরের প্রাচীন বলে মনে করেন ~ ইত্যাদি, ইত্যাদি!

৩.২. মূলত এই তিনবর্গের রামায়ণ-বিদরা রাম-কাহিনী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। এঁদের মধ্যে তৃতীয় দলটির প্রসঙ্গ ভক্তসমাজের চৌহদ্দির বাইরে আলোচ্য নয়। প্রথম বর্গের পণ্ডিতদের মধ্যে কেউই সাহিত্যিক-

নিদর্শনের সুনির্দিষ্ট এবং অকাট্য এমন কোনো যুক্তির প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, যার দ্বারা তাঁদের কারুর মতকেই মেনে নেওয়া চলে। বরঞ্চ, দ্বিতীয় দল, যাঁরা বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে সমস্ত ব্যাপারটিকে বিচার করে দেখতে চেয়েছেন, তাঁদের বক্তব্যের ভিত্তি সাহিত্য-নির্ভর গবেষকদের সিদ্ধান্তের চেয়ে দৃঢ়তর।

৩.৩. কিন্তু লোকবৃত্তের ভিত্তির ওপরে রামায়ণ কাহিনীর বিশ্লেষণ এ অবধি হয়নি, যা হলে এ বিষয়ে নূতন আলোকপাত করা সম্ভবপর হতে পারত। লোকবৃত্তের সঙ্গে এপিকের সম্পর্কটি যে কতখানি ঘনিষ্ঠ, তার হদিশ '২.৩.' অনুচ্ছেদে নির্দেশ করা হয়েছে। আমরা জানি যে, সেই সৃষ্টিই কালক্রমে ধ্রুবপদিত্ব অর্জন করে, যার মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য, অন্তত বহুজনগ্রাহ্য টাইপ এবং এবং মোটিফ অজস্রহারে সন্নিবিষ্ট হয়। অর্থাৎ, ধ্রুবপদিতার মৌলিক ভিত্তিই হচ্ছে লোকগ্রাহ্যতা, যা কি-না লোকবৃত্তের পক্ষেও প্রাণ-স্বরূপ। রামায়ণ-কাহিনী এত শতাব্দীর পলি সঞ্চয় করে আজ যে ধ্রুবপদিত্বের মর্যাদা লাভ করতে অক্ষম হয়েছে, তারও ভিত্তি হচ্ছে এর অন্তর্নিহিত লৌকিক বা লোকায়নিক ধর্ম।

৩.৪. রামায়ণের মূল কাহিনীটিই তো লৌকিক : বলতে পারি রূপকথা-ধর্মী। স্ত্রৈণ রাজা সুয়োরাণীর বায়না মেটাতে দুয়োরাণীর ছেলেকে দিলেন বনে নির্বাসন। সেখানে সে চৌদ্দ বছর নানান দুঃখ এবং বিপর্যয়ের মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে রাক্ষসকে বধ নিয়ে দেশে ফিরল এবং রাজা হয়ে সিংহাসন বসল। রূপকথার এই বহু-পরিচিত ছকটির উপরেই কি রামায়ণ-কাহিনীর মূল রূপটি বিন্যস্ত হয়নি ?

৩.৫. তাহলে যে কাহিনীর মৌলিক সত্তাটিই হচ্ছে লোকবৃত্ত-নির্ভর, তার মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে যে সব ঘটনার বিন্যাস করা হয়েছে, সেগুলিও যে লোকবৃত্ত-সঞ্জাত হবে, তা আর বিচিত্র কি ? শুধু 'প্রকার' বা 'টাইপে' নয়, 'প্রকরণে' বা 'অভিপ্রায়ে'ও ('মোটিফ') রামায়ণী কথামালা যে লোকায়ন-ধর্মী, সেটি বলতে চাওয়াই এখানে অভীপ্সিত।

৩.৬. এই আলোচনায় যে সব 'মোটিফ' বা 'অভিপ্রায়'-সূচক বিভাগ এবং নির্দেশক সংখ্যা উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলি লোকায়নবিদ্ সমাজে সর্ব-

জনীনভাবে স্বীকৃত ষ্টিথ্‌ টম্‌সন সংকলিত অভিধানের অনুসারী, এটুকু আগেই বলে নেওয়া যেতে পারে।

৩.৭. রামায়ণ-কাহিনীর প্রধানতম প্রকরণ বা অভিপ্রায় হল 'অপহরণ' বা 'অ্যাবডাকশন', যা-কিনা পৃথিবীর বহু দেশের লোককথায়ই একটি বহু প্রচলিত উপাদান। এই মূল প্রকরণকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি উপ-প্রকরণ নির্দেশ করেছেন লোকবৃত্তবিদ্‌ ষ্টিথ্‌ টমসন, যাদের অনেকগুলিই রামায়ণ-কাহিনীতে বিদ্যমান। অপহৃতা বধুর অ-মানবীয় লোকে গোপনে থাকতে বাধ্য হওয়া (এফ. ৩২৪.৪); রামায়ণে রাক্ষসপুরীর অশোক বনে বন্দিনী সীতাকে এই উপ-প্রকরণের সঙ্গে মেলানো চলে স্বচ্ছন্দেই। প্রাসঙ্গিক উপ-প্রকরণ হিসাবে এখানে আরো কয়েকটির উল্লেখ করা হল : অপহৃতা বধুর হরণের সময়ে ছুঁচের কাজ ইত্যাদি চিহ্ন পথে ছড়িয়ে যাওয়া (এইচ. ১১৯.২), দৈত্য (এক্ষেত্রে, রাক্ষস) কর্তৃক নারীর অপহরণ (জি. ৩০৩.৯.৫), ভিখারীর ছদ্মবেশে এসে নারীহরণ (কে. ১৩১৫.১০), নায়ক কর্তৃক অপহৃতা নায়িকার পুনরুদ্ধার (আর. ১৬১.১)। মূল কাহিনীর সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত নয়, এমন একটি পরনারীসম্ভোগের কাহিনীও রামায়ণে আছে, যেটিও এই গোষ্ঠীর উপ-প্রকরণ। গৌতমের ছদ্মবেশে এসে তাঁর স্ত্রীকে ইন্দ্র যে সম্ভোগ করেছিলেন, সেটিও 'অপহরণ'-প্রকরণভুক্ত (কে. ৭৫৫.১, কে. ১৩১০. এফ. ১)।

৪.১. রামায়ণের মূল কাহিনীটিকে মোট সাতান্নটি অংশে বিভক্ত করা চলে। এদের প্রত্যেকটিই লৌকিক-প্রকরণ বা ফোক-মোটিফ অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। নিচের সারণীতে এগুলিকে ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং কোন্‌ আখ্যানাংশটি কোন্‌ শ্রেণীর মোটিফকে আশ্রয় করেছে আর তার সূচক সংখ্যাটি (ইনডেক্স নাম্বার) কি, তা-ও উল্লেখিত হয়েছে :

আখ্যান-ক্রম	রামায়ণের প্রাসঙ্গিক ঘটনা	প্রকরণ / উপপ্রকরণের উপজীব্য	অভিপ্রায়	সূচক সংখ্যা
১.	অন্ধমুনির অভিশাপে দশরথের বিপর্যয়	অভিশাপ / শাপমন্ত্রে সর্বনাশ	'কিং' ও 'ম্যাজিক'	ডি. ১৪০২.১৫

আখ্যান-ক্রম	রামায়ণের প্রাসঙ্গিক ঘটনা	প্রকরণ / উপপ্রকরণের উপজীব্য	অভিপ্রায়	সূচক সংখ্যা
২.	সীতার জন্ম	ধরিত্রীরূপা জননী ; মৃত্তিকাগর্ভ থেকে জন্ম ; পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে নারীর আবির্ভাব	'মাদার' 'গ্রাউণ্ড' ও 'আর্থ'	টি* ৪০১, টি. ৫৪৫, এ. ১২৩৪.৪
৩.	জনক-কর্তৃক রামচন্দ্রকে দিয়ে হরধনু ভঙ্গ করানো	কন্যাদানের সর্তস্বরূপ ভাবী জামাতাকে কঠিন পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা	'ব্রাইড'	এইচ. ৩১০. এফ-এফ
৪.	কৈকেয়ীর আবদার	সপত্নীর সন্তানকে নির্বাসনে পাঠানো	'স্টেপ চিলড্রেন'	এস. ৩২২.৪.১,
৫.	পিতৃসত্য রক্ষায় রামের বনগমন	রাজপুত্রের স্বেচ্ছায় অরণ্যবাসী হওয়া	'এক্সাইল'	জে. ৩৪৭.৩
৬.	লক্ষ্মণ-কর্তৃক রামের সহগমন করা	নির্বাসনে এক ভাই আরেক ভাইয়ের অনুগামী	ঐ	পি. ২৫১.৩
৭.	রামের চৌদ্দবছর বনবাস	সাত (বা তার গুণিতক) বছরের জন্য নির্বাসনে গমন	'এক্সাইল'	জেড. ৭১.৫.৫
৮.	রাম-কর্তৃক ভরতকে রাজ্যভার দানকরা	জ্যেষ্ঠভ্রাতা-কর্তৃক কনিষ্ঠকে রাজ্যভার	'ইয়ঙ্গার'	পি. ১৭.৮
৯.	শূর্পনখার নাক-কান কাটা যাওয়া	দান শাস্তি স্বরূপ নাসিকাকর্তন	'নোজ'	কিউ. ৪১৫.৫১ এফ-এফ

ক্রম	প্রাসঙ্গিক ঘটনা	প্রকরণ-উপজীব্য	অভিপ্রায়	সূচক সংখ্যা
১০.	মারীচের স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ	সোনার হরিণ	'ফন্'	বি. ৭৩১.৭.২
১১.	মারীচ-কর্তৃক রামের স্বর অনুকরণ করা	অনুকৃত কণ্ঠের দ্বারা প্রতারণা	'ডিস্‌গাইজ'	জি. ৪১৩
১২.	লক্ষ্মণ-কর্তৃক সীতার নিরাপত্তাসূচক গণ্ডী অংকন	বিপদ ঠেকাতে যাদু মণ্ডিত বৃত্ত-অঙ্কন	'সার্কল'	জি. ৩০৩.১৬. ১৯.১৫
১৩.	ভিখারীর ছদ্মবেশে রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ	ভিখারীর বেশে প্রতারিত করে নারীহরণ	'বেগার' ও 'অ্যাবডাক্টর'	কে. ১৩১৫.১০, আর. ২৪
১৪.	রাক্ষসরাজ ক[illegible] সীতাহরণ	দৈত্য / রাক্ষস-কর্তৃক নারীহরণ	'অ্যাবডাকশ্যন'	জি. ৩০৩. ৯.৫
১৫.	সীতাহরণ[illegible]ালে রাবণের ছদ্মবেশগ্রহণ	অপহরণকালে ছদ্মবেশধারণ	'ম্যাজিসিয়ান'	আর. ৩৯.১
১৬.	হরণকালে রাবণের দশমুণ্ডধারীরূপে প্রতিভাত হওয়া	দশমুণ্ডধারী দৈত্য / রাক্ষস	'টেনহেডেড'	এফ. ৫৩১. ১.২.২.৬, জি. ৩৬১.১.৫
১৭.	সীতাকর্তৃক পথ-নির্দেশিকা রূপে বস্ত্রালঙ্কার এবং বসন-চিহ্ন ফেলে দেওয়া	হরণকালে অপহৃতা পত্নী কর্তৃক পথে চিহ্ন ফেলে যাওয়া	'জুয়েল' এবং 'ওয়াইফ'	জে. ২০৯৩.৩, এইচ. ১১৯.২.
১৮.	জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ	আংশিক মানব দেহ ও মানবগুণসম্পন্ন পাখী	'বার্ড' ও হেড	বি. ৫০. বি. ৫৫ এফ-এফ

ক্রম	প্রাসঙ্গিক ঘটনা	প্রকরণ-উপজীব্য	অভিপ্রায়	সূচক সংখ্যা
১৯.	রাম-কর্তৃক সীতার সন্ধানের জন্য বানরদের সাহায্য গ্রহণ	অপহৃতা পত্নীকে সন্ধান করতে পশুর সহায়তা নেওয়া	'অ্যাবডাকশন'	বি. ৫৪৩. ৩.১
২০.	স্বর্ণলঙ্কা	রাক্ষসপুরী, স্বর্ণনির্মিত প্রাসাদ, দুর্গময় দ্বীপরাজ্য	'গোল্ড'	এফ. ১৬৩.৫ ১., এফ. ৭৩১.৩, এফ ৭৭১.১.১
২১.	অশোকবনে বন্দিনী সীতা	অলৌকিক পরিবেশে বন্দিনী / অপহৃতা	'অ্যাবডাকশন'	জি. ৩০৩. ৯, ৫, এফ ৩২০
২২.	ঐ	নারী অপহৃতা বধূ গোপনলোকে বন্দিনী	'ওয়াইফ'	এফ. ৩২২.৪
২৩.	বানর বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ওপর সমুদ্রের ওপর সেতু বন্ধন	বানর কর্তৃক সমুদ্রের সেতু নির্মাণ	'সী' এবং 'ব্রিজ'	এইচ. ১১৩১, ১., বি. ৮৪৬
২৪.	বানরের সাহায্য নিয়ে রামের সংগ্রাম	পশুকুলের সাহায্য নিয়ে দৈত্য / রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ	'হিরো'	বি. ৫২৪.১, ১১
২৫.	অভিজ্ঞান-হিসেবে হনুমান-কর্তৃক সীতাকে রামের আংটি দেখানো	অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়	'রিং'	এইচ. ৯৪ এফ-এফ
২৬.	হনুমানের লঙ্কাদাহন	বানর-কর্তৃক অগ্নি-সংযোগ	'ফায়ার'	এ ১৮৬১.২

ক্রম	প্রাসঙ্গিক ঘটনা	প্রকরণ-উপজীব্য	অভিপ্রায়	সূচক সংখ্যা
২৭.	রাবণ-কর্তৃক সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড দেখানো	ছিন্ন মায়ামুণ্ড দ্বারা প্রতারণা	'হেড'	ডি. ৯৯২, কে. ৫১২.২ ৩.১
২৮.	শক্তিশেলের আঘাতে মৃত্যুর পর বিশল্য-করণীর দ্বারা লক্ষ্মণেরও পুনর্জীবন লাভ বানরদের দ্বারা	জীবনদায়িনী বৃক্ষ / লতা বন্য পশুর শুশ্রূষায় প্রাণলাভ	'লাইফ' 'হীলিং' ও 'প্ল্যানট'	ই. ৯০, এফ-এফ, ডি. ১৫০০, বি. ১.৪.১ ৫১৫, এইচ ১৩৩৩. ২.১
২৯.	রাবণকে বধ করে রাম কর্তৃক সীতা-উদ্ধার	রাজপুত্র কর্তৃক হারানো স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া	'ওয়াইফ' ও 'প্রিন্স'	এফ. ৩২২.২, আর. ১৩১. ১০৫
৩০.	রাম-সীতা-কর্তৃক পুষ্পকরথে চড়ে দেশে ফেরা	উড়ন্ত রথ চড়ে দম্পতীর আকাশ পথে ভ্রমণ	'চ্যারিয়ট'	এ. ৭৬১.২
৩১.	নির্বাসনান্তে দেশে ফিরে রামকর্তৃক রাজত্ব ভার গ্রহণ	নির্বাসন শেষে দেশে সাফল্য / রাজ্য লাভ করা	'এক্সাইল'	এল. ১১১.১
৩২.	লোকাপবাদের ভয়ে রাম কর্তৃক সীতার অগ্নিপরীক্ষা	সতীত্বের প্রমাণ হিসেবে আগুনের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া	'ফায়ার' 'অর্ডীল' ও 'চেষ্টীট'	এইচ. ৪১২, ৪, এইচ. ২২১, এইচ ৪০০ এফ-এফ
৩৩.	সীতার অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া	পুণ্যচরিত ব্যক্তির নিরাপদে আগুনের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া	'ফায়ার'	ডি. ২২২.৮

ক্রম	প্রাসঙ্গিক ঘটনা	প্রকরণ-উপজীব্য	অভিপ্রায়	সূচক সংখ্যা
৩৪.	সীতাকে ব্যভিচারিনী সন্দেহ করে রাম-কর্তৃক তাঁকে ত্যাগ করা	রাজা-কর্তৃক রাণীকে দুশ্চরিত্রা সন্দেহে ত্যাগ	'অ্যাডালটরী'	পি. ১৬.১.২
৩৫.	গর্ভবতী সীতার বাল্মীকির কাছে আশ্রয় লাভ	শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে গর্ভবতী স্ত্রীকে রাখা	'প্রেগন্যানট'	এস. ৪১৭, এইচ. ১৫৫৮. ৯
৩৬.	লব-কুশের জন্ম এবং আশ্রমে বড় হয়ে ওঠা	জননী কর্তৃক যমজ সন্তানকে অরণ্যে লুকিয়ে রাখা	'ট্যুইন্স'	আর. ১৫৩. ৪.২
৩৭.	রাম-কর্তৃক স্বর্ণসীতা নির্মাণ	মূর্তির মাধ্যমে হারানো স্ত্রীর সান্নিধ্য-সন্ধান	'আইডল'	টি. ৫১.৩.১
৩৮.	লব-কুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন এবং যুদ্ধকালে রামের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হওয়া	আকস্মিকভাবে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হওয়া	'ফাদার'	এন. ৭৩১
৩৯	পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধে রামের পরাজয় ঘটা ও বন্দী হওয়া	অপরিচিত পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে পিতার বন্দীত্ব	'ফাদার'	এম. ৩১২ ০.৫
৪০.	লব-কুশের অযোধ্যা রাজসভায় আসা	অপরিচিত পুত্রের পিতার রাজসভায় উপস্থিতি	'রেকগনিশন' ও 'রেকগনা-ইজড'	এইচ. ২০. এফ-এফ পি. ২৩৩.৭
৪১.	সীতাকে আবার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে বলায় ধরিত্রী গর্ভে বিলীন হওয়া	ধরিত্রী গর্ভে আশ্রয় লাভ	'আর্থ' 'হাইড' ও 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড'	আর. ৩২৭ এফ. ৯৪৮.২ আর. ২১১.৩

ক্রম	প্রাসঙ্গিক ঘটনা	প্রকরণ-উপজীব্য	অভিপ্রায়	সূচক সংখ্যা
৪২.	সীতার অদর্শনে রামের হাহাকার	পত্নীহারা রাজার শোক	'কিং'	এফ. ১০৪১. ৯.১.২

এই বিয়াল্লিশটি-ক্রমে মোট তেষট্টিটি অভিপ্রায়-সূচক সমাবৃত হয়ে রামায়ণের মূল কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায়ও আছে রামায়ণে, যেমন :

ক্রম	প্রাসঙ্গিক ঘটনা	প্রকরণ-উপজীব্য	অভিপ্রায়	সূচক সংখ্যা
ক.	অহল্যা ও ইন্দ্রের কাহিনী	স্বামীর ছদ্মবেশে পরস্ত্রীগমন	'অ্যাবডাকশ্যন'	কে. ৭৫৫.১ কে. ১৩১০ এফ-এফ.
খ.	রামচন্দ্রের নরকদর্শন ও মৃত দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ	নিম্নতর-লোকে গমন	'জার্নি' ও 'ফাদার'	এফ, ৮০ এফ-এফ, এইচ. ১২৫২. ১.২
গ.	বেদপাঠ করার জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক শূদ্ররাজের মুণ্ডচ্ছেদ	'টাবু' (নিষেধ মূলক সংস্কার) অমান্য করার জন্য মুণ্ডচ্ছেদন	'টাবু'	সি. ৯২৯.৩
ঘ.	সীতার পাতাল-প্রবেশের পর স্মারক হিশেবে স্বর্ণ মূর্তিটি পড়ে থাকা	*এখানে ঘটনাটি 'রেসক্যু' উপ-প্রকরণ হলেও, সূচক সংখ্যা অনির্দিষ্ট। পাশের সূচক সংখ্যাটি 'অ্যবডাকশ্যন' প্রকরণ-কেন্দ্রিক। ফলে এখানে সুনির্দিষ্ট ভাবে 'মোটিফ' নির্দেশ করা যায় না।		কে. ৬৬১.৪

৪.২. অতএব রামায়ণের ছোটবড় প্রায় সমস্ত ঘটনাই যে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত লোকবৃত্ত-প্রকরণের বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে শ্রেণীবদ্ধ করা

যায়, সে কথা এখন আমরা মেনে নিতে পারি। উপরে যে উনসত্তরটি প্রকরণ সূচক নির্দেশ করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিই পৃথিবীর বহু দেশের বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে যুগ-পরম্পরায় প্রচলিত কাহিনী-মালার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং রামায়ণ কাহিনীর অন্তর্গত ঐতিহাসিকতা কতখানি, সে কথা বিচার করতে গেলে এর এই অন্তর্লীন বিশ্বজনীন লোকায়ন-ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করে উপায় থাকে না। রামায়ণ ইতিহাস, না মীথ, না লিজেণ্ড — সেই অনুসন্ধান করার পথ নিশ্চয়ই এতে খুলে যাবে॥

দেশবন্ধু কলেজ
কলিকাতা-২৬

বাংলার লোকউৎসব ঃ তৃপ্তিহীন জিজ্ঞাসা ও মহান সম্বল

তুষার চট্টোপাধ্যায়

॥ প্রাক্‌কথা ॥

সৌভাগ্যক্রমে, একদিকে যখন শিক্ষাগত শৃঙ্খলাহীন স্বেচ্ছাচারী কর্মধারায় লোকসংস্কৃতি সাম্প্রতিক কালের সর্বাধিক অপব্যবহৃত বিষয়, অন্যদিকে তখনই সাম্প্রতিক লোকসংস্কৃতি অন্বেষায় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা ও অদীক্ষিত প্রয়াস থেকে নিষ্ক্রমনের আর্তি সুস্পষ্ট এবং তথ্যের সাক্ষ্য থেকে তত্ত্বের দীপ্তদ্যুতিতে নবতর জিজ্ঞাসার প্রান্তস্পর্শী হবার অভিনিবেশ অকুণ্ঠিত। অনুরূপ পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সমগ্ররূপে বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব অনুষ্ঠান পর্যালোচনা আকাঙ্খিত হলেও আলোচনা চক্রের সময় ও রচনা বিশেষের সীমাবদ্ধতায় এই মুহূর্তে তা কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয়ের অনুষঙ্গেই রূপায়িত। বিষয়ানুষঙ্গে বর্তমান আলোচনা — টুসু, ভাদু, খেদাইবাবা, ভীম, প্রভৃতি কয়েকটি বাংলার তাৎপর্যপূর্ণ লৌকিক দেবদেবীর নামাঙ্কিত এবং অনিবার্য রূপে সংক্ষিপ্ত পরিক্রমায় স্থিত। অবশ্য সংক্ষিপ্ত অবয়বে স্থিত হলেও বর্তমান আলোচনা অনুশীলনের সুদীর্ঘ অন্তরালে নিঃসন্দেহে নিজস্ব চিন্তাধারার পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বকীয় উচ্চারণে সংগৃথিত ।।

॥ এক ॥

পশ্চিম বাংলার লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে নদীয়া জেলার "খেদাইবাবা"-র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নদীয়া জেলার চাকদহ থানার খেদাই ঠাকুরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। প্রধানত কৃষিযোগ্য জলজনিম্নভূমি বা আবাদ অঞ্চলে খেদাইবাবার পূজা ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত সম্বৎসর

প্রতি মংগলবার ও শনিবার নিয়মিত পূজা হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন খেদাই ঠাকুরের বাৎসরিক পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বাৎসরিক পূজার কালে ব্যাপক উৎসব ও বৃহৎ মেলা সংগঠিত হয়।

খেদাই বাবার কোনরূপ মূর্তি নেই। বৃক্ষ বিশেষের পাদমূলে খেদাই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত নিমগাছ (Margosa-Azadirachta Indica) তলাই খেদাইতলা বা খেদাই বাবার থান হিসাবে বিবেচিত হয়। ক্ষেত্র-বিশেষে বৃক্ষমূলে সর্পফণা শোভিত মাটির মূর্তি স্থাপিত হয়। ঐ সমস্ত মূর্তি সাধারণত পঞ্চ বা অষ্টফণা যুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক পূজা অনুষ্ঠিত হ'লেও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্ব শ্রেণীর মানুষ খেদাই পূজায় ভক্ত হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। বাৎসরিক পূজা সূর্যোদয়ের কালে সুরু হয় এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমস্ত দিন ব্যাপক উদ্দীপনার মাধ্যমে পূজানুষ্ঠান চলে। "বন্দে ক্ষেত্রপাল খেদাই নমঃ"—মন্ত্র উচ্চারণ করে, ক্ষেত্রপাল ও মনসার ধ্যানমন্ত্রে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচুর পরিমাণ দুধ এবং বহু সংখ্যক প্রাণি বলির শোণিত ধারাই খেদাই পূজার মূল উপাচার। পায়রা, হাঁস, মোরগ, পাঁঠা, শুকর, মহিষ, প্রভৃতি প্রাণির রক্তে খেদাই তলার মাটি সিক্ত হয়ে যায়। উৎসর্গীকৃত পশুর ঘাড়ের দিকের কিছু মাংস এবং কর্তিত মুণ্ড বৃক্ষমূলে রাখা হয়। খেদাই বাবার নিকট জমির প্রথম ফসল ও গাছের প্রথম ফল উৎসর্গের প্রথা খুব প্রবল।

ক্ষেত্রবিশেষে খেদাই পূজায় বারাঙ্গনাদের আধিপত্য সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই সূত্রে চাকদহ থানার অন্তর্গত মথুরাগাছির বাৎসরিক খেদাই পূজার দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই খেদাই তলাটি সম্ভবত খেদাই ঠাকুরের পূজা, মেলা ও উৎসবের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র এবং এখানকার খেদাই ঠাকুর সর্বপ্রাচীন খেদাইবাবা "বুড়োখেদাই" নামে অভিহিত হয়। এই স্থানে ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রথানুসারে বাৎসরিক পূজা বারাঙ্গনাদের পূজার্ঘদ্বারা শুরু হয় এবং তৎপরে মুসলমানদের পূজা নিবেদিত হয়। তারপর কৃষ্ণনগরের মহারাজা, সেবাইত ও অন্যান্যদের পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

খেদাই ঠাকুরের বাৎসরিক উৎসবে বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার-হাজার মানুষ পূজা ক্ষেত্রে সমবেত হয়। এই উৎসবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য

বিভিন্নস্থান থেকে আগত সাপুড়েদের সমাবেশ। সাপুড়েরা মেলাঙ্গনে ও পথের দুই পাশে জীবন্ত সাপ নিয়ে খেলা দেখায় এবং উচ্চস্বরে মন্ত্র আওড়ায় ও গান করে। সমবেত ভক্ত ও দর্শকেরা "খেদাইবাবা" নাম উচ্চারণ করে ভক্তিভরে সাপের উদ্দেশ্যে সাপুড়েদের পয়সা দান করে। এই দিন সাপের গায় কোন প্রকার আঘাত করা বা সাপ মারা নিষেধ।

খেদাই বাবার দৈবক্ষমতা সম্পর্কে লোকসমাজে নানাবিধ বিশ্বাস প্রচলিত আছে, যথা—১. খেদাই বাবার দয়ায় যে কোন প্রকার মন্দভাগ্য দুরীভূত হয় এবং অশুভশক্তি বিতাড়িত হয়; ২. খেদাইবাবার দয়ায় সাপের ক্রোধ ও দংশন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়; ৩. খেদাইবাবার দয়ায় ভালো ফসল ও ধনসম্পদ হয় এবং নারীদের বন্ধ্যাত্ব দুর হয়। এই সমুদয় মাহাত্ম্যের মধ্যে জমি ও কৃষির মঙ্গল বিধান খেদাইবাবার প্রধান ক্ষমতা বলে বিবেচিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সাধারণ মানুষ খেদাই তলার মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে যায় এবং নিজ নিজ কৃষিক্ষেতে এই বিশ্বাসে ঐ মাটি ছড়িয়ে দেয় যে খেদাই তলার মাটির মাহাত্ম্যে চাষ নির্বিঘ্ন হবে, পোকা মাকড় বা প্রাণীর দ্বারা ফসলের ক্ষতি হবেনা এবং জমিতে উত্তম ফসল হবে। তাছাড়া খেদাই তলার মাটি গোয়াল ঘরেও ছড়ানো হয় এবং মনে করা হয় এর দ্বারা রোগের আক্রমণ থেকে গরুরা মুক্ত থাকে এবং হারানো গরু পাওয়া যায়।

কখন কিভাবে খেদাই পূজার উদ্ভব ঘটেছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। এই পূজানুষ্ঠান সম্পর্কে লোকমুখে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় কিংবদন্তির প্রচলন আছে। বিভিন্ন কিংবদন্তি বা প্রচলিত কাহিনী অনুসারে বলা হয় জনৈক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সাধক বা জনৈক বাগ্দি সম্প্রদায়ের লোক বা কৃষ্ণনগরের মহারাজা খেদাই ঠাকুরের পূজার প্রচলন করেন। মনসা-দেবীর স্বপ্নাদেশে খেদাই ঠাকুরের পূজার প্রচলন হয়েছে এমন বিবরণও শোনা যায়। মোটের উপর পরস্পর বিরোধী কিংবদন্তি বা লোককাহিনীর অনুসরণে বোঝা যায় খেদাই ধর্মানুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস হারানো অতীতের অন্ধকারে নিমজ্জিত। অবশ্য লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খেদাই পূজার উদ্ভবের ইতিহাস বা তাৎপর্য উদ্ঘাটন করা অসম্ভব নয়।

যদিও ক্ষেত্রবিশেষে খেদাই ঠাকুর মামনসা রূপে কথিত হন, তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্র খেদাই ঠাকুর বাবাখেদাই বা ক্ষেত্রপাল হিসাবে পূজিত হন। নদীয়ার আবাদ অঞ্চলে খেদাই ঠাকুরের পূজার প্রচলন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং কৃষি ভিত্তিক সমাজের পটভূমিতে জনগণের আশা আকাঙ্খার ও জীবন প্রচেষ্টার সূত্রেই খেদাই ঠাকুরের পূজার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে।

যদিও কৃষ্ণনগরের মহারাজা ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের প্রাধান্যের ফলে খেদাইবাবাকে শাস্ত্রীয় মনসা পূজা রূপে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে, তথাপি খেদাই ঠাকুরের লোকায়ত চরিত্র সহজেই অনুধাবন করা যায়। খেদাই পূজানুষ্ঠান মূলত—বৃক্ষ, সর্প ও ধরিত্রী পূজার সাথে সম্পর্কিত। আদিম বিশ্বাসে বৃক্ষ ও সর্প উর্বরতার প্রতীক এবং ধরিত্রীর বুকে রক্তপ্রদানের মধ্যে জমির বা ধরিত্রীমাতার উর্বরতা বৃদ্ধির জাদু বিশ্বাস নিহিত। সর্বোপরি যেহেতু জলজ নিম্নভূমির আবাদ অঞ্চলে চাষের পক্ষে প্রধান ছিল সাপের উপদ্রব, তাই কৃষি সমাজের পক্ষে ভয় ও ভক্তির উৎসে সর্প পূজার প্রচলন ছিল একান্ত স্বাভাবিক।

সাধারণভাবে কথিত হয় যে খেদাইবাবা জমি থেকে অশুভ শক্তির প্রভাব দুরীভূত করেন এবং জনগণের সৌভাগ্য প্রণয়ন করেন। এদিক থেকে সংশ্লিষ্ট দেবতার নামের তাৎপর্য দ্বিবিধ রূপে অনুধাবন করা যায়—১. বাংলাভাষায় "খেদানো" শব্দের অর্থ বিতাড়ণ করা এবং খেদাই শব্দটি খেদানো শব্দজাত। এই দিক থেকে যে দেবতা অশুভকে খেদান অর্থাৎ দুরীভূত করেন বা বিতাড়ন করেন তিনিই "খেদাইবাবা"। ২. খেদাই ঠাকুর মূলতঃ "খেতাই ঠাকুর" বা ক্ষেতের ঠাকুর। ক্ষেত বা কৃষিক্ষেতের দেবতা হিসাবেই তিনি খেতাইবাবা। মোটের উপর খেদাই নামটি দেবতার মূল প্রকৃতিটিকে উদ্ঘাটন করে, যিনি অশুভকে বিতাড়ন করেন, কৃষিক্ষেত্রকে রক্ষা করেন এবং কৃষি সমাজের সুখৈশ্বর্য বৃদ্ধি করেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় লোকসমাজে কৃষিক্ষেত্র বা কৃষিকর্মের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সংগঠনের ক্ষমতাই খেদাই ঠাকুরের প্রধান মাহাত্ম্য হিসাবে বিবেচিত

হয়। এই সঙ্গে আরো মনে করা হয় যে খেদাই ঠাকুর কৃষিকর্মের প্রধান সহায়ক গরুর মঙ্গল বিধান করেন। উল্লেখযোগ্য যে খেদাই ঠাকুর ক্ষেত্রপাল হিসাবে অভিহিত হন, এবং খেদাই পূজায় ক্ষেত্রপালের ধ্যান মন্ত্র উচ্চারিত হয়। এই সমুদয় ঘটনা নিঃসন্দেহে খেদাইবাবা ও কৃষির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক চিহ্নিত করে।

খেদাই বাবার মাহাত্ম্য, নাম, পূজানুষ্ঠানে বারাঙ্গনাদের প্রাধান্য ও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অংশ গ্রহণ, স্থান, কাল, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ, উৎসর্গ ইত্যাদির সামগ্রিক বিশ্লেষণ এই সত্য উদঘাটন করে যে খেদাই ঠাকুর শাস্ত্রীয় দেবদেবীর দূরে মূলত লৌকিক কৃষি দেবতা। খেদাই ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে আদিম উর্বরতা জাদু বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট বৃক্ষ, সর্প এবং ধরিত্রীমাতার পূজা মিশ্রিত হয়ে গেছে। মোটের উপর খেদাইবাবা কৃষি সমাজের এক বিশিষ্ট লৌকিক দেবতা ॥

॥ দুই ॥

১ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অন্যতম প্রধান লোকউৎসব — ভাদু বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী জেলাসমূহ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ভাদু পূজার প্রাধান্য দেখা যায়। প্রধানত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায় ব্যাপক রূপে ভাদু উৎসবে প্রতিপালিত হয়। ভাদু পূজার কাল সাধারণত ১লা ভাদ্র থেকে ভাদ্র সংক্রান্তি পর্যন্ত বিস্তৃত। অনেক ক্ষেত্রে শ্রাবণ সংক্রান্তি থেকে ভাদ্র সংক্রান্তি পর্যন্ত এই উৎসব উদযাপিত হয়। ক্রমানুসারে ভাদু-অনুষ্ঠানের চারিটি স্তর -- শ্রাবণ সংক্রান্তি বা ১লা ভাদ্র ভাদু স্থাপন, সমস্ত ভাদ্র মাস ভাদু পালন, ভাদ্র সংক্রান্তি বা তার পূর্বরাত্রে জাগরণ এবং ভাদ্র সংক্রান্তি বা তার পরের দিন ভাদু বিসর্জন। ১লা ভাদ্র বা ক্ষেত্রবিশেষে ভাদ্র সংক্রান্তি বা তার তিনদিন পূর্বে ভাদু স্থাপন করা হয়। সাধারণত নূতন সরায় গোবরের উপর ভাদুই ধান ছড়িয়ে ভাদুর রূপদান করা হয়। অবশ্য বর্তমানে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে মৃৎনির্মিত ভাদুর মূর্তি

প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভাদুর মূর্তি — হেমবর্ণা, সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতি, অনেকটা বীনাহীনা সরস্বতীর অনুরূপ। ভাদুমূর্তি দণ্ডায়মানা বা পদ্মের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় থাকে। ভাদুর কোন বাহন নেই। অনেক সময় ভাদুর একহাতে মোণ্ডা বা সন্দেশ এবং অন্যহাতে ধানের শীষ বা পান বা পদ্মফুল থাকে। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে শূণ্যহাত প্রতিমাও দেখা যায়। ভাদু মূর্তি স্থাপন করে উৎসবের সূত্রপাত করা হয় এবং প্রতিমার স্থলে প্রত্যহ সন্ধ্যারতি ও মুড়ি-চিড়া-মিঠাই ভোগ দেওয়া হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সমবেত মেয়েরা ভাদুকে ঘিরে নাচ-গান করে। অনেক ক্ষেত্রে পল্লীর মধ্যে কোন কেন্দ্রীয় স্থানে—আখড়া বা সমাজপতির গৃহাঙ্গনে সমবেত হয়ে ভাদুর গান করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে গান করতে করতে পল্লী পরিভ্রমণ বা প্রদক্ষিণ করা হয়।

ভাদু পূজায় সাধারণত কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না এবং কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক পূজার্চনার মাধ্যমে উৎসব প্রতিপালিত হয় না। নৃত্যগীতের মাধ্যমেই ভাদু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পুরোহিতহীন ও শাস্ত্র মন্ত্রহীন এই লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানে বা লোকউৎসবে সমবেত নরনারীদের নৃত্যগীতই প্রধান অঙ্গ। গোটাভাদ্রমাস নৃত্যগীতে উৎসব পালন করে ভাদ্রমাসের শেষদিন সারারাত নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানে 'জাগরণ' প্রতিপালিত হয়। জাগরণের অনুষ্ঠানকালে সমবেত নর-নারীরা অবাধ মেলামেশা করেন, কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন শিথিলতাও পরিদর্শিত হয়। জাগরণ রাত্রে অনেক অঞ্চলে দুই পরিবার বা প্রতিবেশী ভাদুর মধ্যে মালাবদল করে বিবাহ দেবার রীতির প্রচলন দেখা যায়। জাগরণের পরের দিন ভাদু বিদায়ের গান করতে করতে ভাদুকে স্থানীয় জলাশয়ের নিকটে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ভাদুকে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। অনেক অঞ্চলে বাউরী সম্প্রদায় বিসর্জনের দিন ভাদু মূর্তি নিয়ে শবযাত্রার অনুরূপ অনুষ্ঠান করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য স্থান বিশেষে উচ্চবর্ণের বর্ধিষ্ণু পরিবারে ভাদুপূজা ও উৎসবের প্রচলন দেখা গেলেও ভাদু অনুষ্ঠানের প্রধান অংশগ্রহণকারী — বাগদী-বাউরী, প্রভৃতি নিম্নশ্রেণী ও আদিবাসী সমাজের মেয়েরা। ভাদুপূজায় অংশগ্রহণকারী রমণীকুলের মধ্যে কুমারী মেয়েদের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে বারাঙ্গনালয়ে বিশেষভাবে ভাদু পূজা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

অনেক ক্ষেত্রে ভাদু উৎসবের প্রাঙ্গণে অবাধ মিলনের মাধ্যমে যুবক-যুবতীগণ মনের 'বন্ধু' নির্বাচন করে নেয়।

ভাদু পূজার প্রচলন সম্পর্কে লোকসমাজে নানারকম কিংবদন্তী মূলক লোককথার প্রচলন দেখা যায়। ভাদু কাহিনী সর্বত্র একপ্রকার নয়, তবে সাধারণভাবে দেখা যায় – পঞ্চকোটের রাজা নীলমনি সিংহদেবের অধিকবয়সে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ভাদ্রমাসের পয়লা তারিখে কন্যার জন্ম হয় বলে তার নাম রাখা হয় ভাদ্রেশ্বরী বা ভদ্রেশ্বরী, ডাকনাম ভাদু। স্বীয় চরিত্র মাধুর্যে রূপে-গুণে সুলক্ষণা ভাদু ছিলেন সর্বজন প্রিয়। সর্বজনপ্রিয় ভাদুর আকস্মিক মৃত্যু হয়। বিভিন্ন কাহিনীতে মৃত্যুর বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে যেমন প্রজাদের মঙ্গল বিধানে অসমর্থ হয়ে প্রাণত্যাগ, অসামাজিক প্রেম ও প্রেমিকের জন্য দেহত্যাগ, নির্দ্ধারিত পতির মৃত্যুতে সতী হিসাবে অগ্নিতে আত্মাহুতি দান, পিতার অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মবিসর্জন, বা মন্দিরের বিগ্রহের সঙ্গে লীন হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি। মৃত্যুর কারণ যাই হোক ভাদুর মৃত্যু হয় ভাদ্র সংক্রান্তিতে। ভাদুর অকাল মৃত্যুতে রাজা-প্রজা সকলেই অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে রাজা নাচ গান-উৎসবে ভাদুর স্মৃতি উদযাপনের আদেশ দেন এবং এইভাবে ভাদু পূজার প্রচলন হয়েছে বলে কথিত হয়।

নৃত্যগীতে উদযাপিত ভাদু অনুষ্ঠানের মৌলিক তাৎপর্য সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ আছে। সাধারণভাবে প্রচলিত মতে—ভাদু মূলত স্মৃতি পূজা এবং এই মতের কারণ ভাদু সম্পর্কিত প্রচলিত লোককাহিনী গুলিতে পঞ্চকোট কাশীপুরের রাজা নীলমনি সিংদেবের ভাদু নামক কন্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে ভাদু সংক্রান্ত কাহিনীগুলি সর্বত্র একরূপ নয়। বলাবাহুল্য কাহিনীর এই স্ববিরোধিতা কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তির যৌক্তিকতাকে শিথিল করে। তাছাড়া পঞ্চকোটরাজ নীলমনি সিংহদেবের সূত্রে বিচার করলে ভাদু পূজার উৎপত্তিকাল হয় উনবিংশশতকের মধ্যপর্ব। এত অল্পসময়ে এই জাতীয় ঘটনার আপাত বিরোধিতা কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করে। তাছাড়া একান্ত রাজাদেশে বা ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের প্রচেষ্টায় ভাদুর

ন্যায় ব্যাপক চরিত্রের লোক উৎসবের উদ্ভবও সম্ভবপর নয়। ভাদু উৎসবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অন্যান্য লোক উৎসবের ন্যায় এই উৎসবটিরও বিকাশ লোকসমাজের আশাআকাঙ্ক্ষার মৌলিক উৎসে। লোকসমাজে ব্রতকথার মাধ্যমে যেমন প্রতি দেবীর মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়, তেমন ভাবেই ভাদুর কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে এবং ইতিহাস-পুরাণের প্রসঙ্গে জনসমাজে সে কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে।

ভাদ্র মাসে উৎপন্ন ভাদুই শস্য তোলার সময় ভাদ্রমাসই ভাদু উৎসবের কাল। ভাদ্রমাসে গৃহাঙ্গনে কাটা আউশ ধানের সমারোহ এবং মাঠে প্রান্তরে কচি আমন ধানের সজীবতা। ভাদ্রমাসের শস্য হিসাবে মকাই ফসলও এ ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় নয়। অঞ্চল বিশেষে ভাদ্রমাসেই নবীন আউশে নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মোটের উপর একদিকে রোয়া পোতার কাজ শেষ (?) অন্যদিকে আউশ বা আশু ধান ঘরে তোলা, একদিকে আগামী আমনের কামনা ও অন্যদিকে ভাদুই আউশের নবান্ন এই পটভূমিতেই ভাদু উৎসবের অনুষ্ঠান। তাই ভাদুকে ফসল সংক্রান্ত শস্য উৎসব রূপে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত। এদিক থেকে কুমারী রূপে ভাদুর কল্পনা, ভাদু অনুষ্ঠানে কুমারী মেয়েদের প্রাধান্য, বেশ্যালয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান এবং জাগরণ রাত্রে যুবক-যুবতীর অবাধ মিলন ও উদ্দাম নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে ভাদু উৎসবের মধ্যে এবাস্ত রূপে আদিম কৃষি সংক্রান্ত উর্বরতা জাদু বিশ্বাসের অবশেষ লক্ষ্য করা যায়, এবং সামগ্রিকভাবে উৎসবের কাল, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রকৃতি অনুসরণে মনে হয় ভাদু অনুষ্ঠান মূলত উর্বরতা সহায়ক কৃষি সম্পর্কিত লৌকিক উৎসব॥

॥ তিন ॥

বাংলার লোকউৎসবের মধ্যে টুসু বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। মানভূম থেকে আরম্ভ করে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলেই টুসু উৎসবের সমারোহ। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বিহার প্রদেশের

ধানভূম, সিংভূম অঞ্চল টুসু পরবের প্রধান কেন্দ্র। কেন্দ্রের বাইরে এই উৎসব অন্যত্র কম বেশী প্রচলিত থাকলেও লোকপ্রিয়তা, ব্যাপকতা ও কিংবদন্তীর সূত্রে পুরুলিয়াকেই টুসু উৎসবের মূল কেন্দ্র রূপে অভিহিত করা যায়। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত একমাস ব্যাপী টুসু উৎসব প্রতিপালিত হয়। প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে হলেও প্রায় সর্বস্তরের ও শ্রেণীর লোকের মধ্যেই টুসু পূজার প্রচলন দেখা যায়। টুসু পূজার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কুমারী মেয়েরাই প্রধান।

টুসু সম্পর্কে লোক সমাজে নানারূপ লোককথার প্রচলন দেখা যায়। এই সমস্ত কাহিনীর একটিতে টুসু এক ব্রাহ্মণ কন্যা যার জন্ম হয়েছিল মোঘল শাসনের কালে। রূপ যৌবনে অনন্য টুসু ঘটনা চক্রে এক মুসলমান রাজার দৃষ্টিতে পড়ে এবং তিনি টুসুকে ছিনিয়ে আনতে সক্রিয় হন। এই পরিস্থিতিতে টুসু আত্মগোপন করে পালিয়ে যান, কিন্তু রাজা ও তার চরবৃন্দ টুসুর পশ্চাদধাবন করে। তখন অনন্যোপায় টুসু সতীত্বরক্ষার জন্য জলে ঝাপিয়ে পড়েন। যে ঘাটে টুসু আত্মবিসর্জন দেন তার নাম— সতীঘাট। টুসু সম্পর্কিত অপর কাহিনীতে টুসু কুর্মী সমাজের কন্যা। টুসুর সঙ্গে প্রতিবেশী এক কুর্মী যুবকের ছিল ভালবাসা। ঐ যুবকের সঙ্গে বিবাহের দিন টুসু ও তার স্বামী মুসলমান দস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়। কিন্তু শুকরের মাংস টুসুরা গ্রহণ করে শুনে দস্যুগণ টুসুদের পরিত্যাগ করে। অবশ্য মুসলমান কর্তৃক অপহৃতা হওয়ায় টুসুর সঙ্গে স্থানীয় আত্মীয় স্বজনগণ কুর্মী যুবকের আর বিবাহ দিতে রাজী হন না। এই অবস্থায় যুবক সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে যায় এবং প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের জন্য টুসু গৃহত্যাগ করে। অনেক কষ্টের পর টুসু স্বামীকে সুবর্ণরেখা নদীর ঘাটে খুঁজে পান। কিন্তু অনাহার-অনিদ্রায় অসুস্থ টুসুর মৃত্যু হয়। অপর একটি কাহিনীতে দেখা যায় টুসু কাশীপুরের রাজার মেয়ে। সর্বজনপ্রিয় অপূর্ব সুন্দরী টুসু অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পৌষ সংক্রান্তিতে তার অকাল মৃত্যু হয়।

সাধারণত মাটির সরা প্রতীকে টুসু ব্যাপক রূপে পূজিতা হয়। সরার গর্ভে থাকে নূতন ধান, নবান্নের ধানের তুষ মিশ্রিত নাড়ু, গোবরের

তাদের উপর ছড়ানো হয়, ধান, সরষে ও মুলা ফুল, কুঁচ এবং সরষে। অনেক ক্ষেত্রে সরার পরিবর্তে টুসু ঘটের প্রচলন দেখা যায়। টুসু ঘটের মধ্যেও সরার অনুরূপ দ্রব্য সমূহ সংরক্ষিত হয়। টুসু সরা ও ঘটের গায় সিন্দুর ও পিটুনি গোলার লাল—সাদা টিপ অঙ্কিত থাকে। হলুদ ছোপানো কাপড়ের টুকরা টুসু ঘট ও সরার উপর স্থাপন করা হয়। টুসুর অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ 'চোড়ল'। বাঁশের বাখারি বা চেলা কাঠের কাঠামোতে রঙ-বেরঙের কাগজ লাগিয়ে চার পায়া বিশিষ্ট রথাকৃতি চোড়ল প্রস্তুত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে টুসুর সরা পাতা হয় চোড়লের মধ্যে বা সেই সরা ও মূর্তির পাশে সুসজ্জিত চোড়ল রক্ষিত হয়। অনেক স্থলে টুসুর মৃৎমূর্তির প্রচলন দেখা যায়। সাধারণ ঐতিহ্যানুসারে টুসু অনধিক এক হাত বিশিষ্ট মূর্তি —গায়ের রং হলুদ ও পরিধেয় বস্ত্র নীল। মূর্তির হাতে থাকে রঙিন কাগজের তৈরী পদ্ম এবং মাথার পশ্চাতে থাকে অনুরূপ প্রভামণ্ডপ। সাধারণত ছোট কাঠের চৌকি বা কাঁসার থালার উপর মূর্তি স্থাপিত হয়।

টুসু উৎসব ও পূজানুষ্ঠানের কয়েকটি সুস্পষ্ট স্তর দেখা যায় — স্থাপন, পালন, জাগরণ ও বিসর্জন। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে টুসু স্থাপন করা হয় -- আল্পনামণ্ডিত গৃহাঙ্গনে, ঘরের বাস্তু খুটির পাদদেশে বা কুলুঙ্গিতে। সমগ্র পৌষ মাসের সন্ধ্যাকালে টুসুর থানে প্রদীপ জ্বালা হয়, তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে পুষ্পার্ঘ ও চিড়ে-মুড়ি-গুড়-মণ্ডা প্রভৃতি উৎসর্গ করা হয়। অধিক রাত পর্যন্ত নাচ-গান অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে টুসুকে ঘুম পাড়ানো হয় আগামী দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত। এক মাস ব্যাপী নিয়মিত নৃত্য — (বর্তমানে খুব কম)-গীত অনুষ্ঠানের পর পৌষ সংক্রান্তির আগের রাত্রিটিকে বিশেষভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। ঐ দিন সারারাত ধরে টুসুর থানে প্রদীপ জ্বেলে বা তাঁকে গৃহাঙ্গনে স্থাপন করে নাচ-গান অনুষ্ঠিত হয়। জাগরণের রাত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবেশী টুসুর মধ্যে বিবাহ দেওয়া হয় (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অনেক ক্ষেত্রে বিসর্জনের ঘাটেও মালা বদল করে বিভিন্ন টুসুর মধ্যে বিবাহ দেওয়া হয়)। খোটের উপর টুসুকে ঘিরে ঐ দিন সারা রাত জেগে চলে উদ্দাম উৎসব। জাগরণের পরের দিন — পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির বিসর্জনের মেলায় অবাধ মেলামেশায় যুবক-যুবতীগণ মনের বন্ধু নির্বাচিত

ধরে নেয়। ভোরে নিকটবর্তী জলাশয়ে টুসু বিসর্জিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তার ঘট বা সরা বিসর্জিত হয় না, কেবল মাত্র চোড়ল বিসর্জিত হয়। পুজোপচার সমেত ঘট বা সরা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে সম্বৎসরের জন্য তোলা থাকে এর নাম নিজের ঘরে লক্ষীকে বেঁধে রাখা বা লক্ষীবাধা"। বিসর্জনান্তে সবশেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর নবান্নের পিঠে পায়েস ভক্ষণের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

টুসু উৎসবে কোন শাস্ত্রীয় অনুশাসন বা পুরোহিতের স্থান নেই। পূর্বাপর লোকাচারের ভিত্তিতে, সমবেত নৃত্য-গীতে এই পরব প্রতিপালিত হয়। বর্তমানে এই উৎসবে নৃত্য প্রায় গৌণ হয়ে পড়েছে, সংগীতই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে।

টুসু উৎসবের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিদগ্ধ সমাজে ভিন্নমত দেখা যায়। কারো মতে পশ্চিম সীমান্ত বাংলার টুসু ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের তুষ-তুষলিব্রত অভিন্ন, অনেকের মতে একপ্রকার গঙ্গাপূজা, অনেকের মতে পুষ্যা বা তিষ্য নক্ষত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পূজাই টুসু উৎসব এবং অনেকের মতে ভাদু উৎসবের প্রভাব জাত অনুষ্ঠান। পূর্বাপর টুসু উৎসবের প্রকৃতি বিশ্লেষণে ও তুলনামূলক আলোচনায় বোঝা যায় এই উৎসব তোষলাব্রতর নামান্তরিত বা স্থানান্তরিত রূপ নয়। ভূ-প্রকৃতি ও জন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী টুসু সীমান্ত বাংলার একান্ত দেশজ-আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ উৎসব। বলাবাহুল্য এর সঙ্গে গঙ্গাপূজার কোনরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মিল নেই। সর্বোপরি 'পুষ্যা' বা 'তিষ্য' নক্ষত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎসব হিসাবে টুসুকে ব্যাখ্যা করারও কোন যৌক্তিকতা নেই, কারণ লোক উৎসব শাস্ত্রীয় তিথি নক্ষত্র মিলিয়ে উদ্ভূত হয় না — জন-জীবনের আশাআকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন প্রতীতির লৌকিক পটভূমিতেই লোক উৎসবের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। ভাদু ও টুসু উৎসবের অঞ্চল, মূর্তি প্রকরণ, কাহিনীগত কম-বেশী সাদৃশ্য, সংগীত-নৃত্য ভিত্তিক অনুষ্ঠানের বহুবিধ সাদৃশ্য অনুসরণে অনেকে মনে করেন টুসু ও ভাদু পরস্পর সম্পর্কিত বা প্রভাব জাত। কিন্তু প্রকৃত বিচারে বোঝা যায় বহু বিষয়ে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও উৎসব দুটি পারস্পরিক প্রভাব জাত নয়। "ভাদু",

পশ্চিমসীমান্ত বঙ্গের ভাদুই ফসলের নবান্ন উৎসব, আর "টুসু" পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পৌষালি ফসলের নবান্ন উৎসব। কৃষি-সমাজের লোক উৎসব হিসাবেই আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে অন্তর্লীন ঐক্য বর্তমান।

কৃষি প্রধান বাংলার পল্লী অঞ্চলে পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস রূপে বিবেচিত হয় কেননা চাষীর ঘরে তখন নূতন ধান ওঠে। পৌষ মাসের নূতন ধানের চালে উদ্‌যাপিত হয় নবান্ন বা পিঠে পার্বন। টুসু পূজার প্রধান উপকরণ জল ভরা ঘটকে সেচ, গোবরকে সার ও তুষকে শস্যের প্রতীক হিসাবে কল্পনা করা যায়। এই পূজায় গোবর-তুষের আনুষ্ঠানিক ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে সার-মাটি দিয়ে ক্ষেত উর্বরা করে তোলার রূপক এবং শূন্য গর্ভ তুষের থেকে পূর্ণ শস্য লাভের উর্বরতা জাদুবিশ্বাস জাত আদিম fertility cult এর অবশেষ বলা যায় প্রকৃতপক্ষে ধানের খোসা তুষের অনুসঙ্গেই তুষু বা টুসু দেবীর উদ্ভব এবং কৃষি সমাজের শস্য সম্পর্কিত যৌন তাৎপর্যেই এই উৎসবের বিকাশ॥

॥ চার ॥

ভীমপূজা মেদিনীপুর জেলার এক বিশিষ্ট লোকউৎসব। মেদিনীপুরের পার্শ্ববর্তী জেলায় ও অন্যান্য অঞ্চলের কোন কোন স্থানে ভীমপূজার প্রচলন দেখা গেলেও, এই উৎসবটি প্রধানত মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপকরূপে অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর জেলার প্রায় সর্বত্র অদ্যাপি ভীমপূজার ব্যাপক ও সর্বজনীন প্রচলন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। (বলা বাহুল্য, ভীমপূজা কেবলমাত্র ঘাটাল মহকুমার সীমায় ও বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ধারণাটি অজ্ঞতা প্রসূত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে ভীমপূজা হয়। উন্মুক্ত প্রান্তরে, ক্ষেতের ধারে গ্রামের মধ্যে বা সীমান্তে, হাট বা বাজারের মধ্যে, অথবা রাস্তার মোড়ে বিরাট আকৃতির মূর্তি তৈরি করে ভীমপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গদাহস্তে দণ্ডায়মান ভীমের বলিষ্ঠ মূর্তির অধিক প্রচলন

থাকলেও, ভীমের বীরত্বব্যঞ্জক বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে বিভিন্ন প্রকার মূর্তি গঠিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বয়ঃবৃদ্ধের মুখে কাঁধে গদা ও হাতে লাঙল নিয়ে ভীমের মূর্তির বর্ণনা শোনা গেলেও ব্যাপকরূপে মহাভারতোক্ত ভীমের বীর মূর্তিই প্রত্যক্ষ করা যায়। ভীমের বিভিন্ন প্রকার মূর্তির বর্ণনা শোনা গেলেও ব্যাপকরূপে মহাভারতোক্ত ভীমের বীর মূর্তিই প্রত্যক্ষ করা যায়। ভীমের বিভিন্ন প্রকার মূর্তির মধ্যে — গদাহস্তে একক ভীম, ভীমের জরাসন্ধ বধ কিচক বধ, দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ, জতুগৃহ থেকে পলায়ন, হনুমানের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা, দুঃশাসনের রক্তপান, ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ, অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ প্রভৃতি মূর্তি প্রধান। সাধারণত স্বর্ণাভ হলুদ, রক্তাক্ত খয়েরী বা ধুসর বর্ণের ভীমমূর্তি হয়। মূর্তির মাথায় দীর্ঘ কুঞ্চিত বাবরি চুল এবং মুখে দীর্ঘ জুলফি ও গোঁফ থাকে। আয়ুধ হিসাবে হাতে থাকে গদা, কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁধে ধনুক দেখা যায়। সাধারণত গ্রামাগত বা পাড়াগত হিসাবে ও সার্বজনীন রূপে ভীমপূজা হয়। স্থানভেদে ভীমপূজা অনুষ্ঠিত হয় — দিনে, সন্ধ্যায় বা রাত্রে। সাধারণত একাদশীর তিথি ধরে পূজারম্ভ হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে রাত্রে চার প্রহরে চারবার পূজা হয়। ভীমপূজায় আতপচাল, ফলমূল ও বিভিন্ন প্রকার মিষ্টির নৈবেদ্য দেওয়া হয়। পূজায় লেবু, নারিকেল, শশা লাল আলু-প্রভৃতি কাঁচা ফল; নুনবিহীন লাল আলু ও মুগডাল সিদ্ধ; লুচি, বাতাসা, তিলে পাটালি, সন্দেশ প্রভৃতির শীতল ও মকর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। ভীমপূজায় কোন কোন ক্ষেত্রে অব্রাহ্মণ পূজারী দেখা গেলেও বর্তমানে সাধারণত ব্রাহ্মণ পুরোহিত ভীমপূজা করেন এবং স্থানীয় অন্তত একজন উপবাসী থাকেন। পূজায় স্থানীয় সর্বশ্রেণীর অধিবাসী অংশ গ্রহণ করেন। পূজায় ঢাক কাঁশি, শঙ্খ প্রভৃতির বাজান হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভীমপূজার দিন — হালচাষ, ঢেঁকির কাজ, হাতুড়ি-হাপরের কাজ, চুলদাড়ি কাটা, কাপড় কাচা প্রভৃতির আনুষ্ঠানিক বন্ধ (ট্যাবু) প্রতিপালিত হয়। পূজান্তে ভীমের জলঘট বিসর্জিত হলেও, মূর্তি বিসর্জিত হয় না।—পূজাস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাসে — সন্তান লাভ, সম্পদ বৃদ্ধি, কুপ্রভাব মুক্তি, সুবর্ষণ-সুফলন, বন্ধ্যাত্বমোচন, জাগতিক মঙ্গলবিধান প্রভৃতি ভীমপূজার মাহাত্ম্যরূপে বিবেচিত হয়। উচ্চ ব্রাহ্মণ প্রভাবিত অঞ্চলে ক্ষেত্রবিশেষে ভীমপূজায় নানা প্রকার শাস্ত্রমন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতার প্রাধান্য

দেখা গেলেও, সাধারণভাবে লোকায়ত সমাজে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানগত শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় এবং মূলত সমবেত আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে ভীম-উৎসব উদযাপিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভীমপূজা উপলক্ষে মেলা সংগঠিত হয়, যা এক থেকে সাত-আট দিন পর্যন্ত চলে এবং ভীমপূজা উপলক্ষে লাঠিখেলা, ব্যায়াম প্রদর্শনী, সার্কাস, থিয়েটার, যাত্রা, পুতুল নাচ প্রভৃতি আয়োজিত হয়।

তন্ত্রসাগরের মতে একাদশী পালন সর্বাধিক পুণ্যকর্ম। বিভিন্ন পুরাণে নানা প্রকার একাদশীর নাম উল্লেখিত হলেও সাধারণভাবে শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্তন ও ভীম একাদশীর মাহাত্ম্যই সবিশেষ ঘোষিত হয়। মাঘ মাসের শুক্লাপক্ষের একাদশী তিথি ভৈমী বা ভীম একদশীরূপে চিহ্নিত। লৌকিক প্রবচনে দেখা যায় —

শয়ন উত্থান পাশমোড়া
তার মধ্যে ভীমে ছোড়া॥

একাদশীতত্ত্ব অনুসারে ভীম একাদশী প্রতিপালন বিষ্ণুপাদপদ্মলাভের প্রকৃষ্ট উপায় —

ততঃ পুণ্যামি মা ভীমতিথিং
পাপ প্রণাশিনীম
উপোষ্য বিধানেন গচ্ছে বিষ্ণোঃ
পরং পদম॥

ভীম তিথিং ভৈমীত্বেন
খ্যাতামেকাদশীং॥

শাস্ত্রানুসারে মাঘী শুক্লা একাদশী ভীমের নামে চিহ্নিত হলেও মূলত নারায়ণ পূজার বিভিন্ন তিথির একটি অন্যতম একাদশী তিথি এবং ভৈমী একাদশীর মূল পূজার লক্ষ্য নারায়ণ, ভীম উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু মেদিনীপুরের লোকায়ত সমাজে ভৈমী একাদশী তিথিতে স্বয়ং ভীমেরই প্রাধান্য নানাভাবে সূচিত হয়। ভৈমী একাদশী সম্পর্কে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার কিংবদন্তী প্রচলন দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে নির্জলা উপবাসে

যে একাদশী পালন করে বিষ্ণুপূজান্তে ভীম জরাসন্ধ / দুর্যোধনকে বধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই একাদশীর নাম ভীম-একাদশী। গ্রামাঞ্চলে সংগৃহীত একটি তথ্যের সূত্রে দেখা যায় — মাতা কুন্তী একবার মাঘ মাসে পুকুরের জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকায় কিছুতেই স্নান করতে বা একাদশী ব্রত পালন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, তখন পাশের ক্ষেত থেকে উঠে এসে ভীম লাঙলের ফাল গরম করে পুকুরের জলে ডুবিয়ে জল গমন করে দেন এবং মাতা কুন্তীর একাদশী প্রতিপালনে সহায়তা করেন; তখন থেকে কুন্তীর আদেশে, বিষ্ণুর নির্দেশে ওই একাদশী ভীম-একাদশী নামে বিঘোষিত হয়। অন্য মতে মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টিতে ভিজে ভীম যেদিন প্রথম মর্ত্যে চাষের কাজ শুরু করেছিলেন সেই দিনটি ছিল মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী, ওই দিনটির স্মরণে প্রতি বৎসর ভীম একাদশী প্রতিপালিত হয়। মোটের উপর মেদিনীপুরের লোকসমাজে ভীম-একাদশীর উদ্ভব সম্পর্কে শাস্ত্র-পুরাণ-অতিরিক্ত নানা প্রকার স্থানীয় লৌকিক কিংবদন্তীর প্রচলন দেখা যায় যা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে মহাভারত ও ভীম সম্পর্কিত নানা প্রকার কিংবদন্তীর সবিশেষ প্রচলন দেখা যায়। মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার সীমান্তে গড়বেতা সংলগ্ন গণগনির ডাঙা লোকশ্রুতিতে ভীম ও বকরাক্ষসের যুদ্ধক্ষেত্ররূপে উক্ত হয় (এই প্রসঙ্গে গণগনির ডাঙার বকরাক্ষসের হাড় বলে কথিত 'ফসিলাইসড উড' এর কথাও উল্লেখযোগ্য), বগড়ি-কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ একারিয়া গ্রাম পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালের একচক্রারূপে অভিহিত হয়, একারিয়া নিকটস্থ ভিকনগর গ্রামে পাণ্ডবগণ ভিক্ষা করতেন বলে জনশ্রুতি প্রচলিত, মেদিনীপুর শহরের তিন মাইল পশ্চিমে গোপগিরি মহাভারতোক্ত মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ ছিল বলে কথিত হয়, দাঁতনের নিকটস্থ একটি পুষ্করিণী ভীমের পদাঘাতে সৃষ্ট বলে উক্ত হয়, খড়্গপুরের নিকটে ইন্দা গ্রামের খড়্গেশ্বর মন্দিরের সুপ্রশস্ত প্রান্তর হিড়িম্বাডাঙা নামে পরিচিত — জনশ্রুতি এই স্থানে হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হয়েছিল এবং এখানেই ভীম হিড়িম্বাকে বিবাহ করেছিলেন, দিগ্বিজয়ার্থে পূর্ব দিকে বহির্গত হয়ে ভীম বঙ্গদেশ জয় করেন এবং মেদিনীপুরের শালবনি থানার ভীমপুর গ্রাম পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন বলে কথিত হয়। তা ছাড়া

গোপগৃহে ভীমের পাদুকা প্রাপ্তির কথা। গোপের কাছে ও গণগনির ডাঙা প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকার ফাটলকে ভীমের গদার আঘাতের বা লাঙল চালানোর ফাটল বলে বর্ণনার কথা প্রভৃতি শোনা যায়। মোটের উপর বিভিন্নভাবে মেদিনীপুরে ভীম সম্পর্কিত নানা প্রকার কিংবদন্তীর সবিশেষ প্রচলন দেখা যায়, যা এই অঞ্চলের লোকমানসে ভীমের আধিপত্যের স্মারক। অবশ্য মেদিনীপুরে বিভিন্নভাবে মহাভারতের ও ভীম-প্রসঙ্গের কথা প্রচলিত থাকলেও ভীমপূজার সঙ্গে মহাভারতের সম্পর্ক অভিন্ন এমন দাবি করা যায় না, বরং বিপরীতক্রমে লৌকিক ভীমের আধিপত্যের সূত্রেই কালের বিবর্তনে মহাভারতের ও পৌরাণিক ভীমের প্রসঙ্গ মেদিনীপুরে পল্লবিত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। এদিক থেকে মহাভারতের স্বর্ণবর্ণাভ ও তুবরক ভীমের সঙ্গে মেদিনীপুরের লোকায়ত সমাজে পূজিত ভীমের মূর্তিতত্ত্ব ও দেহাবয়বগত পার্থক্যের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কালের বিবর্তনে যে রূপই পরিগ্রহ করুক না কোন ভীম মৌল উৎসে লৌকিক দেবতা এবং কৃষি অনুষঙ্গেই তার বিশিষ্ট বিকাশ বলে মনে হয়। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত মেদিনীপুরের যে মৃত্তিকায় বিভিন্ন সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাত ও মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে তার পটভূমিকায় গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে ভীমপূজার আদিম উৎসে হয়ত আদিমতম বিশ্বাস-অনুষ্ঠানের উত্তরাধিকার উদ্ঘাটন করা সম্ভব। পৌরাণিক স্মার্তপ্রভাবে আদিম লৌকিক ভীমকে মধ্যম পাণ্ডব রূপে চিহ্নিত করলেও লোকায়ত সমাজে ভীম মুখ্যত চাষী। লোক-প্রচলিত বিভিন্ন কিংবদন্তীর সূত্রে দেখা যায়, ভীমের প্রধান কাজকর্ম এবং লোকায়ত সমাজে ভীমের বিশেষ পরিচয়—খেতী, চাষী, হালুয়া, কৃষিকর্মের মুনিশ। অবশ্য উচ্চ সমাজের প্রভাবে শিষ্ট সাহিত্যে কৃষি অনুষঙ্গে ভীম শিবের কৃষিকর্মের প্রধান সহায়ক। মেদিনীপুরের কবি রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের সাক্ষ্যে দেখা যায়, ভীম শিবের কৃষিকর্মের মুনিশ, হাল্যা। কবি রামেশ্বর শিব-সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের লৌকিক খণ্ডে দেখা যায়, পার্বতীর পরামর্শে শিব দারিদ্র্য পীড়িত সংসারের অচলাবস্থা দূর করার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট থেকে কৃষিজমির পাট্টা সংগ্রহ করেন, শূল ভেঙে হাল প্রস্তুত করেন এবং কৃষিকর্মের জন্য

কৈলাস ত্যাগ করে দেবীচকে যান সঙ্গে চলেন শিবের কৃষিকর্মের প্রধান সহায়ক প্রধান হাল্যা ভীম —

ভীম আছে হাল্যা আর অনির্বাহ কি
হয় বলে হন্দ কৈলে হেমন্তের ঝি ॥

* * *

চন্দ্রচূড় চলে বৃষে চণ্ডীরয় চায়্যা
পিছু ভীম চলিল চাষের সজ্জা লয়্যা ॥

* * *

এই রূপে প্রতিদিন যায় রাত্রিকাল
ভীম কর‍্যা ভোজন প্রভাতে যুড়ে হাল ॥

মেদিনীপুরের লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, মেদিনীপুরের মাটিতেই ভীম প্রথম চাষ করেন এবং ভীমের দ্বারাই কৃষিকর্মের প্রবর্ত্তন হয়। এ সম্পর্কে একটি লৌকিক ছড়া উল্লেখযোগ্য —

মেদিনীপুরে হালুই ভীম,
ভীম ছড়া চাষী
তাই — ভীম একাদশী ॥

এখানে স্পষ্টতই কৃষিকর্মের সঙ্গে ভীমের প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং সেই সূত্রেই ভীম একাদশী আখ্যা বিঘোষিত হয়েছে, যা ভীম একাদশী বা ভীমপূজার অনিবার্য কৃষি অনুসঙ্গের স্বাক্ষর বহন করে।

ভীমের কৃষিসহায়ক চরিত্রের অন্যতম প্রধান পরিচয় বহন করে, ভীমপূজার কাল। ভীমপূজার কাল মাঘ মাস। পৌষ সংক্রান্তির ফসলোত্তর নবান্ন উৎসবের পর মাঘ মাস বাংলার কৃষককুলের নূতন উদ্যমে কৃষিকর্মের প্রস্তুতির কাল। খনার বচনে দেখা যায়, মাঘের মাটিই কৃষিকর্মের পক্ষে সর্বাধিক মূল্যবান —

মাঘের মাটি
হীরের কাঠি।

লৌকিক প্রবাদে কৃষিকর্মের অনুকূল হিসাবে মাঘ মাসের শেষের বর্ষণের বিশেষ খ্যাতি ঘোষিত হয়েছে —

যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

এই সূত্রে মাঘ মাসে ভীমকে পূজা করে কৃষি-সমাজের প্রার্থিত সুবর্ষণ লাভ করার কামনার কথা অনুভব করা যায় এবং সমগ্র ভারতবর্ষের পটভূমিকায় কোন কোন আদিবাসী সমাজে ভীমকে সুবর্ষণের দেবতারূপে চিহ্নিত করার কথাও উল্লেখ করা যায়। সর্বোপরি পূজান্তে সম্বৎসর দণ্ডায়মান ভীম যেন ক্ষেত-খামার, গ্রাম লোকালয়ের বলিষ্ঠ প্রহরী, যিনি সমস্ত প্রকার দুষ্টশক্তি ও কু-প্রভাব বিতাড়ন করে সকলের শুভ ও মঙ্গল বিধান করেন বলে বিবেচিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বীরত্বের প্রতিমূর্তি ভীম বিবর্তনের ধারায়, বিশেষত স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায়, সম্মিলিত যুবশক্তির প্রতীক হিসাবে পরিগণিত ও পূজিত হন।

মোটের উপর পূর্বাপর লোক-সংস্কৃতিবিজ্ঞানের আলোয় ভীমপূজার উদ্ভব ও বিকাশের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণে বোঝা যায় — মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপকরূপে অনুষ্ঠিত ভীমপূজা এক সার্বজনীন লোকায়ত উৎসব, প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত মেদিনীপুরের হারানো অতীতের অন্ধকারে তার আদিম উৎস হয়তো বিস্তৃত। মেদিনীপুর জেলার ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক ও সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমিকায় ভীম-কাল্টের সামগ্রিক পর্যালোচনায় বলা যায় — যুগ পরিবেশের প্রভাবে ও Little tradition — great tradition-এর প্রতিক্রিয়াজাত Universalization ও Parochialization এর বৈশিষ্ট্যে মহাভারতের মধ্যম-পাণ্ডবের বা শিবের উপাখ্যানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও এবং স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় সম্মিলিত যুবশক্তির পূজা হিসাবে বিবর্তিত হলেও, ভীম মূলত আদিম লৌকিক বিশ্বাস-অনুষ্ঠানের উৎসে উদ্ভূত ও বিকশিত, অশুভ শক্তি বিতাড়ক, ক্ষেত্র ও গ্রামরক্ষক এবং কৃষিসহায়ক দেবতা রূপেই বিবেচিত হয়।

॥ শেষ নিবেদন ॥

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যাপক ক্ষেত্রানুসন্ধান লব্ধ তথ্য ও আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের তত্ত্বনিষ্ঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগে পৌরাণিক-শাস্ত্রীয় প্রভাবের দূরে লৌকিক প্রথানুসারে পূজিত প্রধানত লোকদেবতার ও তৎসংশ্লিষ্ট উৎসবের রূপ ও প্রকৃতি পরিক্রমা করা হয়েছে। স্বভাবতই এই পরিক্রমা একদিকে যেমন উৎসবের বর্তমান ব্যবহারিক (functional) রূপ অনুধাবন করেছে, তেমন অতীত অনুসন্ধান বা আদিম উৎস (origin) অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছে। এক কথায় এক্ষেত্রে স্বল্পায়তনে হলেও কমবেশী সামগ্রিক রূপ পরিক্রমা করার চেষ্টা হয়েছে, লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের পদ্ধতিগত (methodology) পরিভাষায় যাকে সামগ্রিক পরিদর্শন বলা যায়। স্বভাবতই কমবেশী মৌলিক সিদ্ধান্ত সম্পন্ন মূল ও অনুষঙ্গী দেব-দেবী বা অনুষ্ঠান ধরে মোট ছয়টি লোকউৎসব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে পরিবেশন করা সম্ভবপর নয়। তাই বর্তমান প্রবন্ধে প্রধানত মূলবক্তব্যের রূপরেখাই তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত ও স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার বাসনা মনে পোষণ করে সবিনয়ে নিম্নলিখিত রচনাদির দিকে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সকলের নিকটে প্রবন্ধে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে নূতন তথ্য, জিজ্ঞাসা ও মন্তব্যাদি প্রার্থনা করছি যার দ্বারা ভবিষ্যৎ গবেষণা অধিকতর সার্থক হয়ে উঠবে বলে বিবেচিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যের ভূমিকা

শ্রী সনৎকুমার মিত্র

১. সূচনা :

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অগাষ্ট বঙ্গব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর বৃহৎ বঙ্গের খুব সামান্যতম অংশই আজ পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত হয়েছে। তথাপি 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা'-র মতো এই খণ্ডিত বঙ্গদেশেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এর উত্তরে তুষারমৌলী হিমালয় এবং দক্ষিণে সদা পাদবন্দনারত তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে ঊষর ও রুক্ষ বন-প্রান্তর এবং পূর্বে গঙ্গা বাহিত পলিমাটি সমৃদ্ধ শ্যামল শস্যক্ষেত্র। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য যেমন এর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্নতা ও ঐক্য সৃষ্টি করেছে তেমনি এর রস-মানসও নানা খাতে প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা অর্জন করেছে। তবে সবেরই লক্ষ্য এক গৌড়-বঙ্গীয় মহাসমুদ্রে আত্ম-বিসর্জনান্তে সাম্য লাভ।

এ-হেন পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তন ৮৭,৮১৭ বর্গ কিলোমিটার। কোলকাতা সহ মোট জেলার পরিমাণ ষোল। জলঢাকা, তিস্তা, মহানন্দা, ভাগীরথী বা হুগলী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, কংসাবতী ও রূপনারায়ণ এর প্রধান প্রধান নদীগুলির নাম। মূল 'আ-মরি' বঙ্গভাষা-জননী বরেন্দ্রী-রাঢ়ী-সমতটী-ঝাড়খণ্ডী প্রমুখ উপভাষা-বঙ্গা সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গীয় মনীষার গৃহলক্ষ্মী রূপে বসবাস করছেন। সঙ্গে আছেন সহোদরা স্বরূপা বিভিন্ন আদিজাতিগুলির মুখের ভাষা। এই ভাব-সম্পদ সম্বল করে একেবারে মাটি মায়ের কোলে আশ্রয় পেয়েছেন বেশ অনেক কয়েকজন আদি মানবকের বংশসম্ভূত পার্বত্য বা অ-পার্বত্য উপজাতি, প্রচুর সংখ্যক অ-বর্ণহিন্দু, আর্যরক্তের গৌরবাভিমানী বিমিশ্র বর্ণহিন্দু ও বিপুল পরিমাণের মুসলমান বাঙালী। এঁদের ধর্ম-কর্ম-

বিশ্বাস-আচার-আচরণ অনেক কিছুতেই যেমন মেরু ব্যবধান পার্থক্য রয়েছে, তেমনি এক অখণ্ড বাঙালীর জীবনবোধ ও বহু যুগ বাহিত সাংস্কৃতিক ঋকৃথকে যদি অনুসন্ধান করা যায় তা হলেও ব্যর্থ হতে হবে না।

এই পটভূমিকাকে মনে রেখে আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যের পরিচয় গ্রহণ করতে হবে। এখানে একথা বলা-বাহুল্য যে পশ্চিমবঙ্গে অন্য অনেক কিছুর মতোই লোকনৃত্যেরও অভাব নেই। এই মন্তব্যকে আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য-সম্পদ বলে যদি কোনো কিছুকে উপস্থিত করতে হয় তবে অবশ্যই তাকে তার ভূমি-জ 'লোক' ভাণ্ডারের দরজায় হাত পাততে হবে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য-চিহ্নিত নিজস্ব কোন ধ্রুপদী নৃত্য নেই।

২. উৎস পরিচয় :

বঙ্গীয় লোকনৃত্যের পরিচয় গ্রহণে প্রবিষ্ট হবার আগে এর আন্তরিক গুণকর্মের প্রসঙ্গটি আলোচনার সূত্রে তার উৎস-তাৎপর্যের কথা জেনে নেওয়ার প্রয়োজন। দেশে-বিদেশের প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ নৃত্যের জন্ম-রহস্যটি খুঁজে বার করতে গিয়ে নানা ধরণের মত প্রকাশ করেছেন। যেমন :

ক. আদিম সমাজে ব্যক্তি এবং সমাজকে দৈব-দুর্বিপাক থেকে রক্ষার উপায় হিসাবে ঐন্দ্রজালিক জাদুক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে নৃত্যের উদ্ভাবন হয়েছিলো বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন। তাঁদের মতে : 'সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আদিম সমাজ হইতে উদ্ভূত এই ক্রিয়া পরিত্যক্ত না হইয়া বরং নানা দিক হইতে শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের দ্বারা যুগোচিত পরিমার্জনা লাভ করিয়া আধুনিক জীবনে সামাজিকতার প্রয়োজনেও ইহাকে রক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার ধারা অত্যন্ত প্রাচীন — মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত'।১

খ. কারুর মতে ভাষাহীন আদিম মানুষ হাত-পা-নেড়ে যে অঙ্গভঙ্গী করতো তা-ই ধীর বিবর্তন-পথে নৃত্যের রূপ নেয়। 'আদিম যুগে মানুষের যখন ভাষা ছিলো না তখন নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ভাব প্রকাশ করতো'।২

গ. কেউ কেউ মনে করেন যে আদিম মানুষের যে শ্রমের ব্যবহার তার সঙ্গে যে অঙ্গবিক্ষেপ যুক্ত ছিলো তা-ই ক্রমে ক্রমে নৃত্যে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় শ্রমকে লাঘব করার জন্যেও নৃত্য ব্যবহৃত হতো।

ঘ. যে শস্য মানুষের জীবন ধারণের অবলম্বন, তার সু-ফলন এবং সুফল প্রাপ্তি এই দুই প্রসঙ্গেই নৃত্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন বিষয়ক কামনা বা আকাঙ্ক্ষা নৃত্যের জন্ম দিয়েছে, এই মতকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ঙ. 'যৌনাকর্ষণ নৃত্যের উদ্ভবের আর একটি কারণ বলে অনেকে মনে করেন। নৃত্য নরনারীর অঙ্গভঙ্গির কলাকৌশল এবং পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পরিশেষে যৌনবোধকে তীব্র করে — এই আদিম ধারণা থেকে নৃত্যের চর্চা অসম্ভব ছিলো না'।৩

এইভাবে অতি প্রাচীন কালে গোষ্ঠীবদ্ধ মানব-জীবনের নানা বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা, বিভিন্ন প্রকারের আচার-অনুষ্ঠান ও কর্মৈষণা নৃত্য তথা লোকনৃত্যের উদ্ভব ও বিকাশকে সম্ভব করেছে।

৩. সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

সাধারণভাবে লোকনৃত্যের আন্তর্তাৎপর্যের সন্ধান করার পর, সেই অভিজ্ঞান অবলম্বন করে পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি কি তা জেনে নেওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে এই বৈশিষ্ট্য যে কেবল পশ্চিমবঙ্গের আলোচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য. তা মনে করার কোনো কারণ নেই। কেন না এই সাধারণত্ব তাবৎ লোকনৃত্যের পটভূমিকাতেই অনুসৃত হয়ে থাকে। এবং প্রসঙ্গ-সূত্রে আন্তর্ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের সঙ্গে তার যোগ বা বিচ্ছিন্নতা কোথায় বা কতখানি তা-ও এসে যাবে।

ক. রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'ছেলেভুলানো ছড়া'র আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : 'এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত অপরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়া মাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘ-ক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো। সেইজন্যই বলিয়াছিলাম, ইহারা আপনি জন্মিয়াছে'।৪ এই বক্তব্যের মূল তাৎপর্য লোক-নৃত্যেরও বৈশিষ্ট্য-

দ্যোতক। এও 'হয়ে ওঠা শিল্পকলা'। যদিচ একটি সুশৃঙ্খল, ছন্দোময় এবং সংযমশীল অঙ্গবিক্ষেপই নৃত্য,—বা ধ্রুপদী নৃত্যের প্রাথমিক শর্ত; অন্যথা লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে ঐগুলির ব্যবহার ও ঐ বিষয়ে শিক্ষণীয় শাস্ত্র অনেকখানি আলগা। দীর্ঘ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে, কঠিন আয়াসে, অপরিবর্তনীয় শাস্ত্রবন্ধনে দেহ ভঙ্গিমা সুষমা-মণ্ডিত হয়ে ওঠে যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে; লোক-নৃত্যের বেলায় তা অতো কঠিন শিক্ষা বা অতোখানি আয়াসসাধ্য শাস্ত্রীয় সংযম প্রার্থনা করে না। বহু সময়ে বা অনেক ক্ষেত্রেই মনের এক স্বাভাবিক আবেগ থেকেই দেহ-কাঠামো 'দোলায়িত' হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে ধ্রুপদী নৃত্যে কিন্তু দেহ বল্লরী 'লীলায়িত' হওয়ার প্রয়োজন বোধ করে।

খ. ওপরের ঐ মন্তব্য থেকে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে লোক-নৃত্যের জন্যে কোনো শিক্ষা বা চর্চার প্রয়োজন হয় না; যেমন-তেমন ভাবে শরীরটাকে দুলিয়ে দুমদাম করে হাত পা নাড়লেই লোক-নৃত্য দেখানো যাবে। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়, এবং সেকথা বলা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। আসলে, লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার বদলে অভ্যাসের প্রয়োজন, জ্ঞানের পরিবর্তে আবেগ প্রার্থনীয়, কৌশলগত প্রকাশভঙ্গী অপেক্ষা মোটাদাগের স্বতঃস্ফূর্ততাই প্রধান। তাই লোক-নৃত্য 'লোক'-এ নেচেই শেখে, — অন্যদিকে ধ্রুপদী নৃত্য শিক্ষার পরেই নাচা যায়। অবশ্য কোনো কোনো নৃত্য-বিশেষজ্ঞ লোক-নৃত্যকে এতখানি স্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে না চেয়ে আঙ্গিক বিনিয়োগের তারতম্যে লোক-নৃত্যে এমন দুটি ভাগ উপস্থিত করেন যার দ্বিতীয় অংশটি আবার শাস্ত্রীয়-নৃত্যের খুব কাছাকাছি। তাঁদের মতে লোক-নৃত্যের দু-ভাগের মধ্যে একভাগ, 'স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ, সাবলীল, এক ঘেঁয়ে, সমবেত গোষ্ঠী নৃত্য। এবং অন্যভাগ, জটিল তাল লয়-ছন্দে শাস্ত্রীয় আঙ্গিকের গতি-চারী-চলন-উৎপ্লাবন, ভ্রামরী, অঙ্গভেদা, ও হস্তকর্মে পুষ্ট লোক-সমাজের নাট্যধর্মীয়'।৫

গ. উক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্যেই লোক-নৃত্যের মধ্যে কোনো ক্ষেত্রেই চোখ-হাত আঙুল বা মুখমণ্ডলের কোনো মুদ্রা বা প্রতীক-ব্যঞ্জনা নেই। এদিক থেকে লোক-নৃত্য সরল [Flat] বা কোনো মাত্রা [Dimension] রচনা করতে পারে না। অপর পক্ষে, যথোপযুক্ত ভাব-সমৃদ্ধ মুদ্রা ব্যবহারের

দ্বারা শাস্ত্রীয়-নৃত্য রূপক ব্যঞ্জনায়, প্রতীক-সৃষ্টির মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। ফলে, এ জটিল ও বহুযান্ত্রিকতা গুণ অর্জন করে।

ঘ. পোষাক-পরিচ্ছদ বা অঙ্গসজ্জা, — যাকে ইংরেজী পরিভাষায় বলে : dress, costume and make-up তা লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্য মাত্র। রোজকার জীবনে ব্যবহৃত সাধারণ বা সীমিত বস্ত্র-অলঙ্কার বা দেহ সজ্জাই লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, শাস্ত্রীয় নৃত্যের নর্তক তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ, তাঁর সুনিপুণ অঙ্গ সজ্জার মধ্যে দিয়ে একটি রীতিবদ্ধ-নিয়মনিষ্ঠা সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টা পেয়ে থাকেন। ক্ষেত্র বা নৃত্য-বিশেষে সজ্জা বা ভূষণের অভাব বা পরিবর্তন ঘটাটা শাস্ত্রীয় নৃত্যের পক্ষে অনাচার হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে।

ঙ. আমরা জানি যে লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতা হচ্ছে তার প্রাথমিক-সর্ত। এখানে একের সৃষ্টি দশজনের হাত বেয়ে সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণতি লাভ করেই লোকসংস্কৃতি স্বাভাবিক স্ফূর্তি লাভ করে। এখানে সচেতন-ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন অবকাশ নেই। এবং যেহেতু লোক-নৃত্য লোক সংস্কৃতিরই একটি উপাঙ্গ সেহেতু এখানে নৈর্ব্যক্তিকতা আবশ্যকীয়। ফলে, একের ভাব বা আবেগ সমগ্র লোক-সমাজের মধ্যে মিশে গিয়ে ব্যষ্টির সামান্যতম সচেতনতাকে সমষ্টির যৌথ অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ণ মুক্তি দিয়ে ফেলে। এ হয়ে ওঠে সাধারণের সম্পত্তি।৬ এই জন্যেই লোক-নৃত্যের আসরে দূরে বসে বাবুমশায় দর্শক হয়ে থাকলে পূর্ণ আনন্দ পাওয়া যায় না — কখন যে অজান্তে পায়ে পায়ে, মনে মনে, সমগ্র দেহ কাঠামোটিতে নাচের ছন্দ এসে যোগ দিয়ে ফেলেছে, ঐ নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে ফেলা গেছে তা বোঝা যায় না। স্বচ্ছন্দ, সহজ-সরল প্রাণাবেগে পূর্ণ দলবদ্ধ আনন্দ-সৃষ্টি ও তার উপভোগেই লোক-নৃত্যের মৌলিক সিদ্ধি। তার আবেগ এবং শক্তি দর্শককে আসরে টেনে এনে নাচিয়ে ও নেচে অনাবিল আনন্দরস পান করায়। অপরদিকে রূপদী নৃত্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মসুখসর্বস্ব। শিল্পীর সামগ্রিক চৈতন্যের [intellect] রঙে, ৭ অহংবোধের [ego] উজ্জ্বল উপস্থিতিতে, ব্যষ্টির সন্তোষবিধান এবং উৎকর্ষ প্রদর্শনের মধ্যেই এর স্ফূর্তি। এবং ঠিক এই কারণেই সচেতন

ব্যক্তিত্ব [individuality]-চিহ্ন এই নৃত্যে একটি সূক্ষ্ম রসবোধ এবং সজ্ঞান সৌকর্য সৃষ্টি করে থাকে।

চ. এরই সঙ্গে লোক-নৃত্যের আরও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচ্য। তা-হচ্ছে যূথবদ্ধতা। আমাদের জানা আছে যে সমগ্র 'লোক'-এর জীবন-ব্যবস্থায় সংহত চৈতন্যের বোধ একান্ত ভাবে সক্রিয়। তাই লোক-নৃত্য মাত্রেই হয়ে ওঠে প্রতিষ্ঠিত জীবনাবর্তের গতিময় এবং দলবদ্ধ ৮ প্রথানুসরণ। অন্যদিকে ধ্রুপদী নৃত্যের ক্ষেত্রে যেমন সংহত গোষ্ঠী চেতনার কোনো স্থান নেই, তেমনি দেখতে পাওয়া যায় না কোনো প্রথানুসরণ। যুগে যুগে কালে কালে অসংখ্য নৃত্যবিদ্ আপন ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধি বা প্রতিভার শক্তিতে প্রথার শৃঙ্খলকে ভেঙে নব নব সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়ে ধ্রুপদী নৃত্যকে একঘেঁয়েমি থেকে বাঁচিয়ে দিতে পেরেছে। এই কারণে যাঁরাই লোক-নৃত্য দেখেছেন তাঁদের কাছ থেকেই এক ঘেঁয়েমির অভিযোগ শুনতে হয়েছে।

ছ. লোকনৃত্য অকৃত্রিম এবং স্বতঃস্ফূর্ত। এর মধ্যে দিয়ে একটি জাতির জীবন-বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে থাকে। লোক-শিল্পীর চৈতন্য সংবদ্ধ থাকে নৃত্যে—আত্মপ্রকাশে নয়। অপর পক্ষে ধ্রুপদী নৃত্যের শিল্পী চেষ্টা করেন দর্শকের কৌতুকবোধ জাগ্রত করতে, তার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করতে।৯ এখানে শিল্পীর চেষ্টা থাকে নৃত্যের ব্যাকরণকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করে আপন ব্যক্তিত্ববিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মনোরঞ্জন করা। ফলে বহুক্ষেত্রেই কৃত্রিমতা ধ্রুপদী নৃত্যের সরল ও উদ্দাম প্রাণৈশ্বর্যকে ব্যাহত করে। এপ্রসঙ্গে যথার্থভাবেই বলা হয়েছে: 'লোকনৃত্যের জন্য কৃত্রিম মাচা বাঁধতে, আলো জ্বালতে বা পট ঝোলাতে হয় না। শিল্পীদের পায়ের তলায় থাকে অনাবৃত শ্যামল ভূমি, মাথার উপরে থাকে অসীম আকাশের নীলিমা।... শিল্পীরা হয়তো সেখানে নিজেদের শিল্পী বলেই জানে না, শুকনো ব্যাকরণের বাঁধা বচনও তাদের অজানা। নাচে তারা অচলায়তন থেকে মুক্ত প্রবল জীবনের আনন্দে এবং অঙ্গভঙ্গে ছন্দে ছন্দে প্রকাশ করে সরল প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই। যে কোন জাতির সত্যিকার আত্মা খুঁজে পাওয়া যায় তার লোকনৃত্যে…',১০

জ. বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে বৈচিত্র্যহীনতা হচ্ছে লোক-নৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যপক্ষে ধ্রুপদী নৃত্যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের পরিধি যেমন বিস্তৃত তেমন তার বৈচিত্র্য ও লক্ষণীয়। তালযন্ত্র ছাড়া ধ্রুপদী নৃত্য যেমন অসম্ভব, অপরদিকে লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে তালযন্ত্রের ব্যবহার কিছু কম, কোনো কোনো জায়গায় আবার কেবল হাততালির সাহায্যে লোক-নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গ্রাম্য অর্থাৎ দেশজ বা লোক-সমাজের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাদের নৃত্যের ক্ষেত্রেও সেইগুলিই অকপটে এবং সহজ শিক্ষায় বাজানো হয়ে থাকে। লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বলতে গিয়ে স্বনামখ্যাত লোক-নৃত্য গবেষক গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখছেন:

Bengali folk dances are robust in character and entirely wanting in the melting softness of movement and sensual music......The instrument accompanying most of them, not excluding women's dances is the roboust drum,......Even the softest Bengali folk dance, the *Brata* dance of girls and married women, is accompanied by the virile *dhāk* [big drum], characterized by a great sturdiness and by the complete absence of any cloying sensual suggestion'.১১

লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। তা-হচ্ছে এই যে এক একটি নাচের জন্য এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। যেমন: বাউল নাচের ক্ষেত্রে পায়ে নূপুর, একতারা বা লাউ, কোমরে বাঁয়া অপরিহার্য। অথবা, ছৌ-নাচে ঢোল,[২] ধামসা ও সানাই অবশ্য প্রয়োজনীয়। অন্য সবই বাহুল্য মাত্র। কিন্তু উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ক্ষেত্রে এই ধরণের কোনো সুনির্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করার রীতি বা ট্যাবু লক্ষ্য করা যায় না।

ঝ. কণ্ঠ-সঙ্গীত বা Vocal Music প্রায় সব লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যিক উপাঙ্গ। যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে দেহে নাচ আসে, সেই

একই প্রাণোচ্ছলতায় কণ্ঠে সুর জাগে। বা বিপরীত ভাবে বলা যায় যে লোক-সঙ্গীতের মধ্যে যে সহজ সুরবোধ অথবা ভাবালুতা রয়েছে তাই-ই দেহে দোলা জাগায়। গান আপনিই নাচকে টেনে আনে। লোক-সংস্কৃতিতে গান ও নাচ হরগৌরীর মতো সম্মিলিত।

ঞ. লোক-নৃত্যে গান ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। যেমন: লোক-সঙ্গীতের ভাবের তাৎপর্য লোকনৃত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হবেই এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ প্রসঙ্গে নৃত্য ও সঙ্গীতবিদ্ বলছেন: 'নাচে গান থাকলেও গানের প্রত্যেক শব্দ ধরে অর্থ প্রকাশের কোন চেষ্টাই করে না নাচিয়েরা। গানের মূল ছন্দটাই এ নাচের প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে'।১২ ইনি অন্যত্র আরও বলছেন: 'গানের কথায় যে অর্থই প্রকাশ পাক না কেন, নাচিয়েরা নাচের ভিতর দিয়ে...তার অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করে না। একমাত্র লক্ষ্য থাকে গানে ও বাজনার ছন্দের সঙ্গে নিজেদের দেহভঙ্গীর ছন্দকে মিলিয়ে নেবার। এই সব গানের কলির পর কলিতে কথা বদলে যাচ্ছে, কিন্তু সুরের বদল হয় না; নাচেও ঠিক তাই। ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই এই সব নাচে, গানের সুরের মত'।১৩ ফলে লোকসঙ্গীতে যেমন সুরের একঘেয়েমি ও দীনতা, নৃত্যেও তেমন গভীর ইঙ্গিতবহ ভঙ্গীর অভাব। 'কলাকৌশল দ্বারা গানের অর্থ প্রকাশের ভেতর দিয়ে নাচকে নিখুঁত করার চেয়ে অন্তর আবেগের টানে আনন্দলোক রচনা করাই লোকনৃত্যের প্রধান লক্ষ্য'।১৪

আরও খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করলে লোকনৃত্যের আরও কিছু অপ্রধান বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু সেই ধরণের অতিব্যাপ্তি দোষ এড়িয়ে আমরা উপরে পর্যালোচিত বিষয় থেকেই লোকনৃত্যের সাধারণ বিশিষ্টতাকে বুঝে নিতে পারবো আশা করি। এখন আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যকে তার প্রয়োগ লক্ষণ রীতি প্রভৃতির বিচারে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করবো।

শ্রেণীবিভাগ:

প্রাথমিক ভাবে এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রকৃতি নির্ণয় করে লোকনৃত্যকে তিন ভাবে ভাগ করা যায়: ক. পুরুষের নৃত্য [Male Dance]। এমন

অনেক নৃত্য আছে যেখানে কেবল পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করে থাকে। এতে মেয়েদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় না, সাধারণত দুটি কারণে : এই সব নাচে মহিলারা শারীরিক ভাবে অপটুত্ব অনুভব করে থাকেন। যেমন, পাইক নাচ, বা ছৌ-নাচ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত : ধর্মীয় নিষেধ বা ট্যাবু [Taboo]। যেমন : ছৌ-নাচ, কি আলকাপ নাচ বা গম্ভীরা নাচ। খ. নারী নৃত্য বা মেয়েলী নাচ [বা Female Dance]। এই সব মেয়েলি নৃত্যে পুরুষদের অংশগ্রহণ সাধারণত ট্যাবু হিসেবেই গণ্য। যেমন, হুদমদেও নৃত্য বা মুসলমানী বিয়ের নাচ ইত্যাদি ইত্যাদি। গ. এমন কিছু নৃত্য আছে যাতে নারী এবং পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করে থাকে। উভয়ের মিলিত নাচে সমগ্র নৃত্য প্রাঙ্গণ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। একে আমরা মিশ্র নৃত্য [বা Common Dance] বলতে পারি। যেমন, নাচনী নাচ নাচনী ও রসিকের মিলিত নৃত্য। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষনীয় যে তুলনামূলক বিষয়ে নারী বা পুরুষের পৃথক পৃথক নৃত্যের সংখ্যাধিক্যের পাশে উভয়ের মিশ্রনৃত্যের সংখ্যা অনেক অ-নে-ক কম। এর প্রকৃত কারণ কি তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার অবকাশ এখানে না থাকলেও মোটামুটিভাবে মনে হয় মধ্যযুগের বাংলা দেশে যে সমাজ-ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে মেয়েরা ব্রত ও আচার অবলম্বন করে প্রধানতঃ অন্তঃপুরে নৃত্য করে থাকলেও প্রকাশ্যে পুরুষের সঙ্গে একত্রে নাচতে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করেছে। অথচ প্রাচীন বঙ্গদেশে নারী-পুরুষ প্রায়শই মিলিতভাবে নাচে যে অংশ নিতো তা চর্যার একটি পদ থেকে জানতে পারা যাচ্ছে। সেখানে বলা হচ্ছে : 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই'।। [১৭/৫]। অথচ এর আশে পাশে আদিবাসী সমাজে নারী পুরুষের মিলিত নৃত্যই সর্বাপেক্ষা উদ্দাম ও আকর্ষণীয়।

এর পর আমরা লোকনৃত্যকে তার প্রকরণের দিক্ থেকেও আবার দু-ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন : ক. দলবদ্ধ নৃত্য বা গ্রুপ ডান্স [group dance]! দলবদ্ধ নৃত্য বা গ্রুপ ডান্স-এর প্রকৃত অর্থ তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে লোকসংস্কৃতিবিদ্ লিখছেন : "ইংরেজি গ্রুপ ডান্স [group dance] কথাটিকেই সারি নৃত্য বলিয়া বাংলায় উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা

সত্ত্বেও ইহার মধ্যে কতকটা অস্পষ্টতা থাকিয়া যায়। সারি নৃত্য বলিলেই হয়ত কেহ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া বহু সংখ্যক নরনারীর নৃত্য মনে করিতে পারেন; কিন্তু ইংরেজি 'গ্রুপ ডান্স' কথার অর্থ তাহা নহে; ইহাতে সারিবদ্ধভাবে না দাঁড়াইয়াও অর্থাৎ এলোমেলো ভাবে দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র জনতার যে নৃত্য, তাহা বুঝাইতে পারে। বাংলায় এই ভাবটি গোষ্ঠীনৃত্য শব্দ দ্বারাও প্রকাশ করা যাইতে পারে। কিন্তু গোষ্ঠী নৃত্য কথাটি বাংলায় অপরিচিত, বরং সমবেত কণ্ঠে যে লোক-সঙ্গীত গীত হয়, তাহা সারি গান বলিয়া পরিচিত, সুতরাং এই সূত্রে এই অর্থে নৃত্য কথাটি ব্যবহার করা যায়'।১৫ অর্থাৎ আমরা 'দলবদ্ধ নৃত্য' বা Group dance-কে 'সারি নৃত্য' বলে পরিচিত করতে পারি।

খ. এই বিভাগ-পর্যায়ের দ্বিতীয় ভাগটি হচ্ছে 'একক বা সোলো ডান্স [Solo Dance]। লোকসংস্কৃতিতে একক চৈতন্য [individuality] অস্বীকৃত। তথাপি যে গোষ্ঠী বা সংহত জীবনের অনুপন্থী হিসেবে লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাঙ্গ লোকনৃত্যের জন্ম হয়েছিলো সেখানে নির্বিশেষে 'একক নৃত্য'-এর মধ্যে কোনো কোনো ভাবে ব্যক্তি চৈতন্যের ছিটে ফোঁটা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকতেও পারে। এবং সেখানেই একক নৃত্য হয়ে উঠেছে সুন্দর—হয়তো বা গতানুগতিকতা মুক্ত। তবে লোকনৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেহেতু ধর্মের আঁচল ধরে আছে যেহেতু একক লোকনৃত্যের আবেদন প্রকৃত 'লোক'-সমাজে অনেক কম।

এই প্রসঙ্গে এই দুই বিভাগের লোকনৃত্য-র উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে কিছুটা তুলনার অবকাশ থেকে যায়। প্রথমত, 'সারি নৃত্য'-র বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে কারুর মত এই যে মানুষের সমাজ সভ্যতার আদি ফসল। কারণ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্ত ফসলই আদিতে গোষ্ঠীচেতনার গর্ভে জন্ম লাভ করেছিলো। এবং এই সূত্রে লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানের মতো লোকনৃত্যও গোষ্ঠীগত ভাবেই প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিলো। এর বিপক্ষে কেউ কেউ মত দেন যে যাদুবিশ্বাস ও তৎঅনুসঙ্গী ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া আদিম অবস্থায় যে নৃত্যের সৃষ্টি করেছিলো তা 'সারি নৃত্য' নয়, 'একক নৃত্য' [Solo Dance]। তাই 'এককনৃত্য'-ই মানব-চেতনার 'আদিগঙ্গা ভগীরথ'। কিন্তু যাঁরা লোকনৃত্যের মৌল তাৎপর্যটি অনুধাবন করতে পেরেছেন তারাই স্বীকার করবেন যে কোনো মতবাদই চূড়ান্ত নয়। কেন না 'সারি' ঐন্দ্রজালিক

নৃত্যও যেমন আছে, তেমনি গোষ্ঠী চৈতন্যের প্রকাশক 'একক' অথবা তার কাছা কাছি দ্বৈত নৃত্যও আছে

এর পর আমরা ব্যবহারের দিক থেকে লোকনৃত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এই ভাবে ভাগ করতে গিয়ে খ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ গুরুসদয় দত্ত বাংলার সমগ্র লোকনৃত্যকে এগারটি অভিপ্রায় বা Motive ভাগ করেছেন। এবং এইভাবে ভাগ করতে গিয়ে তিনি লিখছেন :

'The motive and content of the various folk dances of Bengal constitute an extremely interesting field for study and also furnish a basis for their classification. The following classification will help to distinguish the characteristics and the basic feature of the various folk dances of Bengal. In each case an attempt has been made to distingnish the motive on the one hand and the content on the other. It must be explained here, however, that although some classification of this kind is obiously essential for clearly distingnishing the general features and character of the various dances as they are practised today, it is perhaps at the same time correct to say that all dances...may be considered as directly related to spiritual aspirations'.১৬

এর পর তাঁর কৃত বিভাগগুলি হলো এই : ক. যুদ্ধ অভিপ্রায়' [War Motive], খ. 'ক্রীড়া অভিপ্রায়' [Play Motive], গ. [১] 'আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন, বর দেওয়া ও প্রার্থনা করা অভিপ্রায়' [Ceremonial Greeting, Boon giving and Boon asking motive], [২] 'আদর্শের পরিপূর্তি এবং একান্তভাবে আত্ম-প্রকাশক অভিপ্রায়' [Ideal fulfilment and complete Self-Expression Motive], ঘ. 'সামাজিক অনুষ্ঠান এবং শুভাকাঙ্ক্ষা অভিপ্রায়' [Social ceremony and well-wishing Motive], ঙ. 'আনন্দাত্মক ভাব-সম্মিলন অভিপ্রায়' [Joyous self-Union Motive], চ. 'আধ্যাত্মিক নিবৃত্তি এবং আত্মশুদ্ধি অভিপ্রায়'

[Spiritual Supplication and Self-Purification Motive], ছ. 'নীতিমূলক অভিপ্রায়' [Didactic Motive], জ. 'স্মৃতি রক্ষার্থক অভিপ্রায়' [commemoration Motive], ঝ. 'প্রতিনিধিত্বক এবং ভাবান্তরাত্মক অভিপ্রায়' [Representational and Interpretative Motive], ঞ. 'উপযুক্ত প্রমাণাত্মক অভিপ্রায়' [Fitness proving Motive], ট. প্রসন্ন-ক্রিয়াত্মক অভিপ্রায়' [Propitiation Motive]।১৭

এই অভিপ্রায়গত বিভাগগুলি লোকনৃত্যে'র বিভাগের ক্ষেত্রে চরম স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন। এবং অন্তর্গত নাচগুলির অনেক কটিকেই ঠিক লোক-নৃত্য হিসেবে গ্রহণ করা শক্ত। নৃত্য প্রকরণ, আঙ্গিক রূপসজ্জা, 'অভিপ্রায়ে'র [Motive] মাধ্যমে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে গিয়েই এমনটি ঘটেছে। এবং অনাবশ্যক জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। এর চেয়ে বরঞ্চ আমরা আমাদের লোক-নৃত্যকে ১। আচার নৃত্য, ২। আনুষ্ঠানিক নৃত্য, ৩। আঞ্চলিক নৃত্য, ৪। ঋতু [seasonal] নৃত্য, ৫। বীর বা যুদ্ধ নৃত্য, ৭। মুখোস নৃত্য, ৮। কাহিনী নৃত্য প্রভৃতি কয়েকটি ভাগে ভাগ করি তবে মনে হয় অতিব্যাপ্তি দোষকে অনেকখানি এড়ানো যাবে।

পরিশেষে এই শ্রেণী বিভাগ প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের লোকনৃত্য সম্পর্কে মনে রাখলে বিষয়টি অনেকটা সরল হয় তা হচ্ছে ওই যে, এই সব বিভাগ বা উপবিভাগের কোনোটিই অস্থচিভেন্ত বিচ্ছেদ রেখা মেনে স্থির হয়ে থাকে না। মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটিই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

৫. নৃত্য পরিচয়ঃ

ওপরে সামগ্রিকভাবে লোকনৃত্যের উৎস-সাধারণ বৈশিষ্ট এবং শ্রেণী-বিভাগের মধ্যদিয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যের যে পরিচয়-পটভূমিকা রচিত হয়েছে এবার থেকে কয়েকটি নৃত্যের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমে আমরা পুরুষ কর্তৃক, সারিনৃত্যের অন্তর্গত 'প্রতিনিধিত্ব এবং ভাবান্তরাত্মক অভিপ্রায়'-এর দ্যোতক১৮ একটি মুখোশ পরিহিত আচার নাচের পরিচয় উপস্থিত করবো।

[১] নৃত্যটির নাম ছৌ-নৃত্য ঝাড়খণ্ড তথা রাঢ়বঙ্গের অন্তর্গত পুরুলিয়া জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় এই নাচ।

ছৌ আবশ্যিক ভাবেই মুখোশ নৃত্য। বাঙালীর স্বাভাবিক যে মূর্তি-নির্মাণ কুশলতা তার প্রতিভার সংযোগে ভারতীয় পুরাণের বিভিন্ন দেব-দেবী, দৈত্য-রাক্ষস, নর-বানর চরিত্রগুলির অনুরূপ মুখোশ তৈরী করা হয়। এগুলির বর্ণ-সুষমা এবং স্বাভাবিকতা প্রথম দর্শনেই রসিক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই নাচের উৎসমূলে যে শিব-গাজনের প্রভাব আছে তা এক প্রকার স্বীকৃত। তবে এই নাচের তাল, ভঙ্গিমা, রস-নিষ্পত্তি লক্ষ্য করে কেউ কেউ একে যুদ্ধ-নৃত্য বা সৈন্য-বাহিনীর আরামস্থল ছাউনীর নৃত্য বলতে চান। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, এই জেলায় 'নাচনী' নামে একধরণের লোকনৃত্য আছে। এই 'নাচনী'-র আদি রূপ যে 'জমিদারী নাচনী' তার বাদ্য যন্ত্র, নৃত্য-ভঙ্গী ইত্যাদি কতকগুলি বৈশিষ্টের দিকে খুব সচেতন ভাবে নজর দিলে দেখা যাবে যে ছৌ-নাচের উৎস পরিকল্পনায় উক্ত 'নাচনী নাচে'র কিছু কিছু প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

যাই হোক, ছৌ-নাচ পুরুলিয়া জেলা এবং তার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়ে থাকে। যদিচ, ছৌ-নাচের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে কোন গান সংযুক্ত নেই; তথাপি প্রত্যেক পালা আরম্ভ হওয়ার আগে সেই সেই পালার পরিচয়সূচক একটি করে গান গাওয়া হয়। একে 'রঙ' বা 'রঙ ঝুমুর' বলে। যেমন, মহাভারতের 'অভিমন্যু বধ' পালাটি আসরে অভিনীত হলে ঝুমুর গায়ক আসরের চারধার ঘুরে ঘুরে গান ধরলেন:

'কোথা আছ হে মামা শ্রীমধুসূদন।
বিপদ সময়ে হরি দাও হে দরশন॥
কোথা পিতা পার্থবীর কোথা রাজা যুধিষ্ঠির
কোথায় আছ বীর বলরাম॥
কোথায় আছ দুই মাতৃ-সুত আজি রণে হলাম হত,
তাই আমি ডাকি ঘনে ঘন॥
সপ্তরথী তনু সুধা ধনুর্বাণ আদি গদা
অস্ত্র নাই হস্তের উপর।
চতুর্দিকে ফিরে যাই কারে না দেখিতে পাই
আজি রণে নিশ্চয়ই মরণ॥'

এই 'রঙ'-টি গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধামসায় গুমগুম শব্দ উঠতে থাকবে। ঢোল ও সানাই-এর সুরে এই রঙটিকে বাজানো বা 'রঙ ভাজানো' হবে। তারপরেই তাল ফিরিয়ে নতুন বোলে ঢোল ও সানাই এবং সঙ্গে ধামসা অভিমন্যু বধের সুর ধরবে। এবং এই সুর অনুসরণ করে হাতে অস্ত্র ও মুখে মুখোশ বেঁধে আসরে প্রবেশ করবে অভিমন্যু।

রামায়ণ-মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের কাহিনীই ছৌ-নাচের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। সাধারণত ঐ কাব্যগুলির যুদ্ধাত্মক অংশগুলিকেই আসরে টুকরো টুকরো ভাবে হাজির করা হয়। যেমন, অভিমন্যু বধ, গো-সিংগা বধ, রাবণ বধ, তাড়কা বধ ও হরধনু ভঙ্গ, কিরাত-অর্জুনের যুদ্ধ, বৃত্রাসুর বধ ইত্যাদি। তবে কোন কোন জায়গায় রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ থেকে আরম্ভ করে রাবণ বধ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাম কাহিনী নিয়েও সারা রাত ধরে ছৌ-নাচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ছৌ-নাচ একটি পূর্ণ-রাত্রির অনুষ্ঠান। অনেকে তাঁদের বিশ্বাসানুযায়ী সূর্য আকাশে থাকলে এই নাচ আরম্ভ করতে চান না। খোলা আকাশের নিচে, যাত্রার মতো গোল আসরে, মাটির ওপরেই এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চৈত্র মাসের শেষ থেকে প্রায় গোটা আষাঢ় মাস পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন ভালো করে বর্ষা না নামে ততদিন ছৌ-নাচের একটা না একটা আসর পুরুলিয়ার কোনো না কোনো গ্রামে দেখতে পাওয়া যাবে।

সাধারণত নিম্নাঙ্গে মালকোঁচা মেরে পরা ধুতি বা কোথাও কোথাও ঘুটনা এবং নিরাবরণ ঊর্দ্ধাঙ্গ, ও মুখে মুখোশ এই হচ্ছে ছৌ-নাচের পোষাক। তবে কিছু কাল থেকে যাত্রার বর্ণাঢ্য পোষাক ব্যবহারের চল হয়েছে। এই নাচের উদ্দামতা, বীরভাব, লাবণ্যমণ্ডিত মুখোশ ও দৃঢ়বদ্ধ কাহিনী একে এক উচ্চাঙ্গের লোকগীতি নাট্যের মর্যাদা দান করেছে।১৯

এখানে ছৌ-নাচের প্রারম্ভে আবশ্যিক ভাবে অনুষ্ঠেয় 'গণেশ নন্দনা'-র একটি 'রঙ ঝুমুর'-এর উদ্ধৃতি এই নৃত্য পদ্ধতির আলোচনা শেষ করা হলো:

'সকল সিদ্ধিদাতা
জয় জয় হর-গৌরীর নন্দন।

কি সুন্দর চতুর্ভুজ গজেন্দ্র বদন,
বিঘ্ন বিনাশন।'

[২] এখানে আমরা আরও একটি ভিন্ন প্রকরণ বা অভিপ্রায়ের লোক নৃত্যের উদাহরণ দেবো; যার নাম 'কাঠি নাচ'। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় একে 'ক্রীড়া অভিপ্রায়' [Play Motive]-এর অন্তর্গত করতে চেয়েছেন।২০ এই মত মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নৃত্যের মধ্যে যুদ্ধের বা বীর নৃত্যের ভাবও যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। আবার একে আঞ্চলিক নৃত্য বলেও চিহ্নিত করা যায়।

বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম অর্থাৎ মোটামুটিভাবে মধ্য রাঢ় অঞ্চল বলতে যে স্থানকে বোঝায় সেখানে দুর্গা পূজার অষ্টমী-নবমী থেকে আরম্ভ হয়ে সপ্তাহ কালব্যাপী এই 'কাঠি নাচ' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ছেলেরা মেয়েদের মতো শাড়ীকে ঘাঘরার মত ও ব্লাউজ পরে হাতে দুটো ছোট এবং লালরঙ করা কাঠি নিয়ে গানের সঙ্গে নাচ করে। এটি দলবদ্ধ বা 'গ্রুপ ডান্স'। যারা নাচে তারা সাধারণত গান করে না। অন্য একজন মাদল বাজায় বা মৃদঙ্গ নিয়ে নেচে নেচে এবং ঘুরে ঘুরে গান করে আর এই গায়ককে ঘিরে একটি বৃত্ত রচনা করে কাঠির আঘাতের দ্বারা তাল তুলে নাচ হয়। সঙ্গে কাঁসি, আড়বাঁশি বা খঞ্জনি বাজতে থাকে। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে এই নাচ যারা নাচে তারা মুখে উৎকট পেণ্ট [Paint] করে। বিষ্ণুপুর অঞ্চলে কিছু কম।

উমা-মেনকা বা হর গৌরী কিংবা কৃষ্ণের বাল্যলীলাকে বিষয় করে এই গানগুলি রচিত হয়। অনেকে মনে করেন যে এই নাচ ও গান কৃষ্ণের গোষ্ঠ-লীলার স্মারক। এখানে একটি 'কাঠি নাচে'র গান উদ্ধৃত হলো:

সম্মুখে দাঁড়ায়ে গৌরী
কহে নতি বিনয় করি,
শুন হর করি নিবেদন।। হো-হো-হোই।।
এসেছেন পিতা লয়িতে
যাব জননী দেখিতে
তাই বিদায় মাগি ত্রিলোচন।। হো-হো-হোই।।

এই কাঠি নাচের-ই উপ-জাত আরও এক ধরণের নাচ আছে তাকে 'পাতা নাচ' বলে। কোথাও কোথাও বিশেষত বিষ্ণুপুর অঞ্চলে 'পাতা নাচ' ও 'কাঠি নাচ'কে পৃথক করা হয়; ঝাড়গ্রামে তা করা হয় না। তথাপি একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যাবে যে উভয় নাচ একই উৎস থেকে জাত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঠি নাচের বিষয়ই আরও একটু তরল জীবনাশ্রয়ী হয়ে পাতা নাচে পরিণত হয়েছে। অনেক জায়গাতেই কাঠি নাচের নর্তকেরাই ঐ একই পোষাক পরে, কেবল লাঠিগুলি ছেড়ে দিয়ে হরিণ শিকার, কিংবা ক্ষেত্রে হালবদল চালনা ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে তরল কৌতুক রসের আশ্রয়ে নাচতে থাকে। এখানে 'পাতা নাচে'র একটি গান উদ্ধৃত হলো :

'ছোট্‌কি বলে বড়্‌কি দিদি
ধান শুকালো না
আলোচালের ক্ষীর গো দিদি
অঙ্গে লাগে না।
বাড়ীর নামোয় পিড়িং শাগ
বেছে তুল শুষনি শাগ—
ছোট্‌কি বলে বড়কি ভাল রাঁধতে জানে
দাদা বেশী খায়।'

এখানে প্রসঙ্গ মনে করা যেতে পারে যে সৌরাষ্ট্রের ডাণ্ডিয়া রাসে'র সঙ্গে এই কাঠি নাচের কি অপূর্ব সাদৃশ। এই নৃত্যের বীরভাবের জন্য এবং শরীর গঠনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক বিধায় বাংলা ব্রতচারী আন্দোলনের হোতা গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তাঁর ব্রতচারী নৃত্যে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের সঙ্গে ই 'কাঠি নাচ'কে পুনর্গ্রহণ করেছেন।

এই ভাবে একে একে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নৃত্যের উদাহরণ এবং তাদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যময় লোকনৃত্যের পরিচয় নিতে পারি। কিন্তু স্থানাভাবের কারণে দুই ভিন্ন অভিপ্রায়ের দুটি নাচের বিবরণ দিয়ে আমাদের বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উপসংহার টানলাম।

আদিবাসী জীবন

ও

সংস্কৃতি

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোককথায় আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশের লোককথার উৎস বা আবির্ভাবের কথা বলতে গিয়ে সুপ্রসিদ্ধ লোককথাবিদ Rev Lalbihari Dey তাঁর Folktales of Bengal গ্রন্থে বলেছেন : I had myself. when a little boy, heard hundreds—it would be no exaggeration to say thousands—fairytales from the same old woman Sambhu's mother for she was no fictitious person ; she actually lived in the flesh and blood and bore that name ; অর্থাৎ লেখক বলেছেন যে তিনি যখন বালক তখন একথা বললে হয়ত অতিরঞ্জিত বলে মনে হবে যে, শম্ভুর মা আমাকে হাজার হাজার রূপকথা শুনিয়েছিলো। এ ছাড়াও তিনি তাঁর সংগ্রহের উৎস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

An old Brahmin told me two stories, and old barbar three ; and old servant of mine told me two ; and rest I heard from another old Brahmin অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে তাঁর গল্পগুলির উৎস ব্রাহ্মণ, এক নাপিত, কখনও বৃদ্ধ ভৃত্য। এবং উচ্চ বর্ণের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণই হোক তার নিম্ন বর্ণের ক্ষৌরকারেই হোক সকলেই লেখককে গল্প শুনিয়েছেন। সুতরাং এর থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে গল্পগুলি উচ্চনীচ সর্বস্তরের মানুষই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে বংশ পরম্পরাক্রমে পুত্র পৌত্রাদি থেকে ব্যক্ত করেছে।

এবার সাঁওতাল সমাজের গল্পের উৎস প্রসঙ্গে Mildred Archer-এর উক্তি উপস্থিত করা যেতে পারে :

From the circumstances in which Santal tales are told, it will be obvious that whatever other functions they serve,

their primary use is to provide entertainment in a manner that is Santal. [Man in India Vol XXIV p. 25] অর্থাৎ যে সমস্ত পরিবেশে সাঁওতাল গল্প বলা হয়ে থাকে, এটা নিঃসন্দেহ যে সেই গল্পগুলি যে প্রয়োজন সিদ্ধ করে থাকুক না কেন, তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দবর্ধন এবং অবসর বিনোদন এবং সেটি সম্পাদিত হয়েছে পুরোপুরি সাঁওতাল পদ্ধতিতেই। এ প্রসঙ্গে তাঁরও অভিমত :

Stories are told at night when the days work is finished ar young and old collect round a village teller Stories are reconnected when men and boys are grinding paddy crop on the threshing floors in winter or are watching Mahua trees, while in the hot weather a party often in collects round a varandah in the village street. Old women who are cooking food in his home amuse a crowd of children by telling them a tale. Cowherds tell each other stories when villagers are assembling for medding. On all these occasions there is time to be whiled away and the folktale is at once a diversion and a recreation. অর্থাৎ সমস্ত দিনের কাজের শেষে যখন তারা একত্রে সমবেত হয় তখন তাদের অন্তর্নিহিত গল্পের উৎস হঠাৎ বেরিয়ে আসে। গ্রামের যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, রাখাল, শস্য প্রহরাধীন যেই হোক না কেন, অন্য গ্রাম থেকে আহুত বরযাত্রী আসুক না কেন, তারা অবসর বিনোদন ও স্মৃতি পর্যালোচনা এবং আনন্দ উপভোগের জন্যই গল্প বলে এবং গল্পের অজস্র উৎস বেরিয়ে আসে।

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার আলোচ্য গ্রামগুলিতে দেখা গেছে সাঁওতাল, ডোম ও বাউরি ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাধিক্য। এছাড়াও লোধা, কোড়া, ভূমিজ শ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। এক কুইলাপালের নিকটবর্তী নুতনডি গ্রামে মহেশ্বর মুর্মুর মত সাঁওতাল উপজাতির লোক বেশী বাস করে, ঠিক তেমনি কুইলাপালের বাস করে ভোলানাথ কালিন্দী রসরাজ সহিস এর মত বাউরি শ্রেণীর নিম্ন-হিন্দু।

নৃ-বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে বাংলাদেশে ব্যগ্রক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, মাল-পাহাড়িয়া প্রভৃতির মধ্যে দৈহিক সাদৃশ্য আছে। তাই মহেশ্বর মুতুর কিংবা ভোলানাথ কালিন্দীকে যদি পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় তাহ'লে দৈহিক পার্থক্য খুব তফাৎ হবে না। এইসব শ্রেণীর মানুষের অর্থাৎ আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যে কেবল দৈহিক মিলই নয়—সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যটিও লক্ষ্য করবার মত। মহেশ্বর নতুর যেমন রাধাকৃষ্ণ ও রামায়ণ মহাভারতের কথা শুনে গেছে, তেমনি ভোলানাথ কালিন্দীর মনেও আদিম উপজাতির লোক বিশ্বাস এবং আচার আচরণের নানা কাহিনী অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। অপরদিকে তারা ছৌ-নাচের আসরে বসে তাদের নিজকৃত পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের রস গ্রহণ করেছে। সুতরাং এই অঞ্চলের রূপকথা ও উপকথায় উৎস ও অভিপ্রায় আবিষ্কার সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম অধিবাসীজনের গল্পের উৎস আবিষ্কার করতে হবে এবং তবেই পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোককথার উৎস ও অভিপ্রায় বুঝতে পারা যাবে।

শালবন তার কাঁকুরে মাটির এই শিলাময় প্রান্তরে পাহাড়ের আনাচে কানাচে, শাল আর মহুয়াবনের অঞ্চলের ভিতরে সুবর্ণরেখার ধারে ধারে কুটির বেঁধে বাস করে এইসব সরল প্রকৃতি বিশ্বাসী আদিম অধিবাসীদের দল। কুসংস্কার আর প্রহেলিকাপূর্ণ আদিম বিশ্বাসে পরিপূর্ণ তাদের মন। তাই পদে পদে তাদের জীবনে নিষেধাজ্ঞা। তাই একদিকে 'সর্দার' আর অন্যদিকে 'জানিন' এদের কাছে দেবতার তুল্য। কারণ তারা বিশ্বাস করে প্রকৃতিদত্ত অনেক ক্ষমতা এদের হাতে। নানারকম টোটেম এদের মধ্যে প্রচলিত। শবরের বংশধর বলে যারা পরিচিত তাদের মধ্যে শবরবিদ্যা বা ডাইনীতন্ত্র (witchcraft) প্রচলিত। এই সব আদিম প্রকৃতি বিশ্বাস এবং কুসংস্কার থেকেই এদের রচিত নানা গল্প কথা গড়ে উঠেছে এবং তার থেকেই আবির্ভূত হয়েছে এ অঞ্চলের যত রূপকথা আর উপকথা। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত লোকশ্রুতিবিদ ও ফোকলোর সংগ্রাহক P. G. Booding এর একটি সাঁওতাল লোককথা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

On Booding 85 there is a long and beautiful story of of how sabai grass first grew. Seven brothers killed their

sister for when she cut her finger and blood went into the curry, it tested so delicious that they decided to cut more of her. Six of the brothers ate her flesh but the seventh burried his share and from it grew a beautiful bamboo. A man came along, cut it and made a fiddle from it. *Suddenly a woman emerged from the fiddle.* He made her part of his family and one day her brother visited the house. She told them who she was and they were so ashemed of their crime that the eldest brother tampled on the ground and made a large hole. They all ran into it but before him last brother disappeared. The girl cought his hair and pulled it out. She spread it on the ground and it turned 'Sabai'.

উপরোক্ত গল্পটিতে একটি আদিম বিশ্বাস কিভাবে কাহিনীর মাধ্যমে রূপলাভ করেছে তার পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। সাবাই ঘাস এইসব অঞ্চলের উপজাতিদের একটি অর্থনৈতিক উপকরণ। এটি দড়ি, চাটাই ইত্যাদি বোনার কাজে ব্যবহৃত হয়। সেই সাবাই ঘাসের কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে তারই কাহিনী এটি। গল্পটি যে আদিম উপজাতির সৃষ্টি তার প্রমাণ ভ্রাতৃগণ কর্তৃক ভগিনীর মাংস ভক্ষণ। এইসব জাতি পূর্বে নরখাদক ছিল পরে কৃষিকার্য অনুধাবনের পরে নরখাদক আদিম উপজাতি কিভাবে কৃষিজীবী গ্রাম্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তারই ইঙ্গিত আছে গল্পটির মধ্যে। 'নরমাংস ভক্ষণ' আদিম অধিবাসীদের গল্পের একটি সুপরিচিত অভিপ্রায়। এই 'নরখাদক' অভিপ্রায়টি আমরা যখন বাঙালীর লোককথায় দেখতে পাই তখন এর উৎসের সন্ধান পেতে আমাদের বেশী বেগ পেতে হয় না। ১৯৬৬ সালে মেদিনীপুরের হাতীবাড়ী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একটি গল্পে উক্ত অভিপ্রায়টি লক্ষ্য করা গেছে। গল্পটি হলো পাঁচ ভাই আর একটি বোন। বোনের নাম চাঁপা। তার বাবা মারা গেল। মা রান্না করতে পারে না। চাঁপা রান্না করে। একটানে শাক কাটতে কাটতে একদিন চাঁপার আঙ্গুল কেটে গেল। রক্ত শাকে লেগে গেল। তাই ভাইদের খেয়ে খুব ভালো লাগলো, তারা ভাবলো চাঁপার রক্ত এত মিষ্টি

নিশ্চয়ই ওর মাংস আরও মিষ্টি হবে। এদিকে চাঁপার বয়স হয়েছে, মা বললেন মেয়ে এত বড় হলো বিয়ে দাও। পাঁচ ভাই মিলে চাঁপার বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ী নিয়ে চললো সঙ্গে নিল তীর ধনুক। চাঁপা জিজ্ঞাসা করল, তীর ধনুক নিয়ে করবে? ভাইরা বললো, পথে বন পড়বে তাই তীর ধনুক নিয়েছি। তারা পথ চলতে লাগল। পথে পাওয়া নিল একটা বড় ইঁদুর.। ভাইরা চাঁপাকে বললো চাঁপা জল খেয়ে আয়। চাঁপা যেই জলে নামলো ভাইরা তীর ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেললো। তারপর তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে খেয়ে ফেলল। ছোটভাই কিন্তু খেল না। ছোটভাই তার ভাগটা মাটিতে পুঁতে দিলো। সেখানে একটা পদ্মফুল ফুটলো। তারপর তারা বাড়ী ফিরলো।

এদিকে বৌ শ্বশুরবাড়ী যায় না। শ্বশুরবাড়ী থেকে তার ডাক এলো। চম্পার মা তো অবাক। বললেন, চাঁপা তো শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। শ্বশুর আর কি করবে? ফিরে এলো। যেতে যেতে সেই পুকুরের ধারে গিয়ে শ্বশুর উপস্থিত হলো, আর দেখলো—পুকুরের ধারে একটা গাছ, তাতে একটা ফুল ফুটে রয়েছে। আসলে সেটা চাঁপা। শ্বশুর সেই ফুলটা তুলতে গেছে, অমনি ফুলটা বলে উঠলো: 'শ্বশুর, পাতা ভেঙো না, ডাল ভেঙো না।' শ্বশুরের মনে সন্দেহ হলো, সে গিয়ে চাঁপার মাকে সব কথা বললো। মা ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন। ছোট ভাই সব কথা বলে দিলো। তখন চাঁপার শ্বশুর মন্ত্র পড়ে চার ভাইকে পাষাণ করে দিলো। তাই দেখে চাঁপা সেই গাছ থেকে নেমে এল ও আমার কথাটি ফুরোল।'

উপরোক্ত গল্পটির সঙ্গে Bodding-এর ৪5 নং এর গল্পটির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ গল্প দুটিতেই ছোট বোনের রান্নার সঙ্গে রক্ত খেয়ে তার মাংস খাবার সাধ জেগেছে ভাইদের। দ্বিতীয়তঃ উভয় গল্পেই ছোট ভাই বোনের মাংস খায়নি এবং পুঁতে রেখেছে। তফাৎ এই যে Bodding-এর গল্পে পুঁতে রাখা মাংস বাঁশ গাছ হয়েছে আর হাতিবাড়ীর গল্পে পদ্মফুল ফুটেছে। সুতরাং বলা চলে গল্পটির উৎস আদিম জনসমাজ থেকে, পরে তা কিছু কিছু রূপান্তরিত হয়ে গ্রাম্য সমাজে প্রচারিত হয়েছে। এর উৎস যে আদিম জনসমাজ তার আরও উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে

পারে। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ Verrier Elwin-এর Folk-Tales of Mohakoshal গল্পে উল্লেখ আছে :

The sister cooks her brothers food and accidentally allows some of her blood to fall upon it. They decide to kill her, but the youngest brother objects. They take her to his jungle and persude her to sleep on a machan. The six elder brothers shoot at her, but all miss and then call the youngest and force him on pain of death to shoot. He aims his arrow in the opposite direction but if flies straight into his sister's body, and she dies. The brothers then cut up and roast their sister's body, giving the youngest brother the entrails and legs. He takes them some distance away but cooks fish and crabs instead, burying the entrails and legs of his sister in the ground. Before long a bamboo stalk shoots up from the hole where the girl's leg were buried.

তাহলে দেখা যাচ্ছে সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে ভগিনীর নরমাংস ভক্ষণের যে অভিপ্রায়টি প্রচলিত সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছে মধ্যভারতের বীরহোড় উপজাতির মধ্যে। আবার এই নরমাংস ভক্ষণের অভিপ্রায়টি পাওয়া গেছে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার হাতিবাড়ী অঞ্চলে। ঝাড়গ্রাম জেলার শালের জঙ্গলে আদিবাসীদের বহুকালের বাস। সুতরাং এই আদিবাসী সমাজ-জীবন এসব গল্পের উৎস একথা সহজেই অনুমান করা চলে।

অলৌকিক জন্মকথা ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (Supernatural birth and Magic action) এ দুটি পশ্চিম সীমান্ত বাংলার রূপকথার সাধারণ অভিপ্রায়। এ দুটি অভিপ্রায়ের জন্মকথা আবিষ্কার করতে গেলেও সেই আদিম জনসমাজের কাছে আমাদের যেতে হবে। ঐন্দ্রজালিক উপায়ে পুত্র বা কন্যালাভ ঐন্দ্রজালিক উপায়ে জীবনরক্ষা, অলৌকিকভাবে জন্মলাভ— এ সবই যে আদিম বিশ্বাসের ফল তার একটি সার্থক উদাহরণ দেওয়া

যেতে পারে। সাঁওতাল পরগণার মাল্টো উপজাতির একটি লোককথার মধ্যে। (Malto Folk Tales; Man in India p. p. 220)

মাল্টো উপজাতির গল্পটির মধ্যে বাঙলা দেশের প্রচলিত বহু রূপকথার বিভিন্ন অভিপ্রায়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা বিক্রমপুর থেকে ১৩২০ সালে সংগৃহীত 'বেণুবতী' গল্পে (বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থখণ্ড, পৃ: ৬৩৫) দেখা যায় অনুরূপ অভিপ্রায়গুলিই প্রকাশ পেয়েছে। যথা: এককন্যার প্রতি নিষ্ঠুরতা, ভ্রাতৃবধুগণের দুষ্কার্য (misdced) এবং তার শাস্তি (misdced punished)। মাল্টো গল্পে যেমন পাতা ছিঁড়তে গেলে করম গাছ ছড়া কেটে গান গেয়ে উঠেছে, বেনুবতী গল্পেও তাই হয়েছে। ফুল তুলতে যাওয়া মাত্র বেনুবতী গেয়ে উঠেছে:

ছুঁয়ো ছুয়ো না মোরে আমি ঝুমকালতা
রাজকন্যা বেনুবতী সহি মর্মব্যথা
কাপড়ে লাগিল চুণ হৈল প্রাণনাশ
বিধিবাম হৈল তাই মোর সর্বনাশ॥

চতুর্থতঃ রূপান্তর (Transformation); মাটিতে প্রথিত মৃতের হাড় মাংস থেকে লতা বা ফুলের আবির্ভাব। এই অলৌকিকতা আদিম বিশ্বাসের ফল; Stith Thompson এই অভিপ্রায়টি সম্পর্কে বলেছেন: Reincarnation in plants (tree) growing on grove (E. 63)। পঞ্চমতঃ মৃতের পূর্ণজীবন লাভ উপরোক্ত দুটি গল্পেরই অন্যতম অভিপ্রায়। ষষ্ঠতঃ বাকশক্তি সম্পন্ন লতা বা পুষ্প (Talking bird or plant) মাল্টো লোককথা ও বাংলা দেশের রূপকথা উভয়েরই অভিপ্রায়।

এসব অভিপ্রায়ের উৎস ও আদিম বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ড: ভেরিয়র এলউইন মধ্য ভারতের আদিম উপজাতির পুরাকাহিনী (myth)-র মধ্যে বাকশক্তি সম্পন্ন গাছ ও ফুলের অভিপ্রায়টি লক্ষ্য করেছিলেন। কাহিনীটি তার ভাষায় এই: 'Mohadeo made a garden of Champa, Jasmine and Keonra flowers in Korbasera's enclosure. When his flowers blossomed they began to talk to each other; 'what lovely flowers we are,

yet no one comes to play with us or marry us and we have to live here ignored by men.' Then they said again, 'let us go and put our grievance before the person who is the Raja of flowers, to go to Mahadeo on their behalf.

পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ করে মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ, বাঁকুড়াও পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের রূপকথায় আদিবাসী জনসমাজের সংস্কার, বিশ্বাস যে বিশেভাবে জড়িত তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ অঞ্চলে সংগৃহীত আরও কয়েকটি গল্পের অভিপ্রায়ের মধ্যে। যথা, 'ট্যাবু' (Taboo) অর্থাৎ বিধিনিষেধ। এ সম্পর্কে অভিধানে বলা হয়েছে—A system of religious and social interdiction, and prohibition, the most famous and fundamental of the social institutions of Polynesia. ......Tabu sets apart a person, thing, place name (sometimes even the distinctive syllable of a name) or an action as untouchable, unmentionable, unsayable. [S. D. F. L. Page 1098.]

বাংলা দেশের রূপকথাতেও এই অভিপ্রায় সর্বত্র ব্যাপ্ত। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র নীলকমল — লালকমলকে বলে খোক্কসদিগের নিকট নীলকমলের নাম করতে নিষেধ করেছিল, এবং লালকমল সেটি অমান্য করায় বিপদে পড়েছিলো। 'ঠাকুরদার ঝুলি'র কাঞ্চনমালার কাহিনীতে ইন্দ্র মালকমালাকে একটি পাখা দিয়ে উল্টো বাতাস করতে নিষেধ করেছিলো এবং সেটি অমান্যের ফলে বিপর্যয় ঘটেছিলো। আদিম সমাজে এইসব বিধিনিষেধ (Tabu)-গুলি কেবল নিছক সংস্কার ছিল না বরং সক্রিয় ছিল। তাই পরবর্তীক্ষেত্রে এইসব বিধিনিষেধ কাহিনীর মধ্যে রূপলাভ করে নূতনতর কাহিনী সৃষ্টি করেছে। কোন উপজাতির মধ্যে একটি আদিম বিশ্বাস 'বসন্ত' রোগ হলে কয়েকটি জিনিষ আহার সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা (Tabu) কিভাবে গড়ে উঠেছে তার একটি কাহিনী উপস্থিত করা যেতে পারে :

'The coming of Diseases' : There were once seven sisters in heaven who were sent from there to the earth

to live among men. As they left Bhagawan, they asked him for boons, for they said, unless they had power of some kind no one would respect them nor would men worship them. It happened that each was granted a boon Khermai, called Bhagavati, chose the power of smallpox. If anyone should fail to please her, she will appear in that person in the form of smallpox. Or if not that, some other in the family will be with the pox, euphemistically called 'mata', 'mother'. She was given the power to remain infull control of their person for two and a half days, and during that time the sick person should be worshipped, for it really means the worshipping of Bhagavati, and so men must respect and honour her for her power. Further honour must be shown by the whole family in the avoidance of certain foods such as pulses and 'ghi'. No frying pan should be used, and the inmates of the house should not wear leather shoes". ['Folklore of the Kols', Man in India. Page 266]

উপরোক্ত গল্পটিতে প্রকাশ পেয়েছে ভয়ঙ্কর বীভৎস বসন্তের আবির্ভাব সম্পর্কিত কাহিনী এবং ঐ রোগ সংক্রান্ত নানা আহার্য বস্তু সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা (Tabu)। ঐ ভাবেই আদিম জনসমাজ থেকে এইসব নিষেধাজ্ঞাগুলির উদ্ভব হয়ে আজ লোককথায়, গ্রাম্য মানুষের আচার বিচারের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

এছাড়া বাংলার এ অঞ্চলের রূপকথার মধ্যে রূপান্তর (Transformation of soul), অলৌকিক জন্মকথা (Supernatural birth-motif), পশু-সন্তানের জন্মগুলি এ অঞ্চলের রূপকথাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে।

গড়গ্রামের এই হাতিবাড়ী অঞ্চলে এইসব আদিবাসী ও গ্রাম্য মানুষদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে অজস্র উপকথা। যেগুলির কথক

হচ্ছে এই শালের জঙ্গলে কুটির বেঁধে বসবাসকারী সাধারণ আদিবাসী ও গ্রাম্য মানুষের দল। সুবর্ণরেখার চর ধরে ধরে — বালুময় প্রান্তরের ধার ঘেঁসে ঘেঁসে অসংখ্য ছোট ছোট গ্রাম। সেইসব গ্রামের মানুষ অসংখ্য রূপকথা আর উপকথায় ভরিয়ে রেখেছে তাদের অন্তরগুলি, তাই সেখানে গল্প শুরু হয়েছে: এক গ্রামে এক তাঁতি ছিল। সে তার শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছিল। শ্বশুর বাড়ী যাওয়ায় শাশুড়ী তাকে খেতে দিল। তাকে যে সব খাবার দেওয়া হলো তাদের মধ্যে একটা ছিল বাঁশের তরকারী। কিন্তু, তাঁতি কিছুতে বুঝতে পারল না ওটা কিসের তরকারী। তখন সে বললো, এটা কিসের তরকারী বুঝতে পারছি না। তার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তাকে বলল, এটা বাঁশ কড়ার তরকারী, শুনে তাঁতী ভাবল, বাঁশকড়ার তরকারী তো বেশ ভাল খেতে, এবার দেশে ফেরার সময় বেশ কিছু নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে সে বাঁশকড়ার তরকারী তো আর চাইতে পারে না, এদিকে খাবারও ভীষণ ইচ্ছা রয়েছে। সাত পাঁচ ভেবে সে পরদিন রাত থাকতে শ্বশুর বাড়ীতে যে বাঁশের বেড়া ছিল সেটাকে নিযে তার বাড়ীর দিকে দৌড় দিল। রাস্তার লোকে তার হাতে বাঁশের বেড়া দেখে জিজ্ঞেস করল, হ্যা হে, এটা কি করছ? এটা দিয়ে কি করবে? তখন তাঁতি বলল, ওহে এটা দিয়ে তরকারী হবে গো। সে কথা শুনে রাস্তার লোক ত হেসে খুন। বলল, হ্যাঁ হে তরকারী তো বাঁশ-কড়ার হয়, তোমার হাতে তো কতকগুলা শুকনা বাঁশ। ও গুলো দিয়ে কি তরকারী হয়। একথা শুনে তাঁতি খুব বোকা বনে গেল। [১৯৬৬ সালে হাতিবাড়ী থেকে সংগৃহীত]

উপরোক্ত গল্পটিতে দুটি অভিপ্রায় (Motif) বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে ; ১। তাঁতির বোকামী, ২। জামাই-এর নির্বুদ্ধিতা। তাঁতির বোকামি ও জামাই-এর নির্বুদ্ধিতা বাংলাদেশের উপকথার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এইসব বৈশিষ্ট্যগুলির উৎস যে আদিম জনসমাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ জামাইয়ের সঙ্গে শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা—যেমন বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবনের একটি সাধারণ ঘটনা, তেমনি আদিবাসী সমাজেও। তাই সেখানে জামাই চরিত্র সর্বদা হাস্যরসাত্মক ভাবে উপস্থিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে P. O. Bodding-এর সংগৃহীত সাঁওতালী

উপকথার গল্পাংশ উপস্থিত করা যেতে পারে। যথা: In another story (Bodding 27) a son-in-law is eating a delicious curry of bamboo shoots and asks his mother-in-law what it is made of. She replies, 'Look what is behind you. That is what I have made the curry of'. The young man turns round and sees the bamboo door. When everyone is asleep he steals the door, returns home and tells his wife about the delicious curry made from a door. He insists on his wife making one with bits of the door and is surprised to find that the curry is uneatable. [The Folk-Tale in Santal Society. Man in India vol. XXIV. p. 235].

এইভাবেই আদিবাসী জনসমাজ ও গ্রাম্য সাধারণ মানুষের রঙ্গ-রসিকতায়, হাস্য-পরিহাসে বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্য প্রদর্শনে জমে উঠেছে উপকথার আসর।

বাংলার উপকথার শিয়ালের কাছে বৃহৎ ব্যাঘ্র চিরকাল পরাজয় স্বীকার করেছে, পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এই উপকথাটিতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। কেবলমাত্র দেখা গেল শিয়াল একাই যে চতুরতা নয়, তার স্ত্রী শিয়ালনীও এ বিষয়ে বেশ দক্ষ। কেবল বাংলা দেশের উপকথায় শিয়াল চরিত্রে নানা বৈশিষ্ট্য প্রচলিত — বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার আদিম উপজাতির মধ্যে। শিয়াল চরিত্র এইসব দেশে এত জনপ্রিয় যে, তাতে অনেক সময় বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের মন্ত্রণাদাতা বা ত্রাতারূপে উপস্থিত করা হয়েছে। নিগ্রোদের মধ্যে শিয়ালের পরামর্শ-ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রে বিচারকের। এই শিয়াল সম্পর্কেই বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে একটি তালিকা উপস্থিত করা যেতে পারে। In Asiatic folk-tale Jackal provides for the lion; he scares up game, which the lion kills, and eats and receives what is left as reward. In stories from northern India he is sometimes termed 'minister to the King', i.e., to the lion,

...In House Negro folk-tale Jackal plays the role of sagacious judge and is called 'O Learned one of the forest'. The Bushmen say that Jackal goes round behaving the way he does 'because he is Jackal'. Jackal is the beloved trickster of Hottentot folk-tale. [ibid. pp. 533]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে শিয়াল চরিত্রটি পৃথিবীর লোককথার একটি পরিচিত ধূর্ততম জীব। তার চতুরতা, বুদ্ধিমত্তা, ও বিচারশক্তি পৃথিবী বিখ্যাত। তবে পর্যালোচনায় দেখা গেল শিয়ালের ধূর্ততা ও চাতুরিই এ সম্পর্কিত বিশ্বাসের আদিমতম স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে Sten-konow-এর একটি উক্তি উপস্থিত করা যেতে পারে: "The Jackal is not throughout described and characterized in a uniform way. Usually he is a clever and dexterous animal, which is always prepared to assist those who have suffered wrong in asserting their right. In some tales, however, he acts in a different way. He is malicious and treacherous, but usually he is defeated in the end'. [Preface to P.O. Bodding Vol-1. Page IX].

শিয়াল চরিত্রের এই চাতুর্য ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বৈতরূপ সম্পর্কে, তাঁর বিশেষ মন্তব্য: The crafty and treacherous jackal would then represent the more original types. অর্থাৎ শিয়ালকে বিশ্বাসঘাতকরূপে উপস্থিত করাই তার আদিমতম পরিচয়। আর যদি তাই হয় তবে এ সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি: 'বাংলার পশ্চিম-সীমান্তের অধিবাসী সাঁওতাল উপজাতির নিকট হইতেই প্রধানতঃ বাঙালী তাহার শৃগাল-সম্পর্কিত উপকথাগুলি গ্রহণ করিয়াছে'। ['বাংলার লোক-সাহিত্য': ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯১]

P. O. Bodding-এর সাঁওতাল লোককথা সংগ্রহের আলোচনা প্রসঙ্গে Mildred Archer বলেছেন: Amongst the animals themselves, the smaller outwits fiercer. The goat defeats the bear, and the jackal the tiger. The jackal has a duel

personality for sometimes he is the villain of the piece and suffers, but often he is the weak intelligent little animal who out-wits the strong. [The Folk-Tale in Santal Society, Man in India. Vol. XXIV p. 231.]

পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সংগৃহীত শিয়াল সম্পর্কিত উপকথা দুটিতে উপরোক্ত মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী। দ্বিতীয় গল্পটি ক্ষুদ্র শিয়ালনীর কাছে বৃহৎ ব্যাঘ্র পরাজিত হয়েছে বুদ্ধিতে। আবার প্রথম গল্পটির মধ্যে দ্বৈত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথমতঃ সে অন্ধার মাকে প্রতারিত করে তার খাদ্য চুরি করে খেয়েছে এবং পরিবর্তে জল-কাদাভরে দিয়ে অন্ধ মাকে প্রতারিত করেছে। আবার অন্যদিকে প্রাণভয়ে অন্ধার বিবাহের ঘটকালি করতে গিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের এই ঝাড়গ্রামের শালবনে বহু আদিম অধিবাসীর বসবাস। শিয়াল সম্পর্কিত নানা ধারণা এদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে পরে আর্য ভাবাভাবী সমাজে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। ফলে এ অঞ্চলের শিয়াল চরিত্রে নানা বিজাতীয় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে এবং একথাও প্রমাণ করেছে শৃগাল চরিত্রের নানা বিপরীত আচার-আচরণ সমস্ত আদিবাসীদেরই দান।

আদিবাসী সাঁওতাল ইত্যাদি উপজাতিদের গল্পের যে পাঁচটি ভাগ করা হয়েছে তার প্রথম ভাগেই এই ধাঁধাঁ এবং রূপকাত্মক বাক্যালাপ-মূলক কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব গল্পগুলিতে ধাঁধাঁর মাধ্যমে কাহিনীর মধ্যে উত্তেজনাও আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়। কাহিনী পরিবেশনই এর একমাত্র রস নয়, লক্ষ্য গল্পের শ্রোতাদের মধ্যে গল্পটি পরিবেশন করে তার উত্তর জিজ্ঞাসার মধ্যে যে কৌতুক ও রহস্য সৃষ্টি করা হয় তার মধ্যেও এই সব কাহিনীর গুরুত্ব আছে। এ ধরনের ধাঁধাঁমূলক কাহিনী আদিম উপজাতিদের দান। বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে রেষারেষি; দলাদলি ও শক্তির তারতম্যের জন্যই এই রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও রহস্যময় উপকথার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় প্রতিপক্ষকে বুদ্ধির মার প্যাঁচে পরাস্ত করা। পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি স্থানেও এই আদিম উপকথার প্রভাব একান্তভাবে বিদ্যমান। একটি উপকথা

উদ্ধৃত করলে এর সার্থক প্রমাণ পাওয়া যাবে। গল্পটি এই : চারিটি লোক একসঙ্গে গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের বিপরীত দিক দিয়ে একটি লোক আসছিল, এই চারজনকে দেখে সে হাত জোড় করে নমস্কার করে চলে গেল। কিছুদূর যাবার পর ঝগড়া লেগে গেল। সবাই বলে তোকে নয়, আমাকে নমস্কার করেছে। কিছুতেই এর সমাধান হলো না দেখে সকলেই ঠিক করলো লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করা উচিত। লোকটিকে ডাকার পর সে বলল, আমি কাউকেই নমস্কার করিনি। অনেক অনুরোধের পর সে বলল, আপনাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বোকা, তাকে আমি নমস্কার করেছি। তখন চারজনার মধ্যে আবার ঝগড়া লেগে গেল। সবাই বলে আমি সবচেয়ে বোকা।

প্রথমজন বললে, আমিই সবচেয়ে বোকা। কারণ, আমি মামার বাড়ী যাচ্ছিলাম। বাবা আমাকে একটা ঘটি দিল ঘি আনবার জন্যে। পথে যেতে যেতে খুব খিদে পেল, গ্রামের একটা দোকান থেকে মুড়ি কিনলাম এক আনার। মুড়িগুলো ঘটির মধ্যে রেখে দিলাম, কিন্তু খাবার সময় ঘটি থেকে মুঠো ভরা হাত কিছুতেই তুলতে পারলাম না। সারাটা রাস্তায় না খেয়েই রইলাম। এবার বলুন আমার থেকে কেউ কি বেশি বোকা আছে? আমিই বেশি বোকা, অতএব আপনি আমাকেই নমস্কার করেছেন।

দ্বিতীয়জন বলল, আমি সবচেয়ে বেশি বোকা। কারণ, একদিন আমার স্ত্রী ধোপাকে ডেকে কাপড়গুলো ধুতে দিতে বলল। কিন্তু আমি ধোপাকে না ডেকে মাথায় কাপড়গুলো বেঁধে রজকের বাড়ীতে ফেলে দিয়ে এলাম; অতএব আমিই সবচেয়ে বোকা; আপনি আমাকেই নমস্কার করেছেন।

তৃতীয়জন বলল, আমি সবচেয়ে বোকা। কারণ, আমার দু'জন স্ত্রীকে একদিন দুপাশে নিয়ে শুয়ে আছি। হাত দুটো দুজনার কাছে আছে। এদিকে আমার চোখে পিঁপড়ে কামড়াতে আরম্ভ করল; কিন্তু কোন হাত দিয়েই তাড়াতে পারলাম না। কেননা যে হাতই তুলি না কেন আমার স্ত্রীরা রেগে যাবে। অতএব আমিই বোকা। আপনি আমাকেই নমস্কার করেছেন।

চতুর্থজন বলল আমি সবচেয়ে বোকা। কারণ, একদিন আমার স্ত্রীকে বৈঠকখানায় তামাক দিয়ে আসতে বললাম; কিন্তু স্ত্রী রাজি হলো না; কেননা, উঠানের জলে তার পায়ের আলতা ধুয়ে যাবে। তখন আমি হুঁকো শুদ্ধ আমার স্ত্রীকে কাঁধে করে নিয়ে গেলাম বৈঠকখানায়—অতএব আমি সবচাইতে বোকা। এখন প্রশ্ন হলো, কে সব চেয়ে বোকা? তার উত্তরে বলা হলো, প্রথম জনই সবচেয়ে বোকা।

এ ধরণের বোকামীর গল্প এবং ধাঁধাঁমূলক উপকথা ঝাড়গ্রাম অঞ্চল থেকে প্রচুর সংগৃহীত হয়েছে। বহু আদিম জাতির মধ্যে ধাঁধাঁ প্রচলন না থাকলেও ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণার ওঁরাও জাতির বিবাহ অনুষ্ঠানে খুব বেশী ধাঁধাঁর আনুষ্ঠানিক ব্যবহার থেকেই ধাঁধাঁমূলক কাহিনীর উৎপত্তি হয়েছে। পূর্বে এই উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে ধাঁধাঁমূলক কাহিনীও ভাষাগত রূপক সৃষ্টি সাঁওতাল লোককথার একটি প্রধানতম বিভাগ। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে বহু সাঁওতাল উপজাতি বাস করে। তারা গ্রাম্য গৃহস্থের চাষের কাজে, দিন মজুরীর কাজে, সর্বদা পাশাপাশি বাস করে। সুতরাং তাদের আদিম সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রাম্য সংস্কৃতির মিলন ও আদান-প্রদান খুব দ্রুত ও সহজসাধ্য হয়েছে। পাশাপাশি অবস্থান তাদের চিত্তের উপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে। প্রবন্ধের প্রথম অংশে জামাইয়ের বাঁশের তরকারী খাওয়ার গল্পের হুবহু সাদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করা হয়েছে এই ধরণের হাস্যরসাত্মক উপকথার আদিম বীজ আছে আদিবাসী সমাজ-মহলে—যার থেকে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে—তৈরী হয়েছে বহুবিচিত্র ধরণের উপকথা।

Supernatural birth motif বা অপ্রাকৃতিক জন্মলাভের অভিপ্রায় বাংলা দেশের লোককথার একটি সাধারণ অভিপ্রায়। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলায় দহমুণ্ডা গ্রাম থেকে ১৯৬৬ সালে সংগৃহীত একটি গল্পে একটি নেউলরূপী রাজপুত্র কিভাবে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলো তার একটি সুন্দর কাহিনী পাওয়া গেছে। সাতরাণীর মধ্যে ছোটরাণীর গর্ভে নেউল-সন্তান জন্মলাভ করল এবং সেই অবজ্ঞাত নেউল-সন্তান কিভাবে সমস্ত বিষয়ে দক্ষতা দেখিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল এই উপাখ্যানটি তারই একটি সার্থক উদাহরণ। গল্পে যদি মানুষ ও পশুর পাশাপাশি অবস্থান দেখা যায় বা তাদের আচার-আচরণের সাম্য পরিলক্ষিত

হয় তাহলে তাদের উপকথারই শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে। গল্পটি এই : এক যে ছিল রাজা। তার সাতরাণী, কিন্তু কারুরই কোন ছেলেপুলে ছিল না। একদিন রাজা বিদেশে গেলে সেখানে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হয়। রাজা বললেন আমার কোন ছেলেপিলে নেই; তখন ব্রাহ্মণ একটা আমগাছ দেখিয়ে বলল যে এক ঢিলে যদি আম গাছ থেকে সাতটা আম পড়ে এবং সেই আম যদি রাণীদের খাওয়ানো যায় তাহলে রাণীদের ছেলে হবে। রাজা ঢিল মেরে সাতটা আম পাড়লেন এবং সাতটা আম রাণীদের খেতে দিলেন। ছয়রাণী একটা করে আম খেল, কিন্তু ছোট রাণী মশলা বাটছিলো তাই আমটি রান্না ঘরে রেখেছিল। এমন সময় একটা নেউল এসে সেই আমের কিছু অংশ খেয়ে গেল। তারপর ছোটরাণী সেই আমটি খেল। কালে সাতরাণীই গর্ভবতী হলেন। ছয়রাণীর ছেলে হলো আর ছোটরাণীর গর্ভে হল একটা নেউল। নেউল দেখে ছোটরাণী খুব কাঁদতে থাকলে, তখন নেউল বললো, 'মা তুমি কিছু ভেবো না, আমি ছোট হলে কি হবে, আমি সব কাজ করতে পারি'। বার বছর পরে ছয়রাণীর ছয় ছেলে বললে 'আমরা মামাবাড়ী যাব'। তখন নেউল বলল, 'আমিও মামার বাড়ী যাব'। মাকে বলল, 'তুমি চিতই পিঠে করে দাও, আমি রাস্তায় খেতে খেতে যাব'। সাতরাণীর সাত ছেলে মিলে মামার বাড়ী গেল। নেউল রাস্তায় চিতই পিঠে খেতে খেতে বেনাগাছের নীচে দেড়টা পিঠে রেখে দিল। পথে যেতে যেতে একটা আমগাছ দেখতে পেলে, তাতে বেশ আম পেকে রয়েছে। ছয় ভাই আগে এসেছে আম গাছের নীচে আর নেউল ওদের পিছনে পিছনে এসে হাজির হয়েছে। ছ'ভাই বললে—'নেউল আমগাছে উঠে আম পেড়ে দে'। নেউল তখন তরতর করে গাছে উঠে গিয়ে পাকা পাকা আমগুলো নিজে খেল এবং কাঁচা কাঁচা আমগুলো সবাইকে নীচে ছুঁড়ে দিতে লাগলো। তখন সকলে বলল, 'নেউল ভাই, তুই পাকা পাকা আমগুলো খেলি আর আমাদের কাঁচা আমগুলো দিলি, ; দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি'। এই কথা বলে নেউলকে আমগাছের সঙ্গে বেঁধে ছ'ভাই চলে গেল। আবার পথে যেতে যেতে একটি জামগাছ পড়লো, তখন ছ'ভাই ভাবলো—যদি নেউল সঙ্গে থাকতো তাহ'লে জাম পেড়ে খাওয়াতো। এদিকে নেউল বাঁধন ছিঁড়ে জামগাছের কাছে গিয়ে হাজির হয়ে নিজে পাকা জামগুলি

খেল, আর কাঁচা জামগুলো নীচে ফেলে দিল। নেউলকে তারা আবার বেঁধে রেখে চলে গেল। পথে কলা বাগান পড়ল। নেউলও বাঁধন ছিঁড়ে ঐদিকে এসে হাজির। নেউল পাকা কলা খেল, কাঁচাগুলো নীচে ফেলে দিল। নেউল আবার বাঁধা পড়ল। তারপর ছ'ভাই মামার বাড়ীর পথে যাত্রা করলো। যেতে যেতে পথে পড়লো এক নদী। তখন তারা ভাবল যদি নেউল থাকতো তাহলে নৌকা এনে পার করে দিত। এমন সময় নেউল বাঁধন ছিঁড়ে দাদাদের পিছনে পিছনে নদীর কাছে এসে পড়ল এবং নৌকা এনে পার করে দিল। সকলে মামার বাড়ী পৌছুঁলো। সেখানে তারা সাতদিন রইল. ছ'দিনের দিন নেউলের দিদিমা বলল 'সবাই তো হাতী ঘোড়া নিয়ে যাবে, তুই কি নিয়ে যাবি'? নেউল বলল, 'আচ্ছা কাল বলব'। এমন সময় নেউল-এর মামা ছোট ছেলেটাকে নেউলের কাছে দিয়ে বললো, নদীর ধারে মলত্যাগ করিয়ে নিয়ে আসতে। নেউল ছেলেটাকে নদীর ধারে নিয়ে যেতে ভয় দেখালো, 'তুই যদি মলত্যাগ করিস ত প্রস্রাব করবিনা আর প্রস্রাব করলে মলত্যাগ করবি না'। ছেলেটা ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে এল। নেউল বাচ্ছাটাকে বলল, 'দিদিমা কোথায় টাকা সরিয়ে রেখেছে যদি তুই বলিস তাহলে আর ভয় দেখাবো না'। ছেলেটা বলল, 'আই তুলসী গাছের নীচে টাকাগুলো রেখেছে'। রাত্রি বেলা নেউল তুলসী গাছের নীচে টাকাগুলো তুলে ফুল পাতার সঙ্গে একটা বুড়ো ছাগলকে খাইয়ে দিল। পরের দিন সকালে যখন দিদিমা বলল, 'তুই কি নিবি'। নেউল বলল, 'আমি ঐ বুড়ো ছাগলটা নেবো'। নেউল সেই বুড়ো ছাগলটা নিয়েই রওনা হলো। বাড়ীর পথে বেনাগাছের নীচে রাখা দেড়খানা চিতই পিঠে ততক্ষণে সোনা হয়ে গেছে। সেই দেড়খানা চিতই পিঠে নিয়ে নেউল বাড়ীর পথে রওনা হলো। বাড়ীর কাছে এসে দূর থেকে নেউল মাকে চীৎকার করে বলল, 'মা দরজার সামনে একটা পাটা আর লাঠি এনে রাখ'। বাড়ীর সামনে নেউল ছাগলটাকে পাটার উপরে রেখে লাঠি দিয়ে মারতে লাগলো। আর ভাইগুলি সেই দেখে বলল, 'ছাগলটা আমাদের'। তখন নেউল, ছ'টাকায় ছাগলটা বিক্রী করে দিল। তখন তারা পাটায় রেখে ছাগলটাকে পিটতে কেবল একটা টাকা পড়ল মাত্র আর ছাগলটাও মারা গেল। ছ'ভাই জিজ্ঞেস করলে, সোনার চিতই পিঠে কি করে পেলি? নেউল

বলল, বেনাগাছের নীচ থেকে। তখন ছ'ভাই বেনাগাছের নীচে চিতই পিঠে রেখে এল এবং সাতদিন পরে যেয়ে দেখল পিঠে সোনা হয়নি। তখন ওরা সবাই মিলে নেউলের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। নেউল তখন তার মাকে কিছু ভাবতে বারণ করে ঘর পোড়া ছাই বস্তায় পুরে কৌশলে সোনার কারবারীদের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি করে নিল। ছ'ভাই জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় এত সোনা পেলি'। নেউল বলল ঘর-পোড়া ছাই থেকে। তখন ছ'ভাই নিজেদের ঘরে আগুন দিয়ে এবং সেই ছাই নিয়ে বিদেশে গেল। কিন্তু কেউই সে ছাই কিনল না। তখন সবাই ফিরে এসে নেউলকে বস্তায় বেঁধে নদীর জলে ফেলে দিল। এক রাখাল গরু চরাচ্ছিল সে এসে নেউলকে জল থেকে তুলে বাঁচালে। নেউল তখন বললে, 'আমাকে তুললে কেন? বেশত ছিলাম'। রাখাল সে কথা শুনে বলল, 'আমাকে ফেলে দাও ত। দেখি কেমন বেশ ছিলে'। নেউল তাই করল, এবং তার গরু গুলো নিয়ে ফিরে এল। তখন ছ'ভাই জিজ্ঞেস করল গরুগুলো কোথায় পেলি। নেউল সব কথা খুলে বলতে ছ'ভাই বলল, তাহলে আমাদের জলে ফেলে দে আমরাও গরু নিয়ে আসব। তারপর নেউল তাই করল এবং তাদের সমস্ত রাজত্ব নিয়ে ছয় মাকে বোঝাল, 'দাদারা আমাকে রাজত্ব করতে বলছে। ওরা কিছুদিন পরেই গরু নিয়ে আসবে'। এ কথা বলে নেউল সুখে রাজত্ব করতে লাগলো।

উপরোক্ত উপকথাটিতে একটি নেউল-পুত্রের বুদ্ধিমত্তা চাতুর্য বিকাশের যে পরিচয়টি উপস্থিত হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গল্পটির অভিপ্রায় বিচার প্রসঙ্গে দেখা যায়, প্রথমতঃ আম খেয়ে সাতরাণী পুত্রসন্তান লাভ করেছে। বন্ধ্যা রাণীরা আম্রফল ভক্ষণের ফলে সন্তানসম্ভবা হয়েছে। Stith Thompson-এর লোককথায় বিভাগ অনুযায়ী এটি magic remedies for barrenness (591·1) অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত। অলৌকিক উপায়ে পুত্রলাভ এবং সন্তান-সম্ভবা হওয়া একটি আদিম বিশ্বাস; যা পরবর্তীক্ষেত্রে লোকবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। বাংলা দেশে আজও বহু বন্ধ্যা নারী অলৌকিক উপায়ে সন্তান কামনা করে থাকে এবং এটি তাদের দৃঢ়বিশ্বাস অলৌকিক উপায়ে সন্তান লাভ সম্ভব। এই আদিমতম লোকবিশ্বাস যা আজও বৈজ্ঞানিক যুগের সমাজ-মানসে বিদ্যমান, বাংলা তথা পৃথিবীর লোক-

কথার মধ্যে—তার আদিমতম রূপটি লুক্কায়িত আছে। বর্তমান গল্পে ছোট-রাণীর আমটি নেউলে ভক্ষণ করে গিয়েছিলো বলে তার সন্তান নেউল-রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল।

দ্বিতীয়তঃ তাই বলা চলে animal child বা পশুসন্তান এই গল্পটির আর একটি অভিপ্রায়। মনুষ্য মাতার পশুসন্তানের জন্ম দান কেবল বাংলা দেশের লোক-কথায় নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোককথার একটি সাধারণ এবং সুপরিচিত অভিপ্রায়। অভিধানে তাই বলা হয়েছে: 'children in the form of animal's either real animals, transformed human beings, or mesquerading gods, born to human mothers: a concept found in the folk-lore, folk-tales and mythology of many peoples all over the world. Often the ideas are intimately connected. But the principal significance of the animal children theme is rather in the direction of etiology and tolemism'. [ibid. pp. 59]। বিকৃত বিকলাঙ্গ এবং বীভৎস সন্তান প্রসব থেকেই সাধারণতঃ এই বিষয়ক ধারণার উৎপত্তি। অনেক সময় টোটেম ও উপজাতিগত নানা বিশ্বাসও এই প্রসঙ্গের ধারণাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। নারীকর্তৃক পশুপক্ষী জন্ম অভিপ্রায়টির (women gives birth to animal) লোককথায় অনুপ্রবেশ একটি আদিমতম লৌকিক বিশ্বাসের ফল। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার দহমুণ্ডা গ্রাম থেকে সংগৃহীত এই গল্পটি সেই আদিম বিশ্বাসকে ধারণ করে রয়েছে।

তৃতীয়তঃ এইসব পশুসন্তান সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে জয়যুক্ত হয়েছে। এই অভিপ্রায়টি বলা চলে অক্ষম নায়কের বিজয় (success of unpromising hero L 160) গল্পটি নেউল সন্তান তার অন্যান্য ভাই ছয়জন মনুষ্য সন্তানকে নানাভাবে পরাস্ত করে বহু ধনরত্ন এবং সুখ সম্পদের অধিকারী হয়েছে। এরকম অক্ষমকে জয়যুক্ত করার পিছনে অক্ষমতার প্রতি সান্ত্বনা দেওয়ার মনস্তাত্বিক কারণ আছে।

ডাইনী বিদ্যা (witch craft), মন্ত্রশক্তি, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, ভূত-প্রেত, প্রেতাত্মার অলৌকিক কার্যাবলী, ওঝার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দৈব ও

অনৈসর্গিক বস্তুর প্রতি অহেতুক ভক্তি—এগুলি সমস্তই আদিম বিশ্বাসের (primitive belief) ফল। আদিম যুগে মানুষের নানা প্রাকৃতিক ও অনৈসর্গিক ক্রিয়া-কলাপ বিস্ময় ও ভীতির সৃষ্টি করত। অকারণ জলোচ্ছ্বাস, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত, ভূকম্পন, অন্ধকারের বিভীষিকা, ঝড়ের গর্জন ও বৃষ্টির জলধারা, এ সমস্ত কিছু আদিম মানুষের কাছে রহস্যময় ও ভীতিময় ছিল। মৃত্যুর পর মানুষের প্রেতাত্মা কোথায় যায়, দেহ ভস্মীভূত হলেও নিশ্চয়ই দুষ্ট মানুষের আত্মা কোথায় লুকিয়ে থাকে এবং সেই প্রেতাত্মা মানুষের অনিষ্ট করার চেষ্টা করে; এসমস্ত আভ্যন্তরীণ ভয়ই উপরোক্ত নানা অলৌকিক ভীতিকারী ধারণার সৃষ্টি করেছে।' আদিম জাতির মধ্যে এসব নিয়ে যে কত কথা উপকথার সৃষ্টি হয়েছে তার সীমা-পরিসীমা নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিষেধক হিসেবে আবির্ভাব হয়েছে ডাইনী, ওঝা, গুণিনের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, ডাকিনী বিদ্যা ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ ও তাদের নানা অলৌকিক ও অনৈসর্গিক কার্যাবলী। আদিম মানুষের কল্পনায় ক্রমশ: দেখা দিল প্রেতের রাজ্য (the land of dead), ভূত-দানা-দৈত্য (demon), রাক্ষস (ogre), প্রেতাত্মা (evil spirit) শয়তান (Satan), দানব (giant or monster) ইত্যাদি সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম ও পদবীধারী নানা অপ্রাকৃতিক জীব। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এ ধারণাও মনে এল যে ঐসব দৈত্য-দানো-ভূত-প্রেতের কাছে মানুষ অসহায়। সুতরাং আদিম মানুষের কল্পরাজ্যে এক বিভীষিকাময় অনাবিষ্কৃত জগৎ সৃষ্টি হলো। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার আদিবাসী-প্রধান অঞ্চলে গ্রাম্য মানুষের মধ্যেও এই আদিম বিকাশ ও সংস্কার সংক্রামিত হয়ে কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প কাহিনীর সৃষ্টি করেছে ঝাড়গ্রাম মহকুমার সন্নিহিত প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত দুটি লোককথা উপস্থিত করলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। প্রথম গল্পটি এই: সাত সদাগর ভাই আর এক বোন। সদাগরেরা বোনকে খুব ভালোবাসে। সাতভাই একদিন বাণিজ্যে গেল, যেতে যেতে পথে পড়লো এক ইন্দ্রপুরীর রাজ্য। ডাইনীরা সেখানে সুন্দরী মেয়ে সেজে থাকে। সুন্দরী মেয়েদের দেখে সাতভাই সাত কন্যাকে বিয়ে করে দেশে ফিরে গেল। বোন তো বৌদের বরণ করে ঘরে তুললো। এদিকে বৌরা বোনকে দেখতে পারে না। তাকে সারাদিন খাটায়। দেখে শুনে সাতভাই বোনের বিয়ে দিল খুব দূর

দেশে। বোন কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল। দিন যায়, মাস যায়, ভাইনীরা কাঁদে বোনের জন্যে; কিন্তু দেখতে যেতে পারে না। কারণ, দিনের বেলা ভাইনীবোরা তাদের মাছ করে রাখে। একদিন তারা ভাবলো আরতো বোনকে না দেখে থাকতে পারেনা। মাছের বেশ ধরেই যাই। নদী দিয়ে তারা যেতে লাগলো। বোন নাইতে এসেছে নদীর ঘাটে, এমন সময় দেখে সাতটা মাছ তার চারপাশে ঘুরছে। বোন মাছগুলোকে চুপড়ি করে তুলে নিয়ে এলো বাড়ীতে। যেই কাটতে যাবে অমনি মাছগুলো বলে উঠলো, 'কেটোনা বোন, আমরা তোমার ভাই।' বোনের মাছকাটা হলো না। সে সব কথা শুনলো। তারপর কাঁদতে কাঁদতে চুপড়ি শুদ্ধই মাছগুলোকে তুলে রাখলো।

এদিকে শাশুড়ীর খুব সন্দেহ হলো বৌ মাছ কাটলো না কেন? বৌ পরদিন ঘাটে গেছে অমনি সে মাছগুলোকে কেটে বেঁধে ফেললো। এদিকে বৌ ঘাট থেকে ফিরে এসে সব শুনে কাঁদতে লাগলো। তারপর যেখানে আঁশ ফেলা হয়েছে সেখানে ছুটে গেলো। গিয়ে দেখে সাতটা পদ্ম ফুটে আছে। বোন কাঁদতে লাগলো। এমন সময় এক সাধু সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো। সে এক হাঁড়ি মন্ত্র পড়া জল বোনটিকে দিয়ে বললো, এক নিঃশ্বাসে এই জল তুমি সাতটা ফুলের গায়ে যদি ছিটিয়ে দিতে পারো তাহলে তোমার ভাইরা আবার মানুষ হবে। বোন কিন্তু তা পারলো না। তখন সাতটা ফুল সাতটা বিরাট বিরাট কুমীর হয়ে নদীতে চলে গেলো তাই দেখে তাদের বোন খুব কাঁদতে লাগলো।

উপরোক্ত গল্পটির মূল অভিপ্রায়গুলি যথাক্রমে ১। Transformation বা রূপপরিবর্তন, ২। Magic বা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, ৩। Reincarnation in plant (tree) growing on grave (E 931) বা মৃত ব্যক্তির সমাধির উপর ফুল গাছের জন্ম। এগুলি ছাড়াও অন্য যে অভিপ্রায়টি এখানে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা হচ্ছে ডাইনীবিদ্যা (witch-craft) পূর্বেই বলা হয়েছে ডাইনী কিংবা ডাইনীতন্ত্রে বিশ্বাস—একটি আদিম সংস্কার মাত্র। পরবর্তী-যুগে যা সাধারণ গ্রাম্য মানুষের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। এইসব ডাইনী সম্পর্কে তাদের ধারণা, এরা নানা অলৌকিক বিদ্যার অধিকারী, এরা মৃত

ব্যক্তির জীবনদান করতে পারে, জীবিত ব্যক্তিকে মৃত করতে পারে, ইচ্ছামত মন্ত্রপূত জল প্রয়োগ করে যে কোন মানুষ ও জীবকে এরা যথাক্রমে জীবজন্তু ও অচেতন বস্তুতে রূপান্তরিত করতে পারে, এরা শূন্যমার্গে অবাধে বিচরণ করতে পারে, ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানোর সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারে, এরা মানুষের কাঁচা মাংস খায়, মানুষের রক্ত চুষে মানুষকে নির্জীব এবং পরিশেষে মৃতে পরিণত করে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'A person who practices sorcery, a sorcerer or sorceress; one having supernatural powers in natural world, especially to work evil, and usually applied to both men and women, but now generally restricted to women'. [ibid pp. 1179]। অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তি ডাইনী বিদ্যা বা ডাকিনী বিদ্যা আয়ত্ত করতো, যারা অপ্রাকৃত ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতো বিশেষ করে মানুষের অনিষ্ট করতো তাদেরই ডাকিনী বা ডান বলা হতো। এবং এই বিশ্বাস যে আদিম যুগ থেকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজও সমাজ জীবনে বর্তমানে তারও সমর্থন পাওয়া যায় যখন বলা হয়: Belief in witches exists in all lands, from earliest times to the present day. The wise women and medicine man of primitive societies, the learned pagan priestess, and the divinities of early religion became, through the influence of Christianity or the modification of folk tradition, the malignant, accursed witches and sorcerers of the Middle Ages and later folk belief. [ibid]। ডাইনীর বিশ্বাস পৃথিবীর সব দেশেই আদিমযুগ থেকে বর্তমান যুগে প্রবাহিত। জ্ঞানী, স্ত্রীলোক এবং আদিম সমাজের ঔষধ প্রদানকারী চিকিৎসক, জ্ঞানী সর্বজ্ঞ নারী পুরোহিত খৃষ্টীয় ধর্মের মধ্য দিয়ে অথবা লৌকিক ঐতিহ্যের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের এক অভিশাপরূপ এই ডাইনীদের আবির্ভাব হয়েছে এবং পরে তা লৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে স্থিতিলাভ করেছে।

আমাদের দেশের উপজাতিদের মধ্যে ডাইনীবিদ্যা কিরূপ প্রচলিত তার প্রমাণ পাওয়া যায় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি আলোচনা থেকে। তিনি বলেন: 'ওঁরাও জাতির ডাইনীগণ ব্যক্তি কিংবা সমাজের অনিষ্ট সাধন

করিবার উদ্দেশ্যে নানা গোপন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে চারিটির কথা স্বর্গত রায় উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন শান 'নালন' নামক ভৌতিক পুঁটলির ব্যবহার ; ঐন্দ্রজালিক বাণ বা মায়া বাণের প্রয়োগ, ঐন্দ্রজালিক উপায়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির 'কলিজা' (heart) উৎপাটন ; চোর দেওয়া, বা কালোবিড়ালের রূপে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহার পিছনে ছায়ার মতো লাগিয়া থাকা ইত্যাদি।' এ সম্পর্কে তাঁর আরও মন্তব্য : "পশ্চিম বাংলার অন্যতম উপজাতীয় প্রতিবেশী সাঁওতাল জাতির মধ্যেও ডাইনী বলাবিষয়ক প্রবল বিশ্বাস বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। একজন সাঁওতাল সর্দার জনৈক ইংরেজ অনুসন্ধান-কারীর নিকট আক্ষেপের সঙ্গে বলিয়াছে, ডাইনীরাই সাঁওতালের সকল দুঃখের মূল ; তাহাদের জন্যই আমরা পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা করি, যদি এ সংসারে ডাইনী না থাকিত তাহা হইলে আমরা কত সুখীই না হইতাম'।"

['লোক-শ্রুতি'; প্রথম সংকলন, July' 67 পৃষ্ঠা ৫২-৫৩]।

ওঁরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতীয় আদিম বিশ্বাস কিভাবে গ্রাম্য মানুষের লোকথায় সংক্রমিত হয়েছে তার সার্থক উদাহরণ পাওয়া যায় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত উক্ত গল্পটিতে।

ডাইনীরা যে কত রকম ছলাকলা, গুপ্তবিদ্যা, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও মন্ত্রশক্তির অধিকারী তার উদাহরণ পাওয়া যায় পৃথিবীর তাবৎ লোককথায়; কাহিনীতে ও লোক-বিশ্বাসে। উদাহরণ স্বরূপ একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে : 'World folk-lore almost universally reports them as having the following power : divination, invulnerability and superlative strength, transformation of self or others (Circe beauty and the beast, the six swans of Grimm), ability to fly, power to become invisible or cause other to become so, ability to import animation to intimate objects, to produce at will anything required, knowledge of drugs to produce love, fertility, death etc., and, invariably, power over others through charms and spells,' (Ibid. pp. 1179)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই সব ডাইনীদের এমন কোন ক্ষমতা নেই যার দ্বারা তারা অসম্ভবকে

সম্ভব করতে না পারে। এমন কি ডাইনী সম্পর্কে এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে তারা মানুষের রক্ত শোষণ করে তাকে প্রথমে নির্জীব এবং পরে মৃতে পরিণত করে। মনুষ্য রক্তশোষণকারী এক ডাইনীর সম্বন্ধে একটি গল্প পাওয়া গেছে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত ডোমজুড়ি নামক একটি গ্রাম থেকে। সেখানে দেখা যাবে কি ভাবে ডাইনি মা ছেলের দেহ থেকে রক্ত শোষণ করে নিচ্ছে এবং কাহিনীর শেষে দেখা যাবে মায়ের রক্ত শোষণের পর ছেলেটি মারা গেছে। গল্পটি এই: একটি বাড়ীতে একটি লোক, তার বৌ আর মা থাকতো। এই তিন জন ছাড়া একজন মজুর থাকতো। শাশুড়ী ও বৌ ছিল ডাইনী। একদিন বাড়ীতে পিঠা তৈরী হলো। সমস্ত পিঠাই সেই লোকটি আর মজুরটি খেয়ে ফেলেছে। বৌ কেবলই বলে কি খাব কি খাব; শাশুড়ীও বলে কি খাব। তখন ছেলেটার দেহ থেকে তার রক্ত শুষে খেয়ে নিল একটা খড় দিয়ে। এখন মজুরটা সবই দেখেছে। সে ভাবল যে এবার হয়ত তার দেহ থেকেও রক্ত শুষে নেবে। তাই ভয়ে সারা রাত্রি সে আর ঘুমোলো না।

সকাল হলো। লোকটি তার মজুরকে বললো তার সঙ্গে সে যাবে। মজুর বলল, তুমি গিয়ে কি করবে। তখন সেই লোকটি বলল যে তার গায়ে বড় ব্যথা হয়েছে, কিন্তু কেন হয়েছে তা সে বুঝতে পারছে না। মজুরটি তখন বলল যে তার একটা কথা আছে, বলতে কিন্তু সে ভীষণ ভয় পাচ্ছে। তার মনিব তাকে অভয় দিয়ে বলল যে তার যা বলবার আছে তা সে বলতে পারে, কোন ভয়ের কারণ নেই। তখন মজুরটি তাকে সব কথা খুলে বলল, এবং তার ঘরে আর থাকতে রাজী হলো না। একথা বলে সে চলে গেল, আর সেই লোকটিও মরে গেল। মজুরটির এর পর আর নাগাল পাওয়া গেল না। [ডোমজুড়ি গ্রাম থেকে ১৯৬৬ খৃ: সংগৃহীত]

উপরোক্ত লোক-কথাটি অতিসাধারণ ধরণের গল্প কথা হ'লেও পশ্চিম সীমান্ত বাংলার প্রান্তবর্তী গ্রাম থেকে প্রাপ্ত এই উপকথাটিতে ডাইনী বিশ্বাসের যে আদিম সংস্কারটি লুকিয়ে আছে তা এবং কিভাবে সমাজ জীবনে বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। তবে এই বিশ্বাসের আবির্ভাব যে আদিম সমাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রান্তিক উপজাতি : লোধা

ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক

ভারতবর্ষ এমনি একটি দেশ যে দেশে নানান মানবজাতি এবং তাদের সমাজ-সংস্কৃতির বিন্যাস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। যদি কেউ জাতির এই বৃহত্তর বিভিন্নতাকে এক তানে বাঁধতে চায় তখনই সে বিস্ময়ে আবিষ্ট হবে। এবং তখনই প্রমাণিত হবে: একের মধ্যে বহুর প্রকাশ। এবং তা' এদেশেই একমাত্র সম্ভব।

কিন্তু এর কারণ কি? প্রকৃতপক্ষে ভারতের এক এক স্থানে এক এক প্রকার জলবায়ু, পরিবেশ-পরিস্থিতি। জলবায়ু, পরিবেশ-পরিস্থিতির এই অসম সহঅবস্থানের দরুণ এদেশে বিচিত্র মানুষজন এবং ততোধিক তাদের বিচিত্র জীবনধারার চাকচিক্য। এটা প্রায়শঃই দেখা যায়, প্রকৃতি যেখানে অকৃপণ সেখানে কিছু মানুষ উন্নত জীবনধারা অতিবাহিত করছে, আর সেখানে প্রকৃতির ভার মুখ অথবা রূঢ়তা সেখানে মানুষের কান্নার-জলে-এক-হওয়া।

কালক্রমে এইভাবে কিছু মানুষ সমানে বঞ্চিত হয়, বৃহত্তর জীবনধারার ম্যারাথনে পিছিয়ে পড়ে, চিহ্নিত হয় সমাজের দুর্বল অংশ রূপে। এরকম পিছিয়ে-পড়া মানুষের সংখ্যা এদেশে এখন মোট জনসংখ্যার শতকরা একুশ ভাগ (১৯১৯ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী)। সুখের বিষয়, স্বাধীন সরকার পিছিয়ে-পড়া মানুষের জন্য আইন-কানুন করে দিয়েছেন যাতে তারা আর বঞ্চিত না হয়, তারা আর না পিছিয়ে পড়ে, যাতে হাত-ধরা হয়ে উঠতে পারে। সংবিধান এইসব মানুষদের 'তপশীল জাতি' এবং 'তপশীল উপজাতি' রূপে চিহ্নিত করেছেন। এটা ঠিক, সংবিধান কর্তৃক চিহ্নিত হওয়ার আগে এদের মধ্যে কিছু কিছু মানুষ 'পূর্বতন-অপরাধী-উপজাতি' হিসেবে সর্বসাধারণ্যে

পরিচিত ছিল। সবচেয়ে মজার কথা হলে, এইসব মানুষরা নামেই ছিল 'অপরাধী-উপজাতি'—এদের মধ্যে উচ্চবর্ণের এমন কি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষরাও কিন্তু যুক্ত ছিল। আসলে 'অপরাধী-উপজাতি' একটি আক্ষরিক শব্দ মাত্র যা ব্যবহৃত হতো শুধুমাত্র সেইসব মানুষদের ক্ষেত্রে যারা বংশ পরম্পরায় সমাজবিরোধী কাজ করতো। এটা তো ঠিক, অপরাধ প্রবণতা শিক্ষিত, অশিক্ষিত বা নিম্ন কিংবা উচ্চ অর্থনীতিপুষ্ট সমাজের গণ্ডী মানে না। তাই এদেশেও সমাজবিরোধীরাই 'অপরাধী উপজাতি' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

কিন্তু গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, কোন মানুষ বা কোন সম্প্রদায় হঠাৎ বা আয়াস করলেই সমাজবিরোধী হয়ে যায় না। যখন সে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনা, পারিপার্শ্বিক উন্নত জীবনধারার সাথে তালে তাল রাখতে পারে না, তখনই সে অপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে। প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের সন্তান, বাঁচার তাগিদ তাই প্রত্যেকের আছে। সুতরাং এটা আমাদের কখনোই উচিত হবে না, এইসব দুর্ভাগ্য-পীড়িত মানুষদের চিরস্থায়ী 'অপরাধী' সাজিয়ে রাখা।

॥ দুই ॥

'অপরাধী উপজাতি' আইনকানুনের পটভূমি: বৃটিশ রাজত্বকালে শোষকবর্গ এটা লক্ষ্য করেছিলো যে, অসামাজিক কার্য্যকলাপ বংশানুক্রমিক এবং তা' বেশ-কিছু গোষ্ঠী দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন আইনকানুনের নিয়ন্ত্রা Mr. T. V. Stephen সাহেব অসামাজিক কার্য্যকলাপের ওপর একটি 'বিল' প্রণয়ণ করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছে: "ভারতের সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল জাতিবিভাগ। এই অনুসারে একটি ছুতোর তার কাজ বংশ পরম্পরায় চালিয়ে যায়। এইদিকে দৃষ্টি দিলে 'পেশাদারী অপরাধী' শব্দের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থ্যাৎ, এটাই মনে হয় যে, উপজাতি মানুষেরা-যারা পূর্বপুরুষ সমাজবিরোধী ছিল — তারাই পরে সমাজে সমাজবিরোধী কাজ করে এবং অপরাধী বলে গণ্য হয়। এবং এটা চলতে থাকে বংশ পরম্পরায়। এসমস্ত অপরাধীদের কখনোই ভালো করা যায় না। কেননা; বংশোদ্ভূত কোন বদ্ চরিত্রই আদপে সৎ মূল্যায়নের যোগ্য নয়।"

দুঃখের বিষয়, এই ধারা শুধুমাত্র মিঃ ষ্টিফেন বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরই ছিল না, ছিল অনেক ভারতবাসীর মনে!

যা হোক, ব্রিটিশ ডঃ লম্ব্রোসো এই 'বংশজ অপরাধপ্রবণতা' সূত্র বেশ ভালোভাবেই মনে পোষণ করতেন। তবু তিনি তৎকালীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে অপরাধীদের বিষয়ে নানান ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছিল যে, বংশজ অপরাধপ্রবণতার কোন সত্যতা নেই। কেননা, তথাকথিত বংশ অপরাধীদের রক্ত-গ্রুপের সাথে অনেক রাজস্থানের উচ্চ বংশের মানুষের মিল ছিল। পূর্বতন অপরাধী লোধাদের ওপর আমার নিজস্ব পর্য্যবেক্ষণও প্রমাণ করে, তাদের অপরাধ-প্রবণতার জন্য তাদের বংশানুক্রমিক ব্যবহার দায়ী নয়। এর জন্য একমাত্র এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হল, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ পরিস্থিতির দ্রুত পট পরিবর্তন — যার সাথে তাদের স্পন্দিত হতে অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিলো।

যা হোক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই সত্যকে মেনে নেয়নি। তারা ১৮৭১ সালে অপরাধী উপজাতি আইন প্রণয়ণ করে এবং মাটির-ক্রোড়-লালিত এইসমস্ত মানুষদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার চালায়। ১৮৭৬ সালে এই আইন সারা ভারতে স্থানীয় সরকারের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে, আর পাঁচটা জায়গার মতো দক্ষিণবঙ্গে এর ঢেউ এসে পড়ে। পরপর দু'বার ১৮৯৭ এবং ১৯১১ সালে আইনের কিছু রদলবদল হয়। নোতুন আইনে সমস্তরকম অপরাধী এবং তাদের কার্য্যকলাপের আনুপূর্বিক বিবরণ নিবন্ধক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এতে অপরাধীদের হাতের ছাপ, ঘর-বাড়ীর পরিবর্তন এবং তাদের গতিবিধির নিশানা লিখিত হবে। এবং সেইমতো গোষ্ঠীকে সাজা দেওয়া হবে। ক্রমে আবার ১৯২৪ সালে আইনে পরিবর্তন এল। তাতে বলা হল, সবরকম অপরাধী নয়, শুধুমাত্র স্বভাবজ অপরাধীরাই এই আইনের প্রক্রিয়ার ভুক্ত হবে। কিন্তু পরে 'অপরাধীর ছেলে অপরাধী হবে' এই চিন্তাধারায় এল রেনেসাঁ, আইন গেল পাল্টে, শাসকবর্গ নোতুন আইন রচনায় ব্রতী হলেন।

॥ তিন ॥

আইনে নোতুন দিগন্ত: এইসময়ে অপরাধী উপজাতি সম্পর্কিত

আইনকানুনে বিভিন্ন ক্রমিক-পরিবর্তন এল। ১৯৩৭ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার 'অপরাধী উপজাতি সংস্থা' গঠন করলেন, এবং এর প্রধান নিযুক্ত হলেন V. N. Tiwari। এই ভদ্রলোকের অপরাধী উপজাতির সম্বন্ধে মতামত হল: "এরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের শিকার, এবং এতদিন এদের ভুলভাবে বিবেচনা করা হয়ে এসেছে। এরা পাপী নয়, এদের বাধ্য করা হয়েছে পাপী হতে।" এই সংস্থা শুধুমাত্র যে পূর্বতন আইনে পরিবর্তন সাধন করলেন তাই নয়, এই সমস্ত মানুষের সার্বিক উন্নয়নের দিকেও নজর দিলেন।

এর ফলে মাদ্রাজে (এখন তামিলনাড়ু) ১৯৪৭ এবং বোম্বেতে ১৯৪৯ সালে আইন সংশোধিত হল। ভারত সরকার প্রথম A. Ayyangar নেতৃত্বে এই সংক্রান্ত একটি 'সংস্থা' স্থাপন করলেন ১৯৪৯ সালে। এতে বলা হয়েছে: "স্বাধীন ভারতের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে ১৯২৪ সালের অপরাধী উপজাতি সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন আবশ্যক।" এই উদ্দেশ্যে সংস্থাসদস্যরা গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়ালেন অপরাধী উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়, আর প্রযত্নে সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেন। এবং সেই থেকে অপরাধী উপজাতিরা "অবহেলিত" রূপে পরিচিত হল। এর ফলে সারা ভারতে ১৫৩-র কিছু বেশী গোষ্ঠী সাবেকী আইনের জাঁতাকল থেকে মুক্তি পেল। এখানে একটি কথা সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাহ'ল, কোন কোন প্রদেশে কিছু গোষ্ঠী এখনো সমাজবিরোধী বলে পরিচিত আছে, কিন্তু আবার অন্যান্য প্রদেশে সেই একই গোষ্ঠী এই পরিচিতির বহির্ভূত। এইভাবে বেশ কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেছে, এবং তা' শুধু ভুল অধিক্ষেপণের ফলে!

যা হোক, যা বলতে চাইছিলাম, অপরাধী গোষ্ঠীর মানুষদের সাবেকী জীবিকা নানাপ্রকারের ছিল, যেমন, বনজঙ্গল থেকে খাদ্য-আহরণ, পশুপালন, তাঁতবুনন ইত্যাদি। কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই আরো ভালোভাবে বাঁচার জন্য সমাজের বিধিনিষেধ ভাঙলো — অসামাজিক কার্য্যকলাপে রত হল। এই ধরণের অনেক উদাহরণই দেওয়া যায়। যেমন, পাঞ্জাবের Mina, পশ্চিমবাংলার Lodha, উত্তরপ্রদেশের, পাঞ্জাবের, রাজস্থানের Somsis, ইত্যাদিরা ডাকাতি ছিনতাই করতো; Jadna প্রতারণা করতো; Gopala এবং Manggrudi গরু চুরি করতো; Chapperband ছিঁচকে চুরি করতো;

মাদ্রাজের Kaladi এবং অন্ধ্রপ্রদেশের Konda Dora ধান চুরি করতো; মহারাষ্ট্রের Bedar গোষ্ঠীর মেয়েরা পতিতাবৃত্তি করতো প্রভৃতি।

১৯৫৩ সালে অপরাধী উপজাতি আইন সংশোধনের পর, আমাদের কল্যাণকামী সরকার এইসমস্ত গোষ্ঠীর লোকেদের কল্যাণ এবং পুনর্বাসন করার জন্য সবল পদক্ষেপ ফেলেছেন। সরকারের এই প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত কারণ একটাই : যাতে অবহেলিত গোষ্ঠীর মানুষরা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করতে পারে, মানুষ হয়ে মানুষের মতো বাঁচতে পারে।

॥ চার ॥

শ্রেণীবিভাগ : যদি আমরা অবহেলিত উপজাতিদের অতীত ইতিহাস দেখি, তাহ'লে এটা প্রতীত হয় যে, এইসমস্ত অবহেলিত মানুষেরা কোন কালে বংশজ অপরাধী ছিল না। পরন্তু এরা আর পাঁচজনের মতো 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ে' বাস করতো। কিন্তু ক্রমশ: পরিবর্তিত পরিবেশই এদের অপরাধী করে তুললো। তাদের বাসস্থান, জীবিকা বা জীবনধারার উপর নির্ভর করে যদি আমরা শ্রেণীবিভাগ করি, তাহলে অপরাধী গোষ্ঠীর নিম্নোক্ত রকমফের দেখতে পাই :

(১) যাযাবর যারা অপরাধী হয়েছে,

(২) সৈনিক যারা চাকরী হারাবার পর অপরাধী হয়েছে,

(৩) গ্রামরক্ষক অপরাধী হয়েছে,

(৪) বন্যউপজাতি যারা কায়ক্লেশে জীবন নির্বাহ করে তারা অপরাধী হয়েছে,

(৫) সবহারানোর দল ভিক্ষুক অপরাধী হয়েছে,
এবং

(৬) কিছু কিছু দুঃখ-দারিদ্র পীড়িত উচ্চবর্ণজাতি অপরাধী হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ইতিহাস থেকে কিছু কিছু উদাহরণ দিতে পারি। যেমন, আলাউদ্দিন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬) যখন রাজস্থানের চিতোরের

বেশ কিছু অংশ দখল করে নিল, তখন সেখানকার বেশ কিছু আদিবাসী গৃহহারা হয়ে পড়েছিল। বাস্তুহারার দল শেষে তখন পথ না পেয়ে নানারকম সমাজবিরোধী কার্য্যে মেতে উঠেছিলো। আবার এমনও অনেক মানবগোষ্ঠী আছে যারা তাদের সাবেকী জীবিকা ছেড়ে সমাজবিরোধী হতে বাধ্য হয়েছিলো। অন্ধ্র প্রদেশের Banjara, এইভাবে অপরাধী হওয়া একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এদের বংশানুক্রমিক জীবন আবর্তের গতি সহজ সরল ছিল। কিন্তু পরিবহন ব্যবস্থার অগ্রগতিই এদের কাল হল, এরা ক্রমশ: অপরাধী হ'য়ে উঠলো। আবার, Ramoshis এবং Wagharis মারাঠা রেজিমের সময়ে দুর্গপাহারা দিত। কিন্তু পরে তাদের চাকরী চলে যাওয়ায় তারা দুষ্কৃতকারী রূপে দেখা দিল। সেইভাবে পশ্চিমবাংলার 'লোধা' রাও অরণ্যে নিরুপদ্রবে বসবাস করতো। কালক্রমে অরণ্য হল নগর, পট পরিবর্তন দ্রুত হল, দ্রুততার সংগে সংগতি রাখতে পারলো না তারা, অভাবে, দুঃখে পেটের জ্বালায় লুঠতরাজ, ছিনতাই, ডাকাতি আরম্ভ করে দিল।

।। পাঁচ ।।

স্বাধীন ভারত সরকারের পূর্বতন অপরাধী উপজাতিদের প্রতি দৃষ্টি :

অপরাধী উপজাতি আইনের সংশোধনের পর অনেক মানুষ স্বস্তি পেল। তাদের কাঁধে জগদ্দল পাষাণের মতো যে অপরাধ নামক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তা থেকে তারা মুক্তি পেল। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার এইসব সমস্যা-জর্জরিত, পিছিয়ে-পড়া, অবহেলিত মানুষদের জন্য একটি 'কমিশন' গঠন করলেন। এই কমিশনের বক্তব্য :

(১) অপরাধী উপজাতিদের অবহেলিত সম্প্রদায় বা বিমুক্ত জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত (বিমুক্ত জাতি অর্থাৎ অপরাধ-মুক্ত মানুষেরা যাদের ওপর অন্যায়ভাবে উৎপীড়ন করা হয়েছিল),

(২) এই সমস্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের তপশীল জাতি বা বা তপশীল উপজাতি এবং পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত,

(৩) এদের পুনর্বাসন এক একটি দল সৃষ্টি করে করা উচিত যাতে তারা সহজেই বৃহত্তর সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে যায়,

(৪) স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের যে 'একজাতি একজাতি একপ্রাণ' অনুভূতি — তা' বৃদ্ধির জন্য এদের যোগ্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা উচিত,

(৫) এদের জন্য সমস্তরকম সংস্কার মূলক কাজ গ্রহণ করা উচিত,

(৬) যৌথ এবং ব্যক্তিগত অপরাধ প্রবণতার পার্থক্য খুব ভালভাবে খতিয়ে দেখা উচিত,

(৭) এদের ছেলেমেয়েদের জন্য যোগ্য শিক্ষা এবং যোগ্য কাজ-এর সংস্থান করা উচিত,
এবং

(৮) এদের সর্বস্তরে উন্নতিসাধন বিশেষতঃ অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়া উচিত।

এটা ঠিক, সরকারের এই ধরনের নীতি গ্রহণের ফলে অবহেলিত মানুষরা তাদের মর্যাদা, গৌরব এবং আত্মসম্মান ফিরে পেল যা থেকে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী বঞ্চিত ছিল। কমিশনের সুপারিশ ক্রমে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি যৌথভাবে এদের সবল অর্থনীতি উন্নয়নে উদযোগী হলেন। এর ফলে তাদের জন্য গড়ে উঠলো চাষবাসের জমি-কেন্দ্রিক বাসস্থান, প্রাইমারী স্কুল, আশ্রম, গড়ে উঠলো ক্ষুদ্র হস্তশিল্প কারখানা। এইরকম পুনর্বাসন কাজের জন্য দিকে দিকে প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হল। অনেকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন, সরকারও বেশ কিছু সংস্থা নিয়োগ করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইসব পুনর্ব্বাসন কাজের যথাযথ মুল্যায়ন আজো হলো না। ফলে, ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন চিত্র! যা হোক, নিমজ্জমান মানুষরা যাতে ব্যক্তিমর্যাদায় আসীন হয়, যাতে তারা অতীত জীবন ভুলে গিয়ে সুস্থ জীবন-যাপন করতে পারে তার জন্য কমিশন সুনির্দ্দিষ্টভাবে সুপারিশ করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, এই সুপারিশ-ক্রমে ভারত সরকার এবং কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নানাভাবে

উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু এটা লক্ষ্যণীয় যে, এইসমস্ত পুনর্বাসন কাজ বাস্তবে পরিণত করতে গিয়ে দেখা গেল নানাধরণের মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে অবহেলিত মানুষদের মনে, তাদের পাড়াপড়শীদের মনে এমনকি এই কাজে নিযুক্ত সরকারী অফিসার এবং স্বেচ্ছাসেবীদের মনেও!

ছয়

লোধা: একটি ঘটনার বিবরণ: পশ্চিমবাংলার লোধারা পূর্বতন অপরাধী হিসেবে পরিচিত। আমি এক সমীক্ষা করে দেখতে পেয়েছি যে, মেদিনীপুরে সংখ্যায় যত অপরাধী আছে, তার এক তৃতীয়াংশ এই লোধারা। এটা ঠিক, অতীতে লোধারা এইসব অসামাজিক কাজকর্ম করতো না। এরা অরণ্যে বা অরণ্যের প্রান্তে প্রান্তে বসবাস করতো — সেখান থেকে শিকার করে, ফলপাকড় সংগ্রহ করে খাদ্য আহরণ করতো। আর যা অতিরিক্ত হতো, তা স্থানীয় হাটে বিক্রি করতো। এইভাবে মাটির কাছের মানুষরা বেঁচে-বর্তে থাকতো অত্যন্ত সাধাসিধেভাবে, কাককে উত্ত্যক্ত করার কথা স্বপ্নেও ভাবতো না। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বের শুরুতে যখন অরণ্য সরে যেতে থাকলো, লোধাদের স্বাধীন প্রাণোচ্ছল জীবন তরঙ্গে পড়লো বাধা, তারা সেই প্রথম উপলব্ধি করলো 'জীবন গদ্যময়।' কারণ এইভাবে দ্রুত পটপরিবর্তনের ফলে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ক্ষমতা রইলো না, তারা সরে এসে জেলার পূর্বপ্রান্তে জড় হল রুজি-রোজগারের আশায়। ইতিমধ্যে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলো, তারা পড়লো আর-এক সমস্যায়! সমস্যা-সঙ্কুল এইসব মানুষদের তখন সমাজবিরোধী কাজ করে বাঁচা ছাড়া গত্যন্তর রইলো না।

"নোতুন আবহাওয়ায় অর্থনৈতিক এবং পরিবেশের অকস্মাৎ পরিবর্তন তাদের বংশানুক্রমিক নিরুপদ্রব জীবনে গভীর ভাবে আঘাত হানলো। তারা নাচার হয়ে প্রথমে ব্যাক্তিকেন্দ্রিকভাবে চুরি ডাকাতি রাহাজানি শুরু করলো। পরে ক্রমশঃ এটা তাদের গোষ্ঠীর অন্যতম চরিত্রে রূপ নিল। দুঃখ-দারিদ্র, পাড়াপড়শীদের দুর্ব্যবহার ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতন প্রভৃতি কারণে অপরাধ-প্রবণতা তাদের সমাজে ভিত গেড়ে বসলো, এবং এই আবর্তেই তারা অসহায়ের

মতো গড্ডালিকার স্রোতে আবর্তিত হতে লাগলো" (ভৌমিক, ১৯৬৩)।

কিন্তু দিন গড়াবার সাথে সাথে লোধারা আর এক জটিল সমস্যার মুখোমুখি এসে পড়লো। তা হল:

(১) অর্থ নৈতিক এবং পরিবেশের অবস্থান্তর, এবং এর ফলে আত্মনির্ভরতায় নিঃস্বতা,

(২) যেহেতু তারা কোন বিশেষ কাজে পারদর্শী ছিল না, সেহেতু তারা বৃহত্তর অর্থ নৈতিক সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে পারলো না;

(৩) অপরাধপ্রবণতা তাদের মানসম্মান খুইয়ে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করলো,

(৪) উপর্যপরি পুলিশের অকথ্য নির্যাতন তাদের গোষ্ঠীর একতা ছিন্ন করে দিল,

(৫) অপরাধমূলক কাজের শাস্তিস্বরূপ দিনের পর দিন জেলহাজতে বাস তাদের একাকী এবং রূঢ় করে তুললো,

(৬) দুঃখ-দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন লোকে তাদের শোষণ করতে লাগলো। আর এর ফলে অনিচ্ছাকৃত নানান গর্হিত কাজ তাদের করতে হোত।

(৭) চুরি-করা দ্রব্যসামগ্রী তারা অল্পদামে বিক্রি করতে বাধ্য হতো। তারা প্রায়শঃই এর জন্য অপরাপর লোক কর্তৃক প্রতারিত হতো। ফলে, লোধারা এইসমস্ত লোকদের প্রতি ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলো,

(৮) অথচ দুঃখ এবং তজ্জনিত নিয় আশাবাদী এইসব মানুষরা ক্রমে কুঁড়ে

এবং স্থথ হয়ে পড়লো। ফলে প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তনের সাড়া জাগাতে অক্ষম হয়ে পড়লো।

(৯) পুলিশ এবং পাড়াপড়শীরা এদের ওপর অত্যাচার করতো, তাদের একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো, ফলে গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা হ্রাস পেল।

এবং

(১০) এই সব কারণসমষ্টি তাদের পরস্পর থেকে পৃথক করে ফেললো, তাদের ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুললো।

এইভাবে অবস্থার বিপাকে পড়ে অশিক্ষিত, ভূমিহীন, বিশেষ কাজে অপারদর্শী লোধারা দারিদ্র সীমার নীচে নেমে গেলো। স্বভাবত:ই পেটের জ্বালায় তারা সমাজবিরোধী কাজে মেতে উঠলো এরপর। এতে ইন্ধন জুগিয়েছিল তৎকালীন পুলিশ, সরকারের আইন এবং পাড়াপড়শীরা। কিন্তু স্বাধীনতার পর স্বাধীন দেশের সরকার এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন। তাঁরা কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে অনেক কল্যাণকর পরিকল্পনা নিলেন। আমাদের পশ্চিমবাংলাতেও লোধাদের জন্য এমনি-কিছু পরিকল্পনা আছে।

।। সাত ।।

প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া : পশ্চিমবাংলায়, সব মিলিয়ে, গত দু'বছরে লোধাদের জন্য পাঁচটি পুনর্বাসন কেন্দ্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে খোলা হয়েছে যেখানে কাজ পুরোদস্তুর আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রতিটি পরিকল্পনায় দু'শোটি পরিবার।

প্রথম থেকেই ধরা যাক। লোধারা বেশ কয়েক দশক ধরে অর্থনৈতিক কষ্টে লালিত এবং সেই সঙ্গে সমাজে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। এর দরুণ লোধা সমাজে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, লোধারা-তথাকথিত পড়শী যারা লোধাদের চোখে নিষ্ঠুর — তাদের প্রতি নির্মম হয়ে উঠেছে। এটা প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, তথাকথিত সুসভ্য পড়শীরা এদের সমাজবিরোধী কাজ-কর্মের জন্য ঘৃণা করতো, ভয় করতো, তাদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতো — যা এখনো, দুঃখের বিষয়, অনেকের মধ্যে লক্ষিত হয়। এই

ধরণের অমানবিক ঘটনায় "আর কিছুই হয় নি, যেটা হয়েছে তা বড় ভয়াবহ। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে, তাকে মর্যাদা দেয় না — এর চেয়ে অপমানকর ঘটনা আর কি হতে পারে? অপমানিত, বঞ্চিত লোধা মানুষগুলো এরপর ক্রমশঃ তাই মার-দাঙ্গায় মেতে উঠলো, ফলে অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সভ্যমানুষ কর্তৃক ধিকৃত হয়ে বাস্তহারা হয়ে পড়লো। তাই যখন পুনর্বাসন কেন্দ্র খোলা হল, তখন মেঘ না চাইতে জল পাওয়ার মতো তারা কাল্পনিক আনন্দে মেতে উঠলো। তারা ভাবল তাদের সুদিন ফিরে এসেছে, এবার বুঝি মাথার ওপর থেকে এক-মাথা-নক্ষত্রের আকাশ সরে গিয়ে খড়-কুটো জুটবে, দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জুটবে, আর ফিরে পাবে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু: সামাজিক স্বীকৃতি — মানুষের যথাযথ মূল্যায়ণ!

সরকারের পরিকল্পনা মতো প্রত্যেক লোধা পরিবারকে একহাজার পাঁচশো টাকা এককালীন মঞ্জুর করা হল যেটা অবশ্য ন্যূনতম বাঁচার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। এতে তৃষিত, বুক-ফাটা, খরা-জর্জর এলাকায় ফ্যাসন—দুরন্ত কালবৈশাখীর বৃষ্টি হওয়ার মতো লোধারা হতাশ হয়ে পড়লো। বস্তুতঃ এতদিনকার অভ্যাসবশতঃ লোধারা খানিক চঞ্চল, বেপরোয়া। তাই দিনের পর দিন একটানা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল কাটার আর ধৈর্য্য নেই তাদের। এমনকি গরু-মোষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুদের তদারকিও এখন তাদের ধাতে সয় না। পরন্তু দিনমজুর খাটতে তারা ভালোবাসে। তাই তারা তাদের জমিজমা, গরু-মোষ — যা সরকারের কৃপায় পেয়েছিল — তা বেচে দিতে লাগলো। ফলে এরকম অবস্থায় তারা প্রত্যক্ষ করলো বেকারত্বের প্রতিনিয়ত হাতছানি। সরকারের এই পরিকল্পনায় তারা দুঃখ দূর করার প্রকৃত পথ খুঁজে পেলো না। তাদের কাছে এই ব্যাপারটার সবটাই রাতের হাইওয়েতে ট্রাকের ডিস্ট্যাক্ট্ ল্যাম্পের মতো মিলিয়ে যেতে যেতে ঝাপ্সা হতে থাকলো!

তবু, বললে অত্যুক্তি হয় না, বেশ কিছু সমাজসেবী ব্যক্তিগত প্রভাব দ্বারা লোধাদের এই মানসিক অবস্থা ক্রিয়া-কলাপ- রোধে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু এতে উল্টে বিপত্তি হয়েছে। যারা এতোদিন লোধাদের পাপাচারলব্ধ বস্তুসামগ্রী গ্রহণ করে তাদের চুরি ডাকাতিতে প্ররোচিত করতো তারা হল ক্ষুব্ধ। তারা সব প্রতিবাদ জানালো এইসব

পুনর্বাসন কাজের। যখন আমি মেদিনীপুরের রহরপুর গ্রামে 'বিদিশাতে' এরকম একটি পুনর্বাসন কাজে হাত দিই, তখন আশেপাশের গ্রামের লোকদের কাছ থেকে আমাকে নানাভাবে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

আরেকটি ব্যাপারে আশে পাশের গ্রামের লোকেরা লোধাদের উপর ঈর্ষা পোষণ করতো। লোধারা সরকারী অনুদান পায়, আর তারা তার থেকে বঞ্চিত হয়। এর দরুণ তাদের মধ্যে একরকমের তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যদিচ সরবরাহ বস্তুসকল যেমন, চাষের জমি, বলদ, হাল, ছাগল মুরগী ইত্যাদি লোধারা আত্মসাৎ করে, তবু পড়শীরা আপাতদৃষ্টিতে মনে করে এইসব অনুদান তাদের বঞ্চনা করে লোধাদের দেওয়া হচ্ছে। এই মনে করার পেছনে তাদের যুক্তি হচ্ছে : লোধারা অনুদান পাবার পরও সেগুলি ধরে রাখতে পারে না। বাড়ী-জমি বেচে দেয় ছাগল-মুরগী খেয়ে নেয়। পরন্তু পূর্বের মতো অসামাজিক কাজ করে চলে। তবু তাদের উন্নতির জন্য নোতুন করে কলোনী গড়ে ওঠে, চাষের জমি লাঙল বলদ দেওয়া হয়। স্বভাবতঃই পড়শীরা সহজ ভাবে এটা মেনে নিল না। লোধারা যে কত অসহায় তা বুঝতে চাইলো না, পূর্বের মতো তাদের ঘৃণা, ঈর্ষা, ভয় করে দূরে ঠেলে রাখলো।

আসলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে, লোধাদেরও সেই অবস্থা হল। তারা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রইলো — বৃহত্তর সমাজের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক গণ্ডির বহু দূরে একাকী হয়ে রইলো।

এইভাবে পাড়াপড়শীদের অমানবিক ব্যবহার লোধাদের মনের গভীরে নিষ্ঠুর আঘাত হানলো। তারা মনে মনে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ, কথায় কথায় মিথ্যার আশ্রয় নিতে শুরু করলো — এক কথায় মনের অতলে এক জটিল আবর্তের সৃষ্টি হল। ফলে যখন কোন সরকারী কর্মী বা স্বেচ্ছাসেবী তাদের অসুবিধা জানতে মুখোমুখি হয়, তারা তাদের প্রকৃত অসুবিধার কথা না জানিয়ে শুধুমাত্র টাকা পয়সা বা অনুদানের অপ্রতুলতার কথা বলে। গ্রামের মানুষের সরলতার কথা ভেবে এইসব স্বেচ্ছাসেবীরা বিভ্রান্ত হয়। এতে কাজের হয় ক্ষতি, গতি হয় স্তব্ধ কিংবা বিপথগামী। মাঝখান থেকে লোধারা পুরোনো আবর্তে আবর্তিত হতে থাকে।

॥ আট ॥

উপসংহার : পশ্চিম বাংলার লোধাদের বা বৃহত্তরভাবে বললে, ভারতের অবহেলিত উপজাতিদের সমস্যা নিঃসন্দেহে ব্যবহারিক নৃতত্ত্বের কাছে শিক্ষার বস্তু। সারা বিশ্বে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন জাতের আদিবাসীরা পরিবেশ পরিস্থিতির এবং সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে সমস্যায় পড়ে যাচ্ছে। তাদের এই সমস্যা মূলতঃ, বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে অঙ্গীবদ্ধ হওয়ার। এই সমস্যার একটা সুরাহা করার জন্য আমাদের সেইসব গোষ্ঠির জীবনধারা এবং তার সাথে পরিবেশ পরিস্থিতির সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তর জানা প্রয়োজন। এতে আমাদের একটাই উপকার হবে, তা হল নোতুন পরিবেশে তাদের খাপ-খাওয়ানোর অসুবিধার কারণ নিরূপণে সুবিধা হওয়া। এই পুনর্বাসন কাজের দরুণ তাদের কি পরিবর্তন সাধন হল, তাও আমাদের যত্ন সহকারে নিরীক্ষণ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, এই নিরীক্ষণের ফলে ঠিক তখন, হ্যাঁ ঠিক তখনই বুঝতে পারবো যে কোথায় আমরা হোঁচট খাচ্ছি। এইখানে ব্যবহারিক নৃতত্ত্বের নীতির প্রয়োগ প্রয়োজন। এই কাজে কুসংস্কার — যা অজ্ঞ লোকেদের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শাসকবর্গদের আচ্ছন্ন করে রাখে — তা আমাদের ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে সমস্ত ঘটনাগুলিকে এমনভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্য্যালোচনা করতে হবে যা হবে শুধুইমাত্র মানবিক।

বর্তমান আলোচনা থেকে আমার একটা জিনিষ মনে হয়েছে যে, সমাজের অবহেলা, দুরে সরিয়ে রাখা — এসবই মানুষের মন এবং তার কর্মক্ষমতাকে বিনষ্ট করে দেয়, তাকে রূঢ় করে তোলে যা পরে মুক্ত করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। এই সমস্ত পুনর্বাসন কাজের জন্য আমাদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে পথ অন্বেষণ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে আমি এখানে তিন প্রকার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলতে চাই। তা হল : অবহেলিত মানুষের গোষ্ঠি, উন্নত মানুষের সম্প্রদায় এবং বৃহৎ রাজ্য। পুনর্বাসন কাজে এই তিন সম্পর্কের সুষ্ঠ মুল্যায়ণ আবশ্যক।

এটা ঠিক, নিমজ্জমান, অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো যাতে সভ্যতার সবুজ সূর্যের উদয় দেখতে পারে তার জন্য আমাদের মতো কল্যাণকামী এবং উন্নত মানের সমাজের রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা সক্রিয় হওয়া উচিত! নতুবা অপমানিত, ন্যায্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষগুলি উদ্ধত হয়ে উঠতে

পারে, সামাজিক পরিবেশ কলুষিত হতে তখন আর বেশী সময় লাগবে না। এইজন্য সরকারের উচিত এমন সুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাতে এই সমস্ত সমস্যা-জর্জর দুঃখী মানুষগুলি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারে। এই সঙ্গে এক মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের, এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠির দুরত্ব সংকোচন করা উচিত। কিন্তু এটা ঠিক অন্তবর্তী গোষ্ঠীর সমতা বৃদ্ধি করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের বৃহত্তর সমাজেরও এই ব্যাপারে সচেতন হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক উন্নতমানের সভ্য মানুষদের কুসংস্কার মুক্ত হয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলির পাশে এসে হাত-ধরা হয়ে দাঁড়ানো উচিত। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক নৃতাত্বিকদের ভবিষ্যতে একটি বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এবং সরকারের পক্ষেই একমাত্র তা' বাস্তবায়িত করা সম্ভব। বস্তুতঃ এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মুল্যায়ণ হবে তখনই যখন সরকার এবং ব্যবহারিক নৃতাত্বিকদের সমবেত পরিকল্পনা হাতে-কলমে রূপ নেবে।

আমরা ভুলে যাই কত শত বছরের অপমানিত মৃতপ্রায়, লাঞ্ছিত এই মানুষ-গুলোকে— যারা একদিন ভারতভূমিতে নোতুন সভ্যতার সোপান স্থাপন করে-ছিলো—যারা আমাদের প্রতিবেশী-অত্যন্ত আপনজন — সুদিনের বন্ধু, অসময়ের সহায়। প্রশাসনিক কর্তব্যহীনতায় এবং রাজনৈতিক বিষয়ের উচ্ছ্বাসে অনেক সময় এই মানুষের দলকে ঠিকমত বাঁচার সুযোগ দেওয়ার দায়িত্বকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। শুধু দয়া-দাক্ষিণ্য বা অনুকম্পা দিয়ে নয় সম্পূর্ণ প্রীতিপূর্ণ মানবিক সহৃদয়তার স্পর্শ দিয়ে তাদের জীবনে আশা ও আনন্দের আলো জ্বালিয়ে দিতে হবে—যা হবে তাদের জীবন সংগ্রামের দিশারী। প্রগতি কেবল ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে সার্থকতা লাভ করতে পারে না — এর ব্যাপ্তি সমষ্টি-তথা-সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করে। সুতরাং প্রত্যেক সভ্য মানুষের উচিত প্রতিবেশী দুর্বল জাতি উপজাতিকে, অসহায়, নিপীড়িত মানুষকে মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা— তার ন্যায্য প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার বুদ্ধিতে উদ্দীপ্ত করা, আর জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার অদম্য শক্তিতে শক্তিশালী করে তোলা। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে যে মানুষের দল নিজদেরকে ঠিকভাবে খাপ খাওয়াতে পারেনি, গণতান্ত্রিক কল্যাণকর এই রাষ্ট্রে তারা আর কতদিন নিষ্পেষিত থাকবে, কতদিন বা তাদের জীবন স্পন্দন স্তিমিত হয়ে থাকবে ? আজ চেতনার স্পর্শে, মানবিক জীবনাদর্শে

সমস্ত গোষ্ঠির মধ্যে জীবনবোধের গতিবেগ জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষের চেতনার রঙে আকাশ নীল, পান্না সবুজ, চুনী রাঙা হয়ে ওঠে। সুতরাং মানুষ সেখানে চেতনার যাদুমন্ত্রে মনুষ্যত্ববোধে উত্তীর্ণ হবে — এ বিশ্বাসে, এ মনোবলে আজ আমাদের প্রতিটি সুসভ্য দেশবাসীকে অটল, অনড় থাকতে হবে। **

মূল ইংরেজী থেকে ভাষান্তর : মানস রায়

কোল সংস্কৃতি

সুহৃদকুমার ভৌমিক

ভারতের প্রাচীনতম জাতি কোল নরগোষ্টির বর্তমান যে কয়টি শাখা উক্ত নামে আমাদের দেশে পরিচিত তারা প্রাচীন সুবিশাল কোল জাতির তুলনায় অতি সামান্য। এর অন্যতম কারণ আর কিছুই নয়, কোল জাতির বহু শাখা আর্যগণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছে, কোথাও কোথাও মিশ্রিত না হয়েই আর্য নাম প্রাপ্ত হয়েছে।

পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিজ্ঞান প্রণালীবদ্ধ আলোচনার জন্য এই গোষ্টির নাম দিয়েছিলেন Austro-asiatic. তাঁদের মতে এই গোষ্ঠীর মানুষ ভারতবর্ষে বহিরাগত এবং বিশাল Austric গোষ্টিরই একটি শাখা।

অষ্ট্রিক

- (ক) অষ্ট্রোএসিয়াটিক
  - (১) কোল (সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, কোড়া খাড়িয়া ইত্যাদি)
  - (২) মন্-খ্মের — মন্‌খমের, ইন্দো-চায়না স্রেইং
  - (৩) খাসিয়া
  - (৪) নিকোবরি — সাভাই, মালয়-পেনিনসুলা ইত্যাদি
- (খ) অষ্ট্রোনেশিয়ান্

(খ) অষ্ট্রোনেশিয়ান

- (১) ফিলিপিনো, মাইক্রোনেশিয়ান কেরোলিনিস্।
- (২) ইন্দোনেশিয়ান — মালাই
- (৩) মালনেশিয়ান ফিজি
- (৪) পোলিনেশিয়ান — সামআ, মাওরি হাউই, ইত্যাদি

ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের মতে Austric এই শব্দ মূলতঃ জাতি বিচারের পক্ষে কোন নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে না। এই শব্দের মৌলিক অর্থ দক্ষিণ-পূর্বী (South-East) এই অসুবিধা নৃতাত্ত্বিকগণ পূর্বেও অনুভব করেছিলেন। ফলে অনেকে Kolarian এই শব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু কোল বিষয়ক আলোচনার জন্য কোলারিয়ান শব্দ কেন ব্যবহার করা উচিত নয় এ নিয়ে ও সুনীতি কুমার যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন 'কোলারিয়ান' বলার সঙ্গে সঙ্গে 'কোলার' অঞ্চল বিষয়ক কিনা আলোচনা আসতে পারে, অথবা Kolarian শব্দ Kol ও Aryan শব্দের মিলিত রূপ কিনা প্রশ্ন হতে পারে। তাঁর মতে কোল শব্দ ভারতের এই প্রাচীনতম নরগোষ্ঠীকে বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট এবং বিশেষণের জন্য Kolian শব্দ। (১)

এই শব্দ ভারতীয় সাহিত্যেও বেশ পুরাতন। কোথাও কোথাও নিষাদ চণ্ডাল ইত্যাদি নামে ও পরিচিত। যে সমস্ত কোল আর্য-বিরোধী ছিলেন তাঁদের অনেকেই দস্যু, অসুর প্রভৃতি নামে পুরাণে বর্ণিত হয়েছেন। মহাভারতে বর্ণিত একলব্যকে সাঁওতালগণ তাঁদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করেন। এবং তাঁকে শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য সাঁওতালরা এখনও তীর চালনায়, বিবাহে সিন্দুর দানের সময় বুড়ো আঙুলের ব্যবহার করেন না। তবে কোল এই শব্দ যে কত প্রাচীন তা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই শব্দের অর্থে বলা হয়েছে তীবর কন্যার সন্তান। সম্ভবতঃ কোল্ল বা কোলাঃ শব্দ কোড়া শব্দেরই ভিন্নরূপ। কোড়া ভাষা আলোচনায় দেখা গেছে এটি সাঁওতালী ভাষারই একটি প্রাকৃত রূপ। (২) শুধু তাই নয় তাদের গোত্র বা পদবীর ইতিহাস জানলে স্পষ্ট বোঝা যায় তারা এক কালে সাঁওতালদেরই সমাজভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে হো গণের একটি শাখা 'কোল' নামে পরিচিত হয়েছিল। মূলতঃ কোড়াগণের সহিত সাঁওতালদের যে সম্পর্ক হো দের সঙ্গে মুণ্ডাদেরও সেই সম্পর্ক। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন হিন্দু-পল্লীতে যে সমস্ত 'কোড়া' পাড়া আছে, তাদের সন্ধানে গেলে স্থানীয় অধিবাসীরা কোলা বা কুলি পাড়া নামে অভিহিত করেন, যদিও তারা নিজেরা পরিচয় দেয় কোড়া

---

১. Dr. Suniti Kumar Chatterjee, The Study of the Kol, Calcutta Review, September 1923

২. কৌশিক পত্রিকা ; পূজা সংখ্যা, কোড়া-প্রবন্ধ (১৩৮০)

হিসাবে। নামালে কাজের জন্য আগত সাঁওতাল পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমিকরা যথাক্রমে কোড়াকুড়ি নামে খ্যাত। কোড়া শব্দের মৌলিক অর্থ ছোট (বা শিশু।) কোল গোষ্ঠীর মানুষরা যে নামেই পরিচিত হোক না কেন, কোনটাই তাদের নিজস্ব ভাষা বহন করে না। মুণ্ডারা নিজদিগকে হোড়ো, সাঁওতালরা হড়, এবং হো-রা হো নামে পরিচিত হতে পছন্দ করে ! এগুলির মৌলিক অর্থ হল মানুষ। এগুলি একই শব্দ জাত। যাই হোক এদের সামগ্রিক পরিচয় আমরা কোল শব্দের মধ্য দিয়েই পাব। এই গোষ্ঠীর মধ্যে পাব খাড়িয়া, ভূমিজ, শবর, কোড়া, হড়, হড়ো, হো ইত্যাদি। ভাষার দিক থেকে এরা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

অনেকের ধারণা, এই কোল সভ্যতা এককালে ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। ভারতের মাটিতে সভ্যতার আলো এদের দ্বারাই প্রথম প্রজ্জ্বলিত হয়। "কোল জাতি ভারতের কেবল আদিম অনার্য্য অধিবাসী নহে কিন্তু ইহারা সর্ব্বাদিম অধিবাসী। It is enough for us they are designated by the collective appellation of Kolarians derived from people of Kolh or Cole, whence the word Koolie (Primitive Folk, — by Elie Reclus, Contemporary Science Series — pp. 242) (৩)।

ভারতের বিভিন্ন স্থান-নাম এমন কি দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন কিছু নামেও কোলজাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে দ্রাবিড় অনুপ্রবেশের ফলে বিশাল দ্রাবিড় জাতির মধ্যে তাদের নানা দল বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু দ্রাবিড় সভ্যতাতেও কোল-প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান।

কোলগণের বসতির বিস্তার যত বিস্তৃতই হোক না কেন, পরবর্তীকালে ছোটনাগপুরকে কেন্দ্র করেই তারা তাদের সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে বেঁচে রইল। সম্ভবতঃ ছোটনাগপুর উপত্যকাই আদিমতম কোন নরগোষ্ঠীর বাসস্থান ছিল। এখনও বেলপাহাড়ী-বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রস্তপ্রস্তর যুগের অস্ত্রসমূহ পাওয়া যায়।

---

(৩) শীতল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আর্য্যেতর ও অনার্য্য জাতির ইতিহাসের রহস্য — পৃঃ ৩৭।

বিহার ও বাংলাদেশের বহু স্থান রয়েছে যার নাম পূর্ণভাবে কোল ভাষা গোষ্ঠী থেকে এসেছে। স্থান নামগুলি এই প্রমাণ করে যে সম্ভবত: এক সময়ে ঐ সমস্ত জায়গায় কোলজাতীয় লোকের প্রাধান্য ছিল। 'রাচি' শব্দ, 'রাচ্চা' থেকে এসেছে। এর মৌলিক অর্থ প্রাঙ্গণ বা আঙ্গিনা। সাঁওতালী, মুণ্ডা ও হো ভাষায় এই শব্দ সমার্থে ব্যবহৃত হয়। ঋক্‌বেদে বঙ্গ-শব্দের ব্যবহার দেখি না। সম্ভবতঃ কোলভাষা গোষ্ঠীর বোঙ্গাঃ শব্দ থেকে এর আবির্ভাব। বোঙ্গা শব্দের অর্থ হল — আত্মা, ঈশ্বর, দেবতা; অপদেবতা বা Evil Spirit হিসাবেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। রাঁচিকে কেন্দ্র করে বহু স্থান-নাম পূর্ণমাত্রায় কোল ভাষায়। (৪) বাঙলা দেশের বিখ্যাত স্থান-বাচক প্রত্যয়গুলি কোল ভাষাজাত। যেমন 'ড়া' প্রত্যয় দিয়ে। রিষড়া, রহড়া, বগুড়া, হাওড়া, মেচেড়া ইত্যাদি। 'ড়া' শব্দের মৌলিক অর্থ 'বাসস্থান'। এটি এসেছে অড়া শব্দ থেকে। অড়া শব্দের আসল মানে হল ঘর। কিন্তু বাঁকুড়া শব্দ ঠিক এ ভাবে আসে নি। এটি আলাদা দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত। সাঁওতালী ভাষাতে 'বাং' শব্দের অর্থ 'না' এবং কড়া শব্দের অর্থ ছোটো অর্থাৎ যা ছোটো নয় বা অসীম। বিখ্যাত রাজা বাঁকুড়া রায়ের নামের বিশেষ একটি অর্থ ছিল। এই রকম দাঃক্' প্রত্যয় দিয়ে। দাঃক্ শব্দের অর্থ হল জল। জলকে কেন্দ্র করে বাসস্থান গড়ে উঠে। বাংলায় দহ এবং সংস্কৃত উদক এই দাঃক্ থেকেই আবির্ভূত। শিয়ালদা, মালদা, বেলদা, খড়দা, শিলদা ইত্যাদি। এই রকম আরো কয়েকটি শব্দের উদাহরণ দেওয়া গেল। যেমন শোল অর্থাৎ মাঠ, ডিহি বা ডাহি অর্থাৎ মাঠ বা প্রান্তর, আড়া বা আড় অর্থাৎ বাঁধ বা আল, গুলি অর্থাৎ রাস্তা, বাড় গ্রাম, বাড়ি অর্থাৎ উঁচু ডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান-বাচক শব্দগুলি কোল শব্দ জাত।(৫)

বাঙালি জাতির উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "এক্ষণে এই বাঙ্গালী জাতি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল তাহা আমরা বুঝিয়াছি। প্রথম কোল বংশীয় অনার্য তারপর দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য তারপর আর্য এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।"(৬)

মূলতঃ বাঙালী শুধু মিশ্র জাতি নয়, এর বেশীর ভাগ রক্তই অনার্য; বিশেষতঃ কোল-জাতির সঙ্গে সংযুক্ত। "মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী হইতে নৃতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাঙালী একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি। এমন কি বাংলা দেশের ব্রাহ্মণের সহিত ভারতের অপর কোনো প্রদেশের ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বাংলার কায়স্থ, সদগোপ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ অনেক বেশী ঘনিষ্ট।" (৭) শুধু তাই নয়, পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রভৃতি খননের ফলে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে খৃষ্ট-পূর্ব দেড় হাজার বৎসর পূর্বে এদেশের লোকেরা সভ্য ছিল। সে যুগের লোকেরা "ধান্য চাষ করিত, নানা রকমের এবং নানা নক্সার চিত্র শোভিত মৃৎ-পাত্র ব্যবহার করিত, সম্বর, নীলগাই প্রভৃতি পশু শিকার ও শুকর প্রভৃতি পশু পালন করিত। ......বাংলার প্রাচীন অধিবাসীগণ পরবর্তীকালে নবাগত আর্যগণের সহিত এমন ঘনিষ্টভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে তাহাদের পৃথক সত্তা ও সভ্যতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন।" (৮) তবে তাদের রক্ত যে আমাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত বিরাজিত তাতে সন্দেহ নেই। সে যুগের সভ্যতম গোষ্ঠীই প্রথমতঃ আর্যদের সঙ্গে মিশে আর্য নামে পরিচিত হয় এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাহন হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে এক হিন্দুজাতির মধ্যে এত বিভিন্ন জাতের উৎসের মূলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আর্য-পূর্ব জাতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছে ও জাতিগত একটি পেশার অধিকারী হয়ে আর্থিক জীবনে নিশ্চিন্ত হয়েছে। (৯) জেলে, ডোম, চণ্ডাল, হাড়ি, দুলে বা বেহারা প্রভৃতি জাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোল-জাতির সম্পর্ক আছে। (১০)

ফলে বাঙালী সংস্কৃতিতে, বিশেষতঃ ভাষা, সাহিত্য, ছন্দ ও আচার আচরণে, বিবিধ সংস্কার ও ধর্মীয় চিন্তায়, দেবদেবীর রূপ, ধ্যান ধারণায় এমন কি দর্শনে ও কোলজাতির গভীর প্রভাব লক্ষিত হয়। কোল জাতির সরাসরি প্রভাবের কয়েকটি দিক এখানে সামান্য ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

ভাষা শুধু সংস্কৃতির বাহন নয়, একটি জাতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশের প্রধান উপায়। বাঙলা অন্যান্য প্রাকৃত-জাত ভাষা থেকে বিশিষ্ট হয়ে গেল এদেশের আর্য-পূর্ব জাতির ভাষার প্রভাবে। বাঙলা ভাষায় বহু জনপ্রিয় শব্দ আছে যা সহজে বা ঘুরে ফিরে কোল-উৎস থেকে এসেছে। এখানে দু' একটির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—আঁট অর্থাৎ বন্ধ করা' শিপলি আঁট মে-দরজাটি বন্ধ কর। কুড়া শব্দের অর্থ ছোটো বা 'ছেলে'। আঁটকুড়া শব্দের অর্থ যার ছেলে বন্ধ হয়ে গেছে। কিংবা যার কোনো সন্তান হয় না। (১১) কোড়া শব্দের অর্থ ছোটা বা ছেলে। কড়ে আঙ্গুল অর্থাৎ ছোটা আঙ্গুল। কুড়ে ঘর অর্থাৎ ছোটা ঘর, কুড়ি-জালি, অর্থাৎ ছোটা জাল। হোভাষাতে কোড়া ও কুড়ি শব্দ যথাক্রমে কোআ ও কুইতে পরিণত হয়েছে। (১২) এই হো জাতির যে শাখা-গুলি বাঙলায় থেকে যায় তাদের মাধ্যমে 'কোআ শব্দ বাঙলায় প্রবেশ করে। যেমন লেবুর কোআ, কাঁঠালের কোআ। পরবর্তীকালে মহাপ্রাণিত (aspirated) হয়ে পরিণত হয় 'খোআ'তে, যেমন ইঁটের খেঁাআ। সেই খোআ-খুই পরে ভদ্ররূপ পায় খোকা-খুকিতে। হোভাষা মুণ্ডারি ভাষা-গোষ্ঠীর প্রাকৃত স্বরূপ। বহু সাঁওতালী শব্দ হো কিংবা কোড়া ভাষার মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে বাঙলায় প্রবেশ করেছে। (১৩) বাংলা ভাষায় প্রচলিত বহু শব্দ কোল-ভাষা গোষ্ঠীর। কৃষির যন্ত্রপাতিগুলির নাম কোল ভাষা থেকেই এসেছে। বহু ক্রিয়া যেমন—দাঁড়ানো, দৌড়ানো, বুলা (ঘুরে বেড়ানো) এড়া (ত্যাগ করা—এড়ানো) হেলা (অবহেলা) বান্ (না) যেমন 'বান্চাল', মানা, ছেঁচা, ঢিলে-ঢালা, গুড়া, ইত্যাদি শব্দ কোল ভাষা থেকে এসেছে। গণ্ডা, ঝিঙা, টোট্কা, বিড়া, ঢোঁড়া, কয়লা, লোর, ঠাকুর, কুড়ি (২০) প্রভৃতি কোল-শব্দ। বাঙলা ভাষায় কোল শব্দের অভাব নেই। বাঙলায় গণনা পদ্ধতিই কোল-রীতি অনুসারে।

কোলদের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষিত হয় বাঙলা-ছন্দে। কারণ ছন্দ নির্ভর করে লিখিত শব্দের উপর নয়, উচ্চারণের উপর। বাঙালীর উচ্চারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পাশাপাশি উড়িয়া, অসমিয়া, বা বিহারী উচ্চারণ থেকে

বাঙালী উচ্চারণ স্বতন্ত্র ও পৃথক। একই সংস্কৃত শব্দ হিন্দীতে যে ভাবে উচ্চরিত হয়, বাঙলাতে সে ভাবে হয় না। কিন্তু চর্যাপদের যুগে বাঙলা যখন প্রাকৃত থেকে রূপ লাভ করছিল তখন কবিদের সামনে প্রাকৃত ছন্দ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ ছিল না। ফলে চর্যাপদে পাদাকুলক ছন্দকেই (দোহা ও মরহট্টাতে দশটি পদ) সর্বাধিক অনুকরণ করা হয়। কিন্তু প্রাকৃত উচ্চারণ বাঙালীর দ্বারা কোনো দিন সম্ভব ছিল না। ফলে বাঙালীর কাছে এই ছন্দ যথেষ্ট পরিমাণ কৃত্রিম ছিল। দু' একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

কা আ তরুবর। পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীঅ ॥ পইঠো কাল ॥ —চর্যা-১

এখানে এর প্রতিটি শব্দ যে ভাবে উচ্চারিত হয়ে মাত্রা পেয়েছে, বাঙালীর মুখে সাধারণতঃ সে ভাবে উচ্চারিত হয় না। ফলে বহু বাঙালী কবি এই ছন্দকে (এর পারিভাষিক নাম কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত, moric metre) আদর্শ রাখতে গিয়ে বাঙলা ভাষাতেই পদ রচনা বন্ধ করে বিদ্যাপতির অনুকরণে কৃত্রিম কাব্য ভাষা ব্রজবুলিতে পদ-রচনায় মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু চর্যাপদের বহুস্থানে দেখা যায়, কিছু কিছু শব্দ কৃত্রিম প্রাকৃত উচ্চারণ হারিয়ে খাঁটি বাঙলা উচ্চারণ পেয়েছে এবং সেই অনুসারে মাত্রা পেয়েছে। এর ফলে দেখা গেল ১৬ মাত্রার (৮+৮) পাদাকুলক সংকুচিত হয়ে (৮+৬) ১৪ মাত্রার পয়ারে রূপান্তরিত হল। যেমন—

জে জে আইলা। তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্ন। বিমন ভইলা ॥ —চর্যা ৭

এই হল বাঙলার মিশ্র ছন্দ বা Composite metre। সংস্কৃত আদর্শকে সামনে রেখে বাঙলা উচ্চারণের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে বাঙালী কবিরা এই ছন্দ সৃষ্টি করেছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস হলেন এই আদর্শের প্রাচীনতম কবি। এ বিষয়ে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'পয়ারের উৎস সন্ধান' এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের ছন্দ প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন : এই মিশ্র-ছন্দ (composite metre) সমগ্র মধ্যযুগ পেরিয়ে একেবারে আধুনিক কবি বুদ্ধদেব জীবনানন্দ পর্যন্ত বাঙলা কাব্যের মুখ্য বাহন হয়ে চলে এসেছে। এই ছন্দের জনপ্রিয়তার পশ্চাতের কারণ আর কিছুই নয়, প্রাকৃত ছন্দের

কাঠামোকে সামনে রেখে বাঙলার লৌকিক উচ্চারণ অনুসারে এতে মাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। বাঙলার নিজস্ব উচ্চারণ অনুসারে স্বাভাবিক ছন্দ হল ছড়ার ছন্দ। এরই পারিভাষিক নাম দলবৃত্ত বা Syllabic metre বাঙলার এই লৌকিক ছন্দটির জন্য বাঙালীর গৌরব। সাধারণ বাঙালীর হাসি-কান্না, সুখ দুঃখ বেদনার প্রকাশ এই ছন্দের মধ্য দিয়ে। লোকসাহিত্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ছেলে ভুলানো ছড়ায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন; যাই হোক, এই ছন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের হাতে সামান্য বিকশিত হবার পর পূর্ণভাবে বিকশিত হল বিজয় গুপ্তের কাব্যে। যেমন—

হাসি বলেন চণ্ডী আই
তোমার মুখে লজ্জা নাই
কিবা লজ্জা আছে তোমার ঘরে।

তারপর নারায়ণদেব, লোচনদাস, তাঁর কড়চা বা ধামালীতে (ধামালী শব্দটি এসেছে 'ধীমাল' শব্দ থেকে, ধামাল<দামাল অর্থাৎ দুরন্ত বা প্রাণপূর্ণ কোল-শব্দ দামীল শব্দ প্রায় সমার্থ বাচক) এই ছন্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু তথাকথিত পণ্ডিত সমাজে এর স্থান ছিল সঙ্কোচের সঙ্গে। রামপ্রসাদই প্রথম প্রসাদী সঙ্গীত রচনা করে এই অবহেলিত ছন্দকে বাঙালীর হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই ছন্দের লালিত্য ও শক্তির কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়। যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।" (ভারতী, শ্রাবণ, ১২৯০)

বাঙলার এই লৌকিক ছন্দ বা দলবৃত্ত ছন্দের উৎস কোথায়, ছন্দ-স্পন্দের কোন্ কেন্দ্র-শক্তি গ্রাম-বধু থেকে কৃষককে এই ছন্দের দোলায় ছড়া, বাউল, টুসু ভাটিয়ালী গান রচনায় প্রবুদ্ধ করেছে এবং কোন্ মোহিনী শক্তির বলে বাঙলার শিশুরা এই ছন্দে গান শুনতে শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আমাদের অনুসন্ধান আবশ্যক। এই শক্তির উৎস সংস্কৃত উচ্চারণ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিজড়িত তথাকথিত আর্য-সমাজের সঙ্গে যুক্ত নয়, এটি বাঙলার নিজস্ব উচ্চারণ বা বাক রীতি এবং আর্য-পূর্ব বাঙালীর সঙ্গে যুক্ত।

Syllabic রীতি বৈদিক ছন্দে দেখা যায়, বিখ্যাত অনুষ্টুপ ছন্দ syllable এর উপরই স্থাপিত। কিন্তু বাঙলার syllabic ছন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন আস্বাদ বহন

করে আনে। এর প্রতিটি পূর্ণপর্ব চারমাত্রার ; মুক্তদল (open syllable) এবং রুদ্ধদল (closed syllable) উভয়ইকেই একমাত্রা করে ধরা হয়। যেমন—

আলতামুড়ি । গাছের গুঁড়ি ॥ জোড় পুতুলের । বিয়ে ।
এত টাকা । নিলে বাবা ॥ দূরে দিলে । বিয়ে ॥
এখন কেন । কাঁদছ বাবা ॥ গামছা মুড়ি । দিয়ে । —ইত্যাদি

এই জাতীয় ছড়া বা লোক সঙ্গীতের সঙ্গে সাঁওতালী ছড়া, প্রবাদ ও গানের বিশেষ সম্পর্ক আছে। দু-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

ক, তিহিঞ পেড়া । তাহেন্ মেসে ॥ তিহিঞ তোয়া । দাকা ।
গাপা পেড়া । তাহেন মেসে ॥ গাপা জে-ল । দাকা ॥
দিন্ গে পেড়া । তাহেন মেসে ॥ দিনগে হাসে । উতু ॥

(সম্ভবতঃ নারীর উক্তি ; "হে আমার অতিথি, কুটুম, তুমি যদি আজ আমার বাড়ীতে থাক তবে শুধু দুধ ভাত খাওয়াব। যদি কাল থাক তবে মাংস রান্না করে খাওয়াব, আর যদি চিরকাল আমার বাড়ীতে থাক তবে প্রতিদিনই তোমাকে ঝোলভাত রান্না করে খাওয়াব)

খ, বুরু চেতান্ । হয়দ জুরি ॥ হালায় হালায়
গাড়ায়েণাঃ । দাঃ দ কা কি ॥ লেগেম্ লেগেম্
বেরেল সাসাং । হড়ম বাঙ্গালী ॥ বর্ণ
ইঞ রেগে । জুরি হয় দ ॥ বাজাঃ ক'

পোহাড়ের ওপর ঝির ঝির করে কী সুন্দর হাওয়া বইছে। আর ঝর্ণাতে খালের মতো ধীরে ধীরে জলের স্রোত বয়ে চলেছে। গায়ে হলুদ মাখলে শরীরটা কী সুন্দর ফর্সা বাঙালীদের গায়ের রঙের মতো হয়ে যায়। আহা ! আমার গায়ে যে সেই বাতাসই লেগেছে !)

গ, সিমৃকো রাঃ ॥ কেদা
সিমতি মতি ॥ বাঈ
দে বেরেৎ । মে
সেতাঃ শিশির ॥ বাহা
মনে বিকচ ॥ রূপ
আউরি তিকিন ॥ তেগে
গস এ্ঞ্‌ক ॥

(মোরোগ ডেকে উঠেছে, শ্রীমতী মতিবাঈ এবার ওঠ। সকালের শিশির ভেজা ফুল কি চমৎকার! কিন্তু সেই ফুল দুপুর না হতেই শুকিয়ে যায়!)

Syllabic বা দলবৃত্তরীতিতে সাঁওতালী ছড়া গানের বিচিত্র পর্ব-বন্ধ পাওয়া যায়। একপদী, দ্বিপদী ত্রিপদীর কোনো অভাবই নেই।

ঘ, এ সীম । সীম দে বুসাক্ । মে
বুর্গিকো । হিজুঃ কানা ॥ দাঁড় বাগিয়াম।

(হে মুরগী তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দাও। বর্গীরা এগিয়ে আসছে, নইলে আমি তোমাকে ফেলে দৌড়ে পালাব।)

ঙ) নাচনিয়া থারে থার
মান্দাড়িয়া সারে সার
তকয় কোওয়া চেৎ এ্ঞুতুম্
বাইএ্ঞ্ বাড়ায়া।
তকয় তিরে নানৃহা সাঙ্গা
লান হা সিজ মালা
উনিয়াঃক্' এ্ঞুতুম গে চ
রাধা কুঁয়ারী ॥

(যারা নাচবে, তারা কেমন সারে সারে দাঁড়িয়ে গেছে, আর যারা মাদল বাজাবে, তারাও সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। (এখন) এদের কার কী নাম আমি জানি না।

তবে যার হাতে সরু শাঁখা রয়েছে, আর যার গলায় সরু কঁইতি বেলের মালা রয়েছে তার নাম কিন্তু রাধা কুমারী।)

ছন্দের দিক ছাড়া ভাবের দিক থেকে বাঙলা ছড়ার পূর্বাভাস সাঁওতালী, মুণ্ডারী, কোড়া প্রভৃতি ভাষায় ছড়াতে পাওয়া যায়। বিচিত্র চিত্র সৃষ্টিতে কথাগুলি খাপছাড়া খাপছাড়া মনে হলেও তার মধ্যে এক ঐক্য-সূত্র বিদ্যমান। একই ছড়ায় প্রশ্ন ও উত্তর, অতি অল্প কথার মধ্যে বহুদিনের সঞ্চিত বেদনা আশা আকাঙ্খা মুহূর্তে প্রকাশিত হয়েছে। (১৪) এখানে সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় একটি গানের উল্লেখ করছি।

এ ফুল দেলা ফুল,
রেল গাড়িরে দেজা:ক্' ফুল
ডুমকা জিলা এেল:
রেলগাড়িরে বাএ্ দেজ:ক্'
ডুমকা জিলা বাএ্ এেল
ডুমকা জিলা হড় দরে হালে ডালে। (১৫)

ও ফুল (সই-পাতানো নাম) এসো
রেলগাড়িতে ওঠো
ডুমকা জেলা দেখ,
রেলগাড়িতে আমি উঠব না
ডুমকা জেলা আমি দেখব না
ডুমকা জেলার মানুষ দুর্দশায় পড়েছে।

এ বিষয়ে একথা বলা যেতে পারে, বাঙলার লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান, ছেলে ভুলানো ছড়ার পশ্চাতে আর্য-পূর্ব কোল জাতির মৌল সাহিত্য গুলির প্রভাব আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষত: বাঙলার মাটির ছন্দ syllabic metre ও কোল জাতির বিচিত্র সঙ্গীত ও ছড়া ইত্যাদির ছন্দ থেকে যে একেবারেই দূরে নয়-তা স্পষ্ট বোঝা যায়। মাঝে মাঝে মনে হয়, সাঁওতালী ছড়া ইত্যাদি যারা তৈরী করত, তারাই কখন সাঁওতালী ফেলে

(১৪) সুহৃদকুমার ভৌমিক ; বাংলার মৌল সাহিত্য, বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ
(১৫) ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে — সাঁওতাল গণ-সংগ্রামের ইতিহাস

বাঙলায় ছড়া তৈরী করতে শুরু করেছে। ভাব, রচনারীতি ও ছন্দের দিক থেকে তাই ভাবা স্বাভাবিক। বাঙলা ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে সাঁওতালী ভাষার উচ্চারণের কোথায় সম্পর্ক সে নিয়ে বিচারের আবশ্যক নেই। তবে আমরা এটুকু জেনে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে, সাঁওতালদের বাক্-রীতি (speech habit) তাদের ছড়া গান প্রভৃতিতে syllabic metre বা ছড়ার ছন্দের সৃষ্টি করেছে। সেই sylabic metre ই বাঙলা ছড়া, বাউল, টুসু, প্রসাদী সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে বাঙলার স্বাভাবিক উচ্চারণের ফলে।

কোল জাতির সঙ্গে বাঙালি জাতির সম্পর্ক কোথায় এই প্রসঙ্গে ছন্দ নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনার কারণ আছে। সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার পরিবর্তন ঘটে, একটি প্রচলিত শব্দ ভাষাস্রোতে হারিয়ে যায় এবং তার বদলে সম্পূর্ণ নূতন শব্দ স্থান লাভ করে। কিন্তু যে বাক্-রীতি বংশ পরম্পরায় একটি দেশে প্রবাহিত থাকে তা সহজে পরিবর্তিত হয় না।

আমাদের বহু লোকাচারে কোল জাতির সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। বিবাহে সিন্দুর দান পূর্বাঞ্চলীয় ভারতবাসীর একটি পবিত্র অনুষ্ঠান। সাঁওতালদেরও বিবাহে সিন্দুরের ব্যবহার সর্বাধিক মূল্যবান। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে তাদের এমনি সংস্কার যে কোনো লোক যদি কোনো কুমারী মেয়েকে জোর করে সিন্দুর দেয়. তাকে বিবাহ করতেই হবে। কোনো মেয়েকে জোর করে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ করার এটি একটি উপায়। তবে সামাজিক ন্যায়দণ্ড ও বিচারে সাজা এতে কম হয় না। বিবাহিতা রমণীর নোআ (লোহা শব্দ থেকে) ব্যবহার নিঃসন্দেহে বাঙলার কোনো আর্য-পূর্ব জাতি থেকে এসেছে। বহু পূর্বে এই লোহার খাড়ু বা বালার আয়তন ছিল বড়ো — পরাধীনতার প্রতীক হিসাবে। এখন তা সধবার প্রতীক হিসাবে সূক্ষ্ম 'নোআ' হিসাবে শোভা পাচ্ছে। পূর্ণ ঘটে আম্রপত্রের ব্যবহারকে বাঙালি হিন্দুদের মতো পবিত্রতার প্রতীক বলে এরা মনে করে।

কিছু কিছু দেবদেবীর মূর্তি চিন্তা ও ধ্যান ধারণাতে প্রত্যক্ষ কোল-প্রভাব লক্ষিত হয়। দেবাধিদেব শিবের ধারণা কোলদের থেকে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। কোলদের সর্বশক্তি সম্পন্ন দেবাধিপতির নাম মারাংবুরু।

মারাংবুরুর অর্থ (মারাং — বড়, বুরু-পাহাড় হল পর্বতবাসী দেবাত্মা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত প্রকার অশুভ থেকে রক্ষাকর্তা। মারাংবুরুর যে ধারণা বা রূপ এঁদের সাধকরা ধ্যানে পেয়ে থাকেন তা শিবের সঙ্গে অভিন্ন। আমি ও বহু সাঁওতাল পল্লীতে পৌরাণিক যাত্রা দেখেছি। সেখানে মারাংবুরু শিবের রূপ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছেন। হো জাতির মধ্যেও মারাংবুরু জনপ্রিয়। পর্বতবাসী এই মারাংবুরু এবং কৈলাসবাসী শিব অভিন্ন। তেমনি শক্তিদেবী জাহের এরা এবং আমাদের কালী অভিন্ন। হিন্দু ধারণায় শিব ও কালীর যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সেই রকম সম্পর্ক কিন্তু এদের মধ্যে নেই। তবে সমস্ত কিছু জাহের এরা ও মারাংবুরুর জন্য বেঁচে আছে। গ্রামের একত্র মিলিত হওয়ার জায়গার নাম জাহের থান। এছাড়া আমাদের চণ্ডীর ধারণাও এদের থেকে এসেছে। এ বিষয়ে বহু পূর্বে লিখিত মাঝি রামদাস টুডু রেস্কার সুবিশাল খেরোয়াল বংশাঃক্' ধরমপুথি আমাদের পরিষ্কার ধারণা দেয়। যদিও গোঁড়া সাঁওতালরা মনে করেন এতে কিছু কিছু হিন্দু ধারণা মুখ্য হয়ে উঠেছে। গভীর সাদৃশ্য থেকে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু হিন্দু ধ্যান ধারণা যে বহু পূর্বে কোল সংস্কৃতি থেকে উপাদান নিয়ে বসে আছে সে কথা আমরা ভুলে যাই।

মাঝি রামদাস টুডু মহাশয় কার্তিক ও গণেশকে মারাংবুরুর সন্তান বলে অবিহিত করেছেন। কোল সংস্কৃতিতে কার্তিক ও গণেশের স্থান সীমিত এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে আমদানি। এই দুই দেব-কল্পনা সম্ভবতঃ দক্ষিণ-ভারতীয় দ্রাবিড় ধারণা থেকে এসেছে। মহেঞ্জোদারোতে লিপির ব্যবহার থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে দ্রাবিড়গণ সুপ্রাচীন কাল থেকে লিখতে জানতেন। আর্যগণ লিপির ব্যবহার জানতেন না বলেই বেদকে মুখস্থ করে রাখতেন। যার ফলে এর নাম হয়েছিল শ্রুতি। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর 'গণেশ' নামক কোনো ব্যক্তি আর্যদের লিপি কৌশল শিখিয়ে দেন এবং বেদব্যাসের লিপিকর হিসাবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে গণেশ দেবতা হিসাবে পূজিত হলেও তাঁর আকৃতি-কল্পনায় অবজ্ঞাসূচক বিলক্ষণ হাতির মাথা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু গণেশের পরিচয় দিয়ে অন্-আর্য ব্যক্তিরা বিবিধ পণ্যের পশরা আর্য-উপনিবেশে নিয়ে যেত বলে বহু পরে গণেশ ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দেবতা হিসাবে বর্ণিত হয়েছেন। মাঝি

রামদাস তাঁর পুস্তকে গণেশকে আবগে বোঙ্গা বা বাণিজ্যের দেবতা বলেও পরিচয় দিয়েছেন। কার্তিক দ্রাবিড় সমাজে মুরুকান্ নামে পরিচিত। তিনি সৌন্দর্য ও শৌর্যের প্রতীক। দেবী চণ্ডী সম্ভবতঃ কোল-সংস্কার জাত। কোল সমাজে বিবিধ চণ্ডীর আভাস পাওয়া যায়। 'কাল চণ্ডি, নাশন চণ্ডি, শ্মশান চণ্ডি, বিশই চণ্ডি এবং যোগিনী চণ্ডি এই ছয়টি হুড়িং চণ্ডি বা ছোট চণ্ডি রয়েছেন। এবং এঁদের সকলের ওপরে রয়েছেন মারাং চণ্ডি বা বড়ো চণ্ডি। মূলতঃ চণ্ডী খুবই অশুভ, অপদেবী কিন্তু শক্তি বলে আরাধ্যা হয়েছেন। খেরোয়াল বংশাঃক্' ধরম পুথিতে এঁদের সচিত্র বর্ণনা রয়েছে। প্রাচীন মুণ্ডা সমাজেও এই ছয় চণ্ডী ভিন্ন নামে অভিহিতা। এখানে চণ্ডা বোঙ্গা সম্বন্ধে Rev. John Hoffmann, S.J. এর উক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

(1) One of the tutelary spirit of the Mundari village. (2) The word *candi* without the addition of the word *bonga* is also used to designate evil-minded spirits, ever ready to put themselves at the disposal of wizards and witches to hurt others. These are also called *huring candiko*, the small chandis in contra-distinction to Marang candi, another name for Candibonga. The six *huring candiko* generally enumerated are believed by some to be six distinct spirits, and by others to be but different modalities or functions of one and the same spirit. They are (1) *Kulao candi*, (2) *Cordea candi*, (3) *Najom candi*, (4) *Akuti candi* (5) *Kudura candi* (6) *Mahadeo candi* (16)

এই চণ্ডীপূজার ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন প্রকৃতির। সাধারণতঃ একটি পাথরের নুড়িতে চণ্ডীর শক্তি নিহিত থাকে; তার সামনে মুরগী কিংবা পাঠা বলি দেওয়া হয়। এই পাথরের নুড়িকে বলা হয় চণ্ড। চণ্ড শব্দের মৌলিক অর্থ হল শক্তি। প্র-উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'প্রচণ্ড' শব্দের ব্যবহার রয়েছে। সম্ভবতঃ প্রাচীন কালেই কোল-গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃতে এই শব্দ প্রবেশ করে।

(16) Encyclopoedia Mundarica — page-737—741

কিন্তু বাঙালী সমাজে চণ্ডী অপদেবী থেকে দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। অবশ্য সমস্ত মঙ্গল কাব্যেই দেখি তাঁরা শক্তির দ্বারাই পূজার অধিকারিণী হয়েছেন।

এখানে বলে রাখা ভালো, কোল সমাজে দেবদেবীর রূপকল্পনা বহু পরবর্তী কালে এসেছে। এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা পার্বণে দেবদেবীর কোনো মূর্তি নির্মিত হয় না।

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস কোল জাতির একটি বিশিষ্ট ধারণা। মানুষ মৃত্যুর পর আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসে তার পূর্ব জন্মের কর্মানুযায়ী। জন্মান্তর বিশ্বাসের ভিত্তিতে বহু জনপ্রিয় উপকথা (folk tales) সাঁওতাল সমাজে এখনও বিদ্যমান। এবং ঐ সমস্ত কাহিনী একটি নৈতিক শিক্ষার ইঙ্গিত দেয়। কিছু কিছু কাহিনী অতি সহজেই জাতকের কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই জন্মান্তরবাদ ধারণা, প্রাত্যহিক জীবনদর্শনকে প্রভূত পরিমাণ প্রভাবিত করেছে। এই জীবন একবার মাত্র আসে না — অনন্ত চলার পথের এটি একটি পদক্ষেপ মাত্র, এবং এই জীবনের কর্মানুযায়ী পরবর্তী জীবন পরিচালিত হবে — কিংবা এই জীবন পূর্ববর্তী জীবনের কর্মফল অনুসারে চলেছে -- এই সমস্ত ধারণা পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারতীয় মানুষকে ত্যাগবাদী করে তুলেছে। আর্যগণও ভারতীয় মাটির এই মৌলিক চিন্তা থেকে মুক্তি পায় নি। বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠার জন্য ঋক্‌বেদের ঋষিরা বিভিন্ন দেবতার নিকট প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু উপনিষদে দেখি, ভোগ ও বিলাস থেকে দূরে থেকে ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তির চেষ্টা।

এই জন্মান্তরবাদ ভারতীয় দর্শন ছাড়া সাহিত্যেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। পাশ্চাত্যের তুলনায় আমাদের মধ্যে জীবনের জন্য তীব্র অনুভূতি কম। এ জীবনে কোনো আঘাত বা দুঃখ পেলে তাকে পূর্ববর্তী জীবনের প্রতিক্রিয়া বলে মনে করি। কোনো বাসনা বা কামনা পূর্ণ না হলে তা পরবর্তী জীবনে পেতে পারি বলে ধারণা থাকায় বেদনার অনুভূতিও আমাদের কাছে শিথিল! ফলে আমাদের সাহিত্যে করুণ রসের প্রাচুর্য আছে কিন্তু ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয় নি। আমরা দুঃখময় জীবনের অপূর্ণ পরিণতিকে স্বীকার করি না। ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডির আবির্ভাব আধুনিককালে, গ্রীক ও শেক্‌সপীয়রীয় আদর্শে রচিত। অবশ্য ট্র্যাজেডি সৃষ্টি

না হওয়ার পশ্চাতে আরো অন্যান্য ধারণা কাজ করলেও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস সর্বাধিক শক্তিশালী সন্দেহ নেই। এই ভাবে আর্য-পূর্ব কোল জাতির ধ্যান-ধারণা, দর্শন সমগ্র ভারতীয় জীবনবাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে।

এই সুপ্রাচীন কোল-জাতির সঙ্গে আমাদের ঋণ ও অবহেলার একটি সম্পর্ক আছে। স্বামীজী বলেছিলেন, বলবানের দিকে সকলেই ধায়। গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কিছু মাত্র লাগে এই সকলের ইচ্ছা। ফলে যুগে যুগে অসংখ্য কোল-মানুষ তাদের বৈশিষ্ট্যকে ফেলে দিয়ে আর্যত্ব গ্রহণ করেছে এবং অবশিষ্ট কোলদের সহিত সম্পর্ককে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। P. C. Roychoudhuri ১৮৫৭ সালের বিহারের ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধান করার পর বলেছিলেন — In the dealings with the aboriginals whether in Chotonagpur or in Santal Parganas it was almost forgotten that they have an aristocracy and culture of their own and were not specimens of museum to be bandied about. (17)

এই জাতির সভ্যতার সন্ধান করতে কত পশ্চাতে যেতে হবে তার হিসাব নেই। উক্ত পুস্তকের শুদ্ধমাত্র রাঁচী জেলার বিবরণটুকু উদ্ধৃত করলে যথেষ্ট হবে, উৎসাহী পাঠক মূল পুস্তকের অন্যান্য অধ্যায় দেখে নিতে পারেন। The district of Ranchi, unlike some other districts in Chotonagpur has visible antiquites. The cromlechs or sepulchral slabs that are scattered all over the district are so many antiquities. At village chokahatu in thana Sonahatu there are thousands of old tombs. Col. Dalton gave the number as 7, 360 and thought that excavation would probably disclose an understratum of similar graves: Ruins of ancient buildings are still to be seen at village Chapi in Khunti subdivision, at villages in Torpa circle and other Places. Stone slabs representing

(17) 1857 in Bihar.

the Palacolithic and neolithic ages have been discovered and identified. Antiquites of the copper age discovered in Ranchi district, represented in artifacts and bronze and iron implements are to be seen in the Patna Museum. The Asura sites in the district had attracted the attention of the late S. C. Roy who from these finds thought that Chotonagpur belongs to the same age of culture as that of the Indus vally. (18)

পৌরাণিক যুগে এই জাতিটির শৌর্য-বীর্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। জরাসন্ধ ছিলেন এই অঞ্চলের একছত্র সম্রাট। সাঁওতালগণ এখনও মনে করেন, একলব্য শুধুমাত্র কোন সম্প্রদায়ের নয়, সাঁওতাল গোষ্ঠীরই মানুষ। তাই আজও সাঁওতালগণ তীরধনুর ব্যবহারে, বিবাহে সিন্দুর দানে বুড়ো আঙুলের ব্যবহার করেন না। কিছু কিছু আদিবাসী এখনও মনে করেন রাম ও কৃষ্ণ উভয়েই তাঁদের পূর্ব-পুরুষ। নবদূর্বাদল শ্যাম গায়ের বর্ণের জন্য তাঁদের মধ্যে এমন ধারণা এসেছে কিনা জানা নেই তবে তীরধনু ও বাঁশির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে রাম ও কৃষ্ণের স্মৃতিকে তাদের মধ্যে উজ্জ্বল রাখার প্রয়াস দেখা যায়। এই ধারণা বৃদ্ধ সাঁওতালদের মধ্যে এখনও আছে এবং তাই তাঁরা বলেও থাকেন।

মূলতঃ ছোটনাগপুরকে কেন্দ্র করে এই উঁচু নীচু লাল টিবির দেশ যুগে যুগে নানা কৃষ্টির বাহন হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্কর প্রভৃতি মহা-পুরুষগণের পদ স্পর্শ এই অঞ্চলকে পবিত্র করেছিল। মুসলমানগণের দ্বারা এদের অঞ্চল নানা ভাবে আক্রান্ত হয়, এবং বহু আদিবাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতিগুলির বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখনও সাঁওতাল গ্রামগুলিতে মাঝি, জগমাঝি, গোডেৎ, পরামানিক ও নায়েকে রয়েছেন। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং গ্রামের পঞ্চায়েত বিচারে এঁরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। ইংরাজ তার শাসনকে কায়েম করার জন্য আদিবাসীদের নানা প্রাচীন সংস্কারের মূলে

(18) P. C. Roychoudhuri 1857 in Bihar, page 124

আখ্যাত করে এবং তাদের ক্ষমতাকে সীমিত করার চেষ্টা করে। এতে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কোল বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, বিরসা বিদ্রোহ সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি ইংরাজের শাসনকে অস্বীকার করার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

> হুসোসাবোন, নওয়ারাবোন চেলে ই বাকো তেঙ্গোন,
> খাটি গেবোন হুলগেয়া হো,
> খাটি গেবোন হুলগেয়া হো,
> দিশম দিশম দেশমাঞ্জহি পারগাণা
> নাতো নাতো মাপাঞ্জিকো
> দঃক্' বোন দানাং বোন বাং গোকো তেঙ্গোন,
> তবে দোবোন হুলগেয়া হো।' (১৯)

আমরা নিজেরাই বাঁচব, কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াবে না, আমরা সত্যই বিদ্রোহ করব, দেশের মাঝি, ও পারগানারা, গ্রামের মোড়লরা, আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে। (যদিও) কেউ পাশে এসে দাঁড়াবে না, তবুও আমরা নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করব।

সাঁওতালদের মধ্যে তাদের পুরাতন ইতিহাস নিয়ে পুরাণের মতো নানা কাহিনী মুখে মুখে টিকে রয়েছে। কি ভাবে বিশ্ব সৃষ্টি হল তার চমৎকার বর্ণনা আছে। সর্বপ্রথম এই বিশ্বে ভূমি বা মাটি ছিল না। বিশাল এক জলরাশিতে পূর্ণ ছিল। মারাংবুরু বা ঈশ্বর ভাবলেন পৃথিবী সৃষ্টি করা যাক। প্রথমে তিনি জলচর জীব সমূহের জন্ম দেন। কাঁকড়া, হাঙর, কুমীর, চিংড়ি মাছ, রাঘব বোয়াল, কেঁচো প্রভৃতির জন্ম সেই সময়ই। তারপর হাঁস-হাঁসলি নামে দুটি পাখি বা হাঁসের জন্ম দেন। হাঁস হাঁসলির কাহিনী চমৎকার। মাঝি রামদাস রেস্কা টুডুর মতে — ঐ অনন্ত সমুদ্রে ঈশ্বর যেখানে স্নান করতেন সেখানে সিরম গাছের শেকড় দিয়ে হাঁস-হাঁসলি নামে দুটি পাখির জন্ম দিলেন। তারপর তাদের কারাম গাছের ডালে বাসা বেঁধে দিলেন। কিছু দিন বাদে তারা ডিম পাড়ল এবং কোথায় ডিম রাখবে সেই ভেবে কাঁদতে লাগল।

(১৯) ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে — সাঁওতাল গণ-সংগ্রামের ইতিহাস

"হাঁস্-হাঁসলি চোঁড়, বাবা ঈশ্বর এন্তুমেতে নেহোরকাতে এ, সিঙ্গে সিঙ সিঙ্গে ঞিন্দা গেএল্ সের্মাবিন্ রাঃ লাঃ আ গেএল্বার সোর্মাকিন রোদন্ লাঃ - আ —

... ...

নয়া দ্রয়া তালায়ে দো, মঞ্চপুরী গে বাহুঃ আনা,
হায় হায় বাবা ঈশ্বর, আড়ি গেলিং নে হোরঃ দোও
বাবা ঈশ্বর আক্কম্ তালিং মেসেএ,
অকারেলিং তাঁহে না, অকারে দোও বাংআ।"

সেই হাঁস হাঁসলি পাখি করুণাময় ঈশ্বরের নামে প্রণাম জানিয়ে রাত্রি দিন করে দশ বৎসর বিলাপ করেছিল এবং কুড়ি বৎসর রোদন করেছিল। ... অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে এই কারাম গাছের উপর আমরা বাসা তৈরী করেছি; এখন যাব কোথায়? এই জল-সমুদ্রে পৃথিবী নেই। করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের এই মিনতি শোনো, আমরা কোথায় থাকব এবং কোথায় থাকব না তা তুমিই জান। — অবশেষে ঈশ্বর সমস্ত শুনতে পেলেন।

তারপর পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। প্রথমে কুমীর, তারপর চিংড়ি বা ইচা মাছ, তারপর বোয়াল মাছ, কাঁকড়া সকলেই ঠাকুরের আদেশে ডুব দিয়ে পাতাল থেকে মাটি এনে পৃথিবী তৈরী করতে পারল না। শেষকালে কেঁচো পেরেছিল।

তারপর সেই বিশাল পৃথিবীর হিহিড়ি-পিপিড়ি নামক স্থানে হাঁস-হাঁস্লি তাদের ডিম রেখে কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। আর দুই ডিমের থেকে আবির্ভূত হলেন পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুডহি। তাঁরাই হলেন প্রাচীনতম মানুষ। তাঁদের সাত ছেলে সাত মেয়ে। বুড়োবুড়ির ঝগড়া হলে বুড়ি সাত মেয়েকে নিয়ে বনে চলে গেল। দীর্ঘকাল পরে সাত ছেলে বনে শিকার করতে গিয়ে সাত মেয়ের প্রেমে পড়ল ও তাদের বিবাহ করল। যাদব পাটকর বা যাদু পটুয়ারা এই সমস্ত পট এঁকে সাঁওতাল সমাজে দেখিয়ে থাকে। সাত ছেলে মেয়ের সন্তান হল হড় জাতি বা সাঁওতাল জাতি। সাঁওতাল পণ্ডিতদের মতে প্রাচীন হিহিড়ি-পিপিড়ি

ছিল হাজারিবাগে। সেই সাত ছেলের বংশানুযায়ী পদবী হল (১) মুর্মু (২) হাঁসদা (৩) মাণ্ডি (৪) সরেণ (৫) হেম্ব্রম (৬) টুডু (৭) কিসকু এছাড়া পরবর্তী কালে আরও পাঁচজন তাদের ভ্রাতা হিসাবে যোগ দেন। তারা হলেন (৮) বাস্কে (৯) বেশরা (১০) পাঁউরিয়া (১১) চাঁড় (১২) গেণ্ডোয়ার। এই বারোটি বংশের জন্য বারোটি রাজ্য ছিল। নিয়ে তার একটি বর্ণনা দেওয়া গেল। সাঁওতালী ভাষায় রাজ্যকে বলা হয় গাড় বা গাউড় (গাঁড়) ।

(১) হাঁসদাঃ কোআঃদ — কুটীম্‌পুরী গাড,
(হোঁসদা: কোআ:দ ইচা:গাড এমান ইক লাই আ)
(২) কিস্‌কু কোআঃদ — কঁয়ডা গাড়,
(৩) মুরমু কোআঃদ — চামপা গাড়,
(৪) হেম্‌ব্রম কোআঃদ — খাইরী গাড়,
(৫) মার্ণ্ডী মোআঃদ — বাদোলী গাড়,
(৬) সারেন কোআঃদ — চায় বাহের গাড,
(৭) টুডু কোআঃদ — লুইবাড়ি লুকুইবাড়ি গাড়,
(৮) বেশ্‌রা কোআঃদ — বোন সারিয়া গাড়,
(৯) বাসকে কোআঃদ — হার বালোয়েন্‌ গাড়,
(১০) পাউরিয়া কোআঃদ — বামা গাড়,
(১১) চাঁড়ে কোআ:দ — জাঁগে কোডে গাড়,
(১২) গাণ্ডোয়ার বা সোআলি কোআদ — হলং গাডা গাড় ।

এদের মধ্যে চাম্পা গাড় ছিল সব চেয়ে সুখের রাজ্য । (২০)

পিলচু হাড়াম-পিলচু বুড়হির পুত্রকন্যাদের বিবাহ ভাই-বোন বিবাহের প্রাচীনতম নিদর্শন। দশরথ-কৌশল্যা, রাম-সীতা, এমনকি ঐতিহাসিক কপিলাবস্তুর রাজ পরিবারে ভাই-বোনের বিবাহ তুলনামূলক ভাবে এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। (২০)

পরবর্তীকালে এই বারোটি গোত্র বা জাত বিভিন্ন জীবিকার সঙ্গে জড়িত হল। মুর্মুরা পূজাপার্বণ ও পড়াশুনা, কিস্কুরা ক্ষত্রিয়ের মতো

শাসনকাজে, সরেণরা সিপাই টুডুরা সঙ্গীত ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। পুরাতন গানে আছে —

বাদোলী কঁয়েড়া গাডরে টাক দো চালাঃ কান
হো-বাবা হো
মুর্মু ঠাকুরকো দো বাবা,
পুথি বাবাকো, পাডহাওআ,
বাদোলী কঁযেড়া গাডরে লিখন চালাঃ কান্
হো বাবা হো। (২১)

চায়চাম্পা রাজ্য ছিল সাঁওতাল জাতির রামরাজ্য। মহাদেব হাঁসদা 'চায়চাম্পা রেয়াঃ কাহনী'তে চাযচাম্পার স্থান কোথায় ছিল তার ঐতিহাসিক তথ্য দিয়েছেন।

যাঁহায়েন গে নিযা হালে হালে Mr. Risely-দয় লাই আকাদা মিং মারাং আর নাম ডাকে সান্তাড়ী নাগারদ হাজারিবাগরে বেনাঅ লেনা। উনিদয় লাই এদা, জরা (Jaura) এ্যতুমান সান্তাড রাজা অঁডেদয় তাহেঁখান্ জখান ১৩৪০ (A.D) রে সৈয়দ ইব্রাহিম আলিয়েন্ মুসলী ফাদক হতেতে উনিদয় গচ হচয়েনা আর সাঁঅতে আচ্য়েন পারিভারক ই। অনকাগে J Philip ইয় লই আবাদা চায়-চাম্পা দিশমার সান্তাডকদ আডিক লাহান্তি লেনা।' অর্থাৎ রিসলির মতে হাজারিবাগে বিরাট নামডাকওয়ালা সাঁওতাল নগরী গড়ে উঠেছিল। বিখ্যাত সাঁওতাল রাজা জরা সৈয়দ ইব্রাহিম আলির মুসলমান সৈন্যদের হাতে সপরিবারে নিহত হন। জে. ফিলিপের মতে চায় চাম্পাতে সাঁওতালগণ যথেষ্ট উন্নতমানের জীবনযাপন করছিলেন।

ইব্রাহিম আলির আক্রমণে সাঁওতালগণের রামরাজ্য ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কোথায় চাম্পানগর আর কোথায কান্দাহার (আফগানিস্থান) কিন্তু এ নিয়ে সাঁওতাল সমাজে গান প্রচলিত আছে।

চেতে লাগিৎ মাপাঃ কানাকঁয়ডাক
ধাঁঅ ধাঁঅ কান্দাহারিরে

২১. হাজারিবাগ্ রেযাঃ ইতিহাস — টি, কে, রাপাজ (যুগ সিরিজোল)

চেতে লাগিৎ গপচ্ কানা বাদোলীক
ধাঁঅ ধাঁঅ কান্দাহারি রে?
সীমা লাগিৎ মাপাঃ কানা কঁয় ডাক
ধাঁঅ ধাঁঅ কান্দাহারি রে।
ডাড়ি লাগিৎ গপচ্ কানা বাদোলীক
ধাঁঅ ধাঁঅ কান্দাহারি রে !!

এখনও আদিবাসীরা তাঁদের উপকথায় পরিণত চায়-চম্পা রাজ্যের স্মৃতিকে স্বপ্নের মতো দেখে থাকেন।

"চম্পাদেশ কী চমৎকার!
আর বাদোলা কঁয়ড়া, তার গড়ন বা কী চমৎকার!
হায় চম্পা! হায় বাদোলী!
আমরা কোথায় তোমাদের ফেলে এসেছি!

"চাম্পা গাড়দ লিলি বিছি
বাদোলী-কঁয়ডা লিখন গড়হন!
দায়া গে, চাম্পা — বাদোলী কঁয়ডা
দায়া গে, গাড়বো বাগিয়াঃ কাণ !!

প্রাচীন অতীতের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার আশাঙ্খা নিয়ে দিনের পর দিন কঠোর বর্তমানকে স্বীকার করে নিয়ে এই কোল জাতির মানুষরা সভ্য মানুষের সঙ্গে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। দিন মজুরী, বংশ পরম্পরায় সেবা ও দাসবৃত্তির দ্বারা তাদের জীবন চলেছে গতানুগতিক ভাবে। নামালের কাজ করতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তারা চলে আসে যাযাবরের মতো। বড়ো বড়ো সড়ক তৈরী, খালখাটা, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি সভ্যতা রক্ষা ও বুনিয়াদ গঠনে তাদের জুড়ি নেই। কয়লার খনি, চা বাগিচায় তাদেরই ডাক পড়ে। কোনো সাঁওতাল রমণী তার স্বামীকে বলে, 'রাণীগঞ্জের কয়লার খনিতে কয়লা খোঁড়া কি কঠিন কাজ! তোমার দেওয়া সেই সুন্দর নাকের ফুল কোথায় হারিয়ে যায়!

আড়ি ঝামাল কামি
রানীগঞ্জ খাদান কামি

সুরেনা মনের সুদাম
মসৎ এরুক !

দারিদ্র, অবহেলা ও হিন্দু সমাজের কাছ থেকে ক্রমাগত ঘৃণা ইত্যাদি পেয়ে এরা নিজেদের সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছে অনেক খানি। তাদের সেই সত্তাকে জাগ্রত করাই হবে আমাদের প্রধান কাজ।

এবং তা সম্ভব কোল-সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গ-সংস্কৃতির তুলনামূলক বিচারে। আমাদের শুধু লোক-সংস্কৃতি কেন, তথাকথিত উচ্চমানের সংস্কৃতির বিরাট একটি অংশ তাদের থেকে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। শুধুমাত্র তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে আমাদের কাজকে সীমিত রাখলে চলবে না। কোল-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানও বর্ণনামূলক ভাবে (Descriptive) সংগ্রহ করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। Ho grammer & vocabulary
২। Lodhas of West Bengal
৩। সাংস্কৃতিকী— সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
৪। বাঙালীর ইতিহাস— নীহার রঞ্জন রায়
৫। ভারতে বিবাহের ইতিহাস— অতুল সুর

—০—

ওরাওঁ উপজাতির জীবনচর্যা এবং বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি

রেবতী মোহন সরকার

উপজাতি জীবনচর্যার বিভিন্ন ধারায় ভারতীয় সংস্কৃতি বিশেষ ভাবে উদ্বেলিত — যুগে যুগে আদিম খাদ্যান্বেষণকারী উপজাতি গোষ্ঠী হতে নানা ধ্যান ধারণা দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণবস্তুকে প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় উপজাতি সংখ্যায় যেমন অন্যান্য সমরূপী দেশ অপেক্ষা বিশেষভাবে অগ্রণী, ঠিক তেমনি এদের সমাজ-সাংস্কৃতিক বিচিত্রতা সারা পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতের মতো বিশাল দেশের নৈসর্গিক, ভৌগলিক বাস্তু-সংস্থানিক এবং সাংস্কৃতিক বহুমুখীতার মধ্যে লালিত বিচিত্র উপজাতি গোষ্টির জীবনাদর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছে — বিশেষ এক অংশের মাটি ও মানুষের সাথে, জল-হাওয়া ও বনানীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এইসব উপজাতিদের জীবনযাত্রা প্রণালী নানাভাবে রূপলাভ করেছে। দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী উপজাতি গোষ্টীর মধ্যে দৈহিক আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্যের সাথে সাথে সামাজিক রীতি-নীতি ও ধ্যান ধারণার বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। দেশব্যাপী এই বিভিন্নতার মধ্যেই ঐক্যসূত্র রচিত হয়েছে এবং সেই ঐক্যের মধ্যেই বৃহত্তর ভারতীয় জনজাতীয় সংস্কৃতির মুলসুর ধ্বনিত হয়। উপজাতিয় সমাজ মূলতঃ ভারতীয় সমাজ — মনে প্রাণে, আচারে আচরণে এদের সাথে প্রকৃত ভারতীয় চিন্তাধারার মিলন ঘটেছে। একমাত্র এই কারণেই উপজাতি গোষ্টীর জীবনচর্যার ধারা আলোচনার সময় এদেরকে বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি হতে পৃথক করে উপস্থাপিত করলে আসল উদ্দেশ্যই ব্যহত হবে।

সাম্প্রতিক কালে উপজাতি জীবন ধারা আলোচনার গতি সম্যক পরিবর্তিত হয়েছে। উপজাতিদের বিচিত্র রীতি-নীতি এবং অদ্ভুত আচার

আচরণের প্রণালীবদ্ধ উপস্থাপনই বর্তমান উপজাতি জীবনধারা আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটের মাধ্যমে উপজাতিদের জীবন ধারা আলোচনান্তে সমসাময়িক বৃহত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সেই ধারার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং নানা অংশের মূল্যায়ণ আজকের নৃবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিজ্ঞান অধ্যয়নের পরিবর্তিত পটভূমিকায় অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে।

সেই বিশেষ রীতি অনুসরণ করেই ওরাওঁ উপজাতির জীবনচর্যার ধারা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। ছোটনাগপুরের ঢেউ খেলান মালভূমিতে শাল, পিয়াশাল, মহুয়ার বনানীর মাঝে গড়ে উঠেছে ওরাওঁদের আজকের বাসভূমি। ছোটনাগপুর মালভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ, বন্য জন্তু-জানোয়ারদের নিঃশব্দ সঞ্চরণ আর পাহাড়ী নদীর উদ্দাম গতি ওরাওদের জীবনচর্যাকে বিশেষভাবে রূপায়িত করেছে। ওরাওদের জীবন ধারা আলোচনার পথিকৃৎ নৃবিজ্ঞানী শরৎচন্দ্র রায় আলোচ্য উপজাতির প্রকৃত বাসভূমি দক্ষিণ ভারত বলে উল্লেখ করেছেন এবং যুগে যুগে এদের প্রব্রজনের ধারা উত্তর ভারতমুখী হয়েছিল। পরে এরা ছোটনাগপুর উপত্যকার প্রশান্ত পরিবেশে নিজ নীড় রচনা করে এ অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে পরিগণিত হয়।

ওরাওঁরা কৃষিজীবী সম্প্রদায়। ছোটনাগপুর উপত্যকার বন জঙ্গল পরিস্কার করে এরা বিভিন্ন অঞ্চলকে কৃষির উপযোগী করে তোলে। ঐ জঙ্গলের বড় বড় গাছ হতে তৈরী হতে থাকল তাদের কৃষিকাজের নানা যন্ত্রপাতি আর ঘরবাড়ী ও তৈজসপত্র। জঙ্গলময় পরিবেশে, চড়াই উৎরাই, বন্য জন্তু জানোয়ার আর বন্য ফল মূলের নিবিড় সান্নিধ্যে এই উপজাতির সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন বিচিত্র গতিতে বয়ে চলতে লাগল। ওরাওঁরা যে ভাষায় কথা বলে তা দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ওরাওরা নিজেদের কুরুখ বলে বলে পরিচয় দেয়। এর অর্থ হল মানুষ। ছোটনাগপুর উপত্যকায় রাঁচী জেলার মধ্যে এরা রাঁচী শহর হতে সুরু করে পশ্চিমে লোহার ডগা পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। রাঁচী এলাকায় ওরাওঁরা মুণ্ডারী ভাষায় কথাবার্তা বলে অন্যান্য এলাকায় এরা নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করে তবে এর মধ্যে পারিপার্শ্বিক এলাকা হতে হিন্দী, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার বহু শব্দাবলীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। দক্ষিণ দেশ থেকে এসে এই উপজাতি ছোটনাগপুরের মুণ্ডা আর কোলদের মধ্যে বসতি স্থাপন করে কালক্রমে নিজেদের এক

সুসম্বদ্ধ কৃষক গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ওরাওদের মতে এরাই ছোটনাগপুর এলাকার কৃষি কাজের প্রথম প্রবর্তক। এর পেছনে যে যুক্তিই থাকুক না একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই ওরাও উপজাতি সমগ্র ছোটনাগপুরের সুসম্বদ্ধ কৃষিজীবী গোষ্ঠী হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। ছোটনাগপুরবাসী ওরাওদের জীবনযাত্রা প্রণালী ভারতীয় গ্রামীণ কৃষক গোষ্ঠীর অনুরূপ বলেই বিবেচিত হয়। তবে এদের কৃষিকাজের নানা স্তরে যাদুধর্মীয় (Magico religious) বহু বিশ্বাস ও সংস্কার বদ্ধমূল। সারা বছর ধরে চলে কৃষিকাজ আর তার নানা প্রস্তুতি। কৃষির উন্নতি আর ফসল কামনায় নানারকমের আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। হরিয়ারী পরব, কাদলোতা পরব, খড়রা পরব, করম ও জিতিয়া পরব কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলির সর্বপ্রধান উৎসব। এছাড়া এদের সমাজে রয়েছে খাদ্য-অন্বেষণভিত্তিক নানা অনুষ্ঠান। কান্ত, খাদ্দি অথবা সারহুল পরবের মাধ্যমে প্রকৃতিদেবীর আরাধনার সুর ধ্বনিত হয়। শিকার উৎসবও ওরাওঁ উপজাতির জীবনে বিচিত্রতার স্বাদ নিয়ে আসে। প্রতিবছর সমষ্টিগতভাবে শিকার যাত্রা এদের এক আনুষ্ঠানিক রীতি। ফাস্তসেন্দ্রা বা বসন্তকালীন শিকার; বিশু সেন্দ্র বা গ্রীষ্মকালীন শিকার এবং জেৎ শিকার বা বর্ষাকালীন শিকার যাত্রা ওরাওরা বিশেষভাবে সাড়া দেয়। প্রতি বার বছর অন্তর যোনি শিকার অনুষ্ঠানে ওরাও মেয়েরা তীর ধনুকে সজ্জিত হয়ে শিকারে বের হয়।

ওরাওঁরা খুব শান্তিপ্রিয় উপজাতি — জীবনের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলায় অন্যান্য ভারতীয় উপজাতির মতই এরা নানা ধরণের আধি ভৌতিক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাসী। উপজাতীয় দেবদেবীর কল্যাণেই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় — গ্রাম উন্নতির পথে ধাবিত হয় — ক্ষেতে প্রচুর ফসল ফলে। তাই বছরের নানা সময়ে সেইসব দেবদেবীর উদ্দেশ্যে অন্তরের আকুতিভরা পূজা নিবেদিত হয়। গ্রামগুলো উৎসব মুখর হয়ে ওঠে আর সেই উৎসবের আঙিনাতেই ওরাওঁ উপজাতি নিজেদের আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করে। এদের গ্রাম সুসম্বদ্ধভাবে রচিত। এখানে কোন কিছুরই অভাব নেই। এরা বিশ্বাস করে গ্রামের মধ্যেই মানুষের জীবনচর্যা সার্থক ভাবে পরিস্ফুট হয়। দেহের মধ্যে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ততা রক্ষা করতে গেলে যেমন দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে হয় ঠিক তেমনিভাবে গ্রামের সামগ্রিক

জীবনকে উচ্ছ্বাসময় করে তুলতে হলে গ্রামের পরিবেশ এবং পরিস্থিতি সুসম্বদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রামের সুরক্ষার বিষয়ে মানুষের কার্যকলাপ ছাড়াও দেবতাদের হস্তক্ষেপ এদের জীবনাদর্শের অন্যতম প্রধান বিষয়। প্রতিটি গ্রামে রয়েছে গ্রামীণ দেবদেবী। গ্রাম কুঞ্জ বা সরনা অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরনাবুড়িয়া, পাটভূত, দারহা-দেশাওয়ালী, মহাদানিয়া দেবী মাঈ, মহাদেও প্রভৃতি গ্রামীণ দেবদেবী গ্রামরক্ষার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত রয়েছে বলে ওরাওঁদের স্থির বিশ্বাস। প্রধান দেবতা ধরমেশকে উচ্চে স্থান দিয়ে অসংখ্য দেবদেবীকে তাদের প্রকৃতি ও দায়দায়িত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে — দেবদেবীর মধ্যে একটা সুন্দর উচ্চ নীচ স্তরিত রূপ পরিলক্ষিত হয়। এরই সার্থক প্রতিফলন দেখা যাবে ওরাওঁ গ্রামীণ অনুশাসন প্রণালীর মধ্যে। গ্রাম অনুশাসনে একাধারে ধর্মীয় প্রধান — পাহান এবং অন্যধারে রয়েছে লোকায়ত প্রধান — মাহাত। এদের কেন্দ্র করে নানা কর্মী রয়েছে এবং কার্যধারা অনুযায়ী এদের মধ্যে স্তরিতরূপ প্রকট হয়ে উঠেছে। গ্রামের বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ, সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নের প্রকল্প রচনা প্রভৃতি কাজে এদের প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে নিযুক্ত রয়েছে।

সুতরাং ওরাওঁ সংস্কৃতিতে ঐশ্বরিক এবং মানবিক — এই দুই রূপই প্রতিভাত হয়। এদের জীবনাদর্শে এই দুই ধারার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। দেবতা ও মানব সমাজের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করে পারস্পরিক ভাব বিনিময় এবং কর্মবিনিময়ের মাধ্যমে ওরাওঁ জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে। ওরাওঁ গ্রামে পত্রপুষ্প শোভিত কুঞ্জ উঁচু টিলা বা বৃক্ষমূলে যেমন দেবস্থান রয়েছে ঠিক তেমনি-ভাবে প্রতিটি গ্রামে মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার সার্থকরূপ ফুটে উঠে দুটি প্রধান সংস্থার মাধ্যমে। এদের একটি হল আখড়া, অপরটি ধুমকুড়িয়া। আখড়া হল নৃত্যাঙ্গন। বিভিন্ন পাল-পার্বণে মেয়ে পুরুষের উদ্দাম নৃত্যের ছন্দে আখড়া মুখরিত হয়ে উঠে। গ্রামীণ বয়স্কের দল এখানে গ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। মাহাতো এবং অন্যান্য গ্রামকর্মীর নির্বাচনও এই আখড়ার প্রাঙ্গণেই থাকে। ধুমকুড়িয়া ওরাওঁদের জীবনে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। ওরাওঁ শিশু যৌবনে পদার্পণ করে যখন জীবন সংগ্রামের কঠোর পথে দীক্ষা গ্রহণে উদ্যত হয় ঠিক তখনই উপজাতীয় ধ্যানধারণা ও পার্থিব বিষয়ের নানা বাস্তবানুগ অভিজ্ঞতা সঞ্চারে এই ধুমকুড়িয়ার শিক্ষাপ্রণালী বহুমুখী কর্ম-

সম্পাদন করে থাকে। ধুমকুড়িয়া এই শিক্ষাদর্শের সাথে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ধারার এক সামঞ্জস্য খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। বারবছর গুরুগৃহে অবস্থান করে সেদিনের বালক যখন নানা বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করে গৃহ প্রত্যাবর্তন করত তখন তারা জীবনের কঠোর সংগ্রামের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হত। নানা কারণে এবং মূলতঃ বিদেশী শাসনের প্রভাবে সেই প্রাচীন রীতি ভারতীয় জীবনাদর্শ হতে অন্তর্হিত হয়েছে। ওরাওঁদের মধ্যে ধুমকুড়িয়ার কর্মপ্রবাহও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়েছে যদিও জীবনে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য বলে আজকেও বিবেচিত হয়। আমাদের সমাজে আজকের যুবকদের শ্রমবিমুখতা দূর করে জীবন সংগ্রামের প্রকৃত যোদ্ধা হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতাবাদের ধাঁচে রূপায়িত শিক্ষা ধারাকে বিদায় দিয়ে যুগপযোগী শিক্ষাকে আহবান জানানো হচ্ছে। এই যুগসন্ধিক্ষণে সর্বভারতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উপজাতিদের এই সামাজিক সংস্থাগুলির শিক্ষাদর্শ এবং শিক্ষণ প্রণালীর মূল্যায়ন করে এদের সামগ্রিক জীবন চর্যায় কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এগুলির অবলুপ্তি ঘটার পর সমাজে তার পরবর্তী ফলাফলের প্রকৃত পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কারণ আমরা দেখেছি ধুমকুড়িয়ার শিক্ষণ প্রণালীর মধ্যে একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন নিয়মানুবর্তিতা বয়োজেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন রীতিনীতির প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন, কর্মমুখী শিক্ষাগ্রহণ, যৌনশিক্ষা প্রভৃতির উপর সংশ্লিষ্ট উপজাতির যুগান্তব্যাপী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রকৃতভাবে আলোকপাত করা হয়ে থাকে। প্রকৃত শিক্ষানুরাগীর দৃষ্টিতে আমরা যদি উপজাতি গোষ্ঠীর তাদের নিজস্ব সমাজ চিন্তার পশ্চাৎপটে দেশীয় শিক্ষাধারার প্রকৃত মূল্যায়ণ না করতে পারি তাহলে উপজাতি জীবনের আলোচনা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যই সাধন করবে না: একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে উপজাতীয় সমস্যা সমাধানে তথাকথিত অগ্রগামী সমাজের মানুষের যেমন দেওয়ার আছে তেমনি তাদের জীবনাদর্শ হতে বহু কিছু গ্রহণ করারও আছে। একজন দক্ষ নৃবিজ্ঞানী অথবা সমাজবিজ্ঞানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে উপজাতি জীবনের অদ্ভুত ও বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রণালী বর্ণনা করে সেগুলিকে কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দের চমৎকারিত্বের মাধ্যমে উপস্থাপন করলেই কোনদিনই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। উপজাতি জীবনের সমস্যা সমাধান করে প্রকৃত

রচনার পূর্বে তাদের প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে — তাদের জীবনের গভীরে প্রবেশ করে আজকের পরিবর্তিত পটভূমিকায় তাদের জীবনচর্যা বিশ্লেষণের সময় এসেছে।

একটি দক্ষ কৃষিজীবি হিসেবে ওরাওঁ উপজাতি যখন ছোটনাগপুর উপত্যকার মাটির বুকে সোনার ফসল ফলাতে সুরু করেছে এমনি সময় ঐ বিশেষ এলাকাতে কিছু রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটল। ছোটনাগপুরের উপজাতীয় ইতিহাসে দেখা গেছে যে এই এলাকায় ওরাওঁ এবং মুণ্ডারা জমির পুরোপুরি ভোগ দখল করত এবং নিজেদের প্রয়োজনে ওরাওঁরা তাদের গ্রামে নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু অধিবাসীদের বসবাসে প্ররোচিত করেছিল। কুমার, তাঁতি, কামার প্রভৃতি শিল্পী জাতিদের এরা নিজেদের কাজে নিয়োগ করেছিল এবং পরিবর্তে এদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে জমি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। কালক্রমে ছোটনাগপুর উপত্যকায় নাগবংশী রাজাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই উপজাতীয় জীবনে এর প্রত্যক্ষ ফলাফল অনুভূত হল। অর্থাৎ জমির পুরোপুরি ভোগদখলে কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি হল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাংলা, বিহার, ওড়িশার সাথে ছোটনাগপুরের দেওয়ানী স্বত্ব ভোগের অনুমতি প্রাপ্ত হল তখন ছোটনাগপুর পুরোপুরি ভাবে বৃটিশ শাসনাধীন হল। ছোটনাগপুরের রাজার উপর বার্ষিক কর ধার্য হল এবং তার পরিমাণ বছরের পর বছর বর্ধিত হতে থাকল। এহেন অবস্থায় রাজা উপায়ন্তর না দেখে প্রজাদের উপর সেই করভার চাপিয়ে দিলেন। এদিকে রাজা ধীরে ধীরে কিছু বণিক সম্প্রদায় এবং জায়গীরদারদের ছোটনাগপুরে জমি বন্দোবস্ত করে দিলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য কোম্পানীর বর্ধিত কর সংগ্রহ। এইসব কার্যপ্রণালী ছোটনাগপুরের উপজাতীয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত করেছিল। অত্যধিক করভারে ওরাওঁ, মুণ্ডারা ঋণগ্রস্ত হতে থাকল।

এই বিপর্যয়ের সম্মুখে শান্তিপ্রিয় উপজাতি সম্প্রদায় দূরে সরে গিয়ে নিজেদের দুর্ভাগ্যকে অবদমিত করতে চেষ্টা করল। এরা ছোটনাগপুরের বনরাজির গভীরে আশ্রয় নিয়ে মানুষের প্রবঞ্চনা হতে নিজেদের বাঁচাতে সচেষ্ট হল। এদের আমন্ত্রণে ছোটনাগপুরে কিছু কিছু হিন্দু কৃষকগোষ্ঠি

আসতে শুরু করল। এমনি ভাবে ধীরে ধীরে ছোটনাগপুরের প্রথম পর্যায়ের অধিবাসী এই উপজাতি সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব অধিকার হতে উৎখাত হল।

ওরাওঁদের জীবন যখন এমনিভাবে বিপর্যয়গ্রস্ত, তাদের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে যখন এক অনিশ্চয়তার সূচনা সুরু হয়েছে তখনই ব্রিটিশ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত আসামের চা বাগানে প্রচুর কুলির প্রয়োজন হল। ব্রিটিশ কোম্পানী কুলি সংগ্রহে দেশব্যাপী কিছু আড়কাঠি (Commission-agents) নিয়োগ করেছিল। এরা দেশের কৃষকগোষ্ঠী মূলতঃ উপজাতি গোষ্ঠীদের সংগ্রহ করে চা বাগানে চালান দিতে থাকল। ছোটনাগপুর হতে বহু ওরাওঁ, মুণ্ডা, খাড়িয়া, সাঁওতাল উপজাতি চা বাগানে স্থানান্তরিত হল এবং নতুন পরিবেশে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক প্রবাহে এদের জীবন নতুনভাবে সুরু হল। পরবর্তীকালে এই সব উপজাতির কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন উদ্ধারকার্যে অংশ গ্রহণ করে এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এদের উপজাতীয় জীবন চর্যায় সবিশেষ পরিবর্তন দেখা দিল।

ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁদের সামগ্রিক জীবনচর্যায়, তাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বহিরাগত গোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাবকে মোটামুটি দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ হিন্দু সমাজের নানা ধারণা ওরাওঁ জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তাদের সামাজিক-ধর্মীয় জীবনে বিশেষ আলোড়ন এনেছিল। বিভিন্ন সময়ে ছোটনাগপুর উপত্যকায় হিন্দু বিশ্বাস ও সংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে — ধীরে ধীরে সেই অনুপ্রবেশ স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ করেছে ওরাওঁ জীবনের অন্তস্থলে এবং কালক্রমে উপজাতীয় চিন্তাধারায় এক নবরূপের উন্মেষ ঘটেছে। নেমহা ভগত, কবীরপন্থী ভগত এবং বাচ্চিদান ভগত আন্দোলন ওরাওঁ জীবনে হিন্দু আচার-আচরণ অনুসরণে উদ্দীপিত করেছে। ওরাওঁ উপজাতির অংশবিশেষ নিরামিষ আহার গোঁড়া হিন্দুর প্রাত্যহিক কর্মপদ্ধতি অনুসরণ, মদ্যপান ত্যাগ প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের উচ্চমার্গে উন্নীত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। সমগ্র উপত্যকাব্যাপী এই ভগত আন্দোলনের পশ্চাৎপটে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস ও উপজাতীয় ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে চিন্তা ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ভগতেরা উপজাতীয় ধর্ম ও সংস্কারকে

পুরোপুরি ত্যাগ করেনি — বহু উপজাতীয় রীতি পদ্ধতি হিন্দু ভাবধারায় পুনর্গঠিত হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ভগতেরা প্রাচীন ভাবধার মত বিশ্বাস করে যে নানাজাতীয় আধিভৌতিক শক্তি সমাজের নানা ক্ষতির জন্য দায়ী। তবে তাদের তাড়াবার জন্যে প্রাচীন উপজাতীয় রীতিতে তারা বিশ্বাসী নয়। যাদুবিদ্যা অথবা ভূত তাড়ান প্রক্রিয়া অপেক্ষা এই ভগতেরা ভজন বা কীর্তন গান করে আধিভৌতিক শক্তিকে বশ করতে চেষ্টা করে।

ওরাওঁদের জীবনে টানাভগত আন্দোলনই বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ এই আন্দোলন আলোচ্য উপজাতির ধর্মীয় জীবন ছাড়াও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিপ্লব এনেছিল। এই টানাভগত আন্দোলনের অপর এক নাম কুরুখ ধরম। প্রাণোচ্ছল ওরাওঁ যুবক যাত্রা ওরাওঁ প্রধান দেবতা ধরমেশের স্বপ্নাদেশ পেয়েছিল। সেই স্বপ্নাদেশের বিষয়বস্তু ছিল ভূত প্রেতের পূজা এবং ভূত তাড়ান পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিত্যাগ, দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পশুবলি, মাংস ভক্ষণ ও মদ্য পানের উপর নিষেধাজ্ঞা, কৃষিকার্য পরিত্যাগ এবং চা বাগানে কুলির কর্মগ্রহণে পরিসমাপ্তি। খুব আশ্চর্যের বিষয়, যাত্রা ওরাওঁর প্রতি এই জাতীয় স্বপ্নাদেশের কথা দিকে দিকে প্রচারিত হয়ে পড়ল এবং দলে দলে ওরাওঁ উপজাতি এটিকে স্বাগত জানাল। বহু ওরাওঁ কৃষিকাজ ছেড়ে দিল; জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করল, মদ্যপান এবং অশুদ্ধ জীবনযাত্রা থেকে দূরে সরে গেল। রাত্রে ভূত তাড়াবার কাজে দলে দলে আত্মনিয়োগ করল। এই ভূতই দেশের বুকে হাহাকার এনেছে — মানুষের জীবনে বিপর্যয় ঘটিয়েছে। কাজেই একে টেনে বের করতে হবে। রচিত হল ভূত তাড়াবার বিশেষ প্রক্রিয়া, কালক্রমে টানা ভগত আন্দোলন ওরাওঁদের সামাজিক চিন্তাধারা, বিবাহ পদ্ধতি, ধুমকুড়িয়ার জীবন যাপন, আখড়ার নৃত্যগীত, কৃষিকাজ ও আনুষঙ্গিক কর্মাবলী এবং সর্বোপরি ধর্ম বিশ্বাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিল। ওরাওঁ জীবন তথা ছোটনাগপুর উপজাতির জীবনধারার রূপকার শরৎচন্দ্র রায় এই টানাভগত আন্দোলনকে ধর্মীয় জীবনে সীমিত করে দেখেননি। তাঁর মতে এই আন্দোলন ওরাওঁ উপজাতির দীর্ঘকালব্যাপী অর্থনৈতিক নির্যাতন এবং তাদের প্রতি শাসক গোষ্ঠীর চরম নির্লিপ্ততার প্রত্যক্ষ জেহাদ ঘোষণারই নামান্তর।

ওরাওঁদের জীবনে বহিরাগত গোষ্ঠীর দ্বিতীয় প্রধান প্রভাব হল খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ওরাওঁ উপজাতির জীবনে হিন্দু ধর্মের প্রভাব এসেছিল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই— এখানে কোন ধর্মান্তকরণ প্রবৃত্তি কাজ করেনি। পাশাপাশি বসবাস করার ফলেই দুই ধর্মীয় জগতের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছিল এবং তার ফল অনুযায়ী ওরাওঁ জীবনে হিন্দু ধর্মের প্রকৃত প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব এসেছিল বিশেষ এক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। ধর্মান্তকরণের উদ্দেশ্য নিয়েই বিদেশী ধর্মপ্রচারকের দল এখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং ওরাওঁদের সেই কাজে উৎসাহ দান করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদের সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব, ওরাওঁদের দুঃস্থ অর্থনীতিতে প্রকৃত সাহায্যদান, অর্থপিপাসু মহাজন এবং দুর্ধর্ষ জমিদারের কবল থেকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি ও তদনুযায়ী কার্যকলাপ ওরাওঁ উপজাতিদের খ্রীষ্ট ধর্মে অনুপ্রবেশে বিশেষ ভাবে প্ররোচিত করেছে। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই ওরাওঁদের জীবনে নানা ধ্যান ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। যে সব ওরাওঁ উপ-জাতি ধর্মান্তরিত হল তারা উপজাতীয় জীবনধারা হতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হল এবং জাতীয় ও বিজাতীয় ধ্যানধারণার অসম সমন্বয়ে এক বিচিত্র জীবন ধারার অধিকারী হয়ে তারা দিনাতিপাত করতে লাগল।

অতি সাম্প্রতিক কালে ছোটনাগপুরের বুকে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে ওরাওঁ সমেত অন্যান্য উপজাতিদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে এই শিল্প বিপ্লব ওরাওঁদের যুগান্তব্যাপী ঐতিহ্য, প্রাচীন চিন্তাধারা এবং বিশ্বাস ও সংস্কারের সাবলীল ধারাকে রুদ্ধ করেছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। সর্ব মোট ৯,২০০ একর জমিতে এই শিল্প সংস্থা প্রসার লাভ করেছে। এই জমিতে ২৫টি উপজাতীয় গ্রাম তাদের সমাজ-সংস্কৃতির নানা উপাদানে ভরপুর হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। প্রকৃত কারখানা এলাকার মধ্যে চিহ্নিত হওয়ায় তিনটি প্রধান গ্রাম ধুরুয়া, লাটমা এবং সতরঞ্জি (তিনটিই ওরাওঁ গ্রাম) সর্ব প্রথমে নিশ্চিহ্ন হল। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রাম তিনটি তৎকালীন বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ (রাঁচি কলেজ) কর্তৃক সমীক্ষিত হয়। উক্ত সমীক্ষায় তিনটি উপজাতীয় গ্রাম ও পারিপার্শ্বিক গ্রামগুলোকে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র গবেষণার ভিত্তিতে ওরাওঁদের

জীবনধারা পর্যবেক্ষণ এবং গ্রাম পরিত্যাগের সরকারী নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে এদের মনোভাব ও ভাবোদ্দীপনা অনুধাবন করা হয়েছিল। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসেবে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক সেই ক্ষেত্র অনুসন্ধানের সুযোগ পেয়েছিলেন। সে দিনের স্বতঃস্ফূর্ত উপজাতি জীবন গ্রামের প্রতিটি অংশে যেন উপচে পড়ছিল। শান্ত, সমাহিত ও শীতল জঙ্গলময় পরিবেশে জীবনের যে শাশ্বতধারা বয়ে চলেছিল গ্রাম পরিত্যাগ পরোয়ানার জন্যে তা অনেকাংশে অবরুদ্ধ হয়েছিল বলে আমরা প্রতিটি পদে অনুভব করেছিলাম। বৃহত্তর ভারতীয় স্বার্থে, দেশের ও দশের মঙ্গলার্থে ওরাওঁ গ্রাম কয়েকটি বুলডোজারের বজ্রকঠোর চক্রের নিষ্পেষণে মাটির সাথে মিশে গেল। সেই সাথে এই ছোটনাগপুর এলাকার উপজাতি জীবনধারার সাথে বৃহত্তর শিল্প প্রভাবিত ও নগর-সাংস্কৃতিক জীবনধারার মিলন ঘটল। এর অব্যর্থ ফল হিসেবে ওরাওঁদের জীবনে এল অভাবনীয় পরিবর্তন। তবে অভাবনীয় হলেও এই পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়। লক্ষ্য করার বিষয় যে এই দুই প্রান্তিক সংস্কৃতির মিলন কিন্তু কোনদিনই পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল না। বনাঞ্চলের মানুষ হঠাৎ দেখল যে সে এক বিরাটকায় শিল্পাঞ্চলের মানুষ হয়ে পড়েছে। নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মত তাদের কোন শিল্পগত যোগ্যতা বা তদনুযায়ী কোন পশ্চাৎপট তৈরী হওয়ার সুযোগ হয়নি। উৎখাত ওরাওদের বিভিন্ন জায়গায় মাটিকাটা প্রভৃতি শারীরিক শ্রমের কাজ দেওয়া হল। কিন্তু এই বিরাট সংখ্যক উপজাতিদের শিল্পে নিযুক্ত হওয়ার মত কোন শিক্ষণ দেওয়ার কথা কোন দিনই চিন্তা করা হয়নি। কাজেই এরা এক জায়গার শারীরিক শ্রমের কাজ শেষ হলে অন্য জায়গায় যেতে লাগল। এইভাবে একটা স্থায়ী ও সুসম্বদ্ধ কৃষক গোষ্ঠী ভবঘুরে অপটু শ্রমিকগোষ্ঠীতে পরিণত হল। পেশা, পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক অসদৃশ জনগোষ্ঠীর এই হঠাৎ পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক কারণেই এই সরল উপজাতি ওরাওঁদের জীবনে নানা সামাজিক অসমতার (Social Equilibrium) সৃষ্টি করেছে। ওরাওঁ উপজাতির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এই অসমতা সামাজিক বিঘটন (Social disintegration), অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খল (Economic disintegration) এবং মানবিক বিচ্ছিন্ন করণের (Mental disruption) সূত্রপাত ঘটিয়েছে যা কালক্রমে সাংস্কৃতিক (Cultural crisis) হিসেবে পরিগণিত হতে চলেছে।

চাকমাদের আদি বাসভূমি ও ধর্ম সমন্বয়

দুলাল চৌধুরী

চাকমারা ভারত-উপমহাদেশের অন্যতম বৌদ্ধ আদিবাসী। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে, (বাংলাদেশ) ত্রিপুরা রাজ্য ও অরুণাচলে চাকমারা বসবাস করছেন। প্রায় দু'লক্ষাধিক চাকমা এই রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছেন। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন চাকমাদের স্থায়ী বাসভূমি বটে, চাকমারা মূলত: মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং এই উপমহাদেশে বহিরাগত। কারণ চাকমাদের লোকগাথায় বিশেষ করে 'চাটিগাং ছাড়া পালায়' চাকমা জনগোষ্ঠীর পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরণের ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। একদা চট্টগ্রাম জেলার রাজানিমায় চাকমা রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এমন কি ফেনী নদীর তীর পর্যন্ত চাকমা রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কালক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত পাঠান-মোগল বা হিন্দুদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে চাকমারা বাধ্য হয়ে পার্বত্য অঞ্চলের গহন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। বৌদ্ধধর্ম চাকমাদের আদিধর্ম নয়। এখনও চাকমা সমাজে দ্বিবিধ ধর্মাবেশ পরিলক্ষিত হয়। সমাজের উপর স্তরে বৌদ্ধধর্ম, নিম্নভূমিতে 'প্রাণবাদ'। একদিকে যেমন আছেন 'বৌদ্ধভিক্ষু' অন্যদিকে তেমনি রয়েছেন 'বোদ্যি, রাউলীরা'। রাউলীরা' লোকায়ত ধর্মের রক্ষক, প্রচারক ও প্রবর্তক। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় পরবর্তীকালে, যখন পূর্ব ভারতে বৌদ্ধধর্ম ইসলাম বা হিন্দুধর্মের চাপে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, তখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারকেরা পার্বত্য ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন।

চাকমাদের কিম্বদন্তীতে জানা যায় 'কলাপ' নগর চাকমাদের আদি বাসভূমি। এই 'কলাপ' নগরের সঙ্গে অনেকে আবার চম্পক নগরের নাম উল্লেখ করেন। এই কলাপ বা চম্পকনগর কোথায় অবস্থিত ছিল?

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কয়েকটি শাক্য জনপদ ছিল। তাদের মধ্যে 'কপিলাবস্তু', দেবদাহ, কোহিল, কলাহ, কুশেত, কাশিত, শাকেত প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। অনেকে মনে করেন কুশেত বর্তমান 'কুশিনগর', কাশিদ কি বর্তমান কাশী? সম্ভবতঃ 'শাকেত' বর্তমান 'অযোধ্যা'। আর কপিলাবস্তু বুদ্ধের জন্মভূমি, 'দেবদাহ' বুদ্ধের মাতুলালয়। ইতিহাসের নির্মম রথচক্রতলে সেই নামগুলি আজ ইতিহাসের পত্র থেকে লুপ্ত অথবা রূপান্তরিত। কলাপ নগর হিমালয় পাদদেশে অবস্থিত একটি নগর। চাকমাদের তালপাতার পুঁথিতে 'কলাপ' নগরের উল্লেখ রয়েছে। (দ্রঃ রাধামন — ধনপুদি পালা)। 'কলাহ' নগর উচ্চারণ বা লিপি বিকৃতির ফলে 'কলাপ' হতে পারে কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম 'কলাপ'। এখানে একদা 'শাক' জাতি বাস করত। বুদ্ধদেব শাক্য বংশীয়। চাকমারা মনে করেন তাঁরাও শাক্য বংশোদ্ভব। অবশ্য ইতিহাসের তেমন কোন জোরালো সমর্থন নেই।

সনাও শেহেন নামক জনৈক চীন দেশীয় ঐতিহাসিক মঙ্গোলিয়ার ইতিহাসে লিখেছেন, শাক্যবংশ তিন প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। যেমন— মহাশাক্য, লিচ্ছুবিশাক্য, পার্বত্য শাক্য। চাকমা এবং তংচঙ্গ্যারা 'ধর্মকাম' পূজা করত। এই পূজাকে 'সীবালী পূজা'ও বলা হয়। সীবালী ছিলেন এক শাক্য রাজপুত্র। সিদ্ধার্থের সমসাময়িককালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সীবালী পরবর্তীকালে বুদ্ধ অনুরক্তরূপে পরিচিত হন। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায়, প্রাচীন ব্রহ্মে পাঁচটি প্রধান জাতি ছিল। যেমন, ব্রহ্মা, তৈলাং, কেরাণ বা কোহরন, বিউ ও চাক। এই চাকেরা উত্তর ব্রহ্মে বসবাস করত। ব্রহ্মের প্রধান নদী ইরাবতীর একটি শাখার নাম চম্পা। চম্পা ও ইরাবতীর সঙ্গমে চম্পক নামে একটি নগর ছিল। সেইখানেই চাকরা বাস করতেন। এই চাকদের আদিনাম শাক (Task) ব্রহ্মদেশীয় বা আরাকানীয় উচ্চারনে 'শাক' হয়ে গেল চাক। এই প্রসঙ্গে আর একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বর্তমান বিদেশ মন্ত্রীর নাম সারিণ চাক (শাক ?)। সম্ভবত: কাম্বোডিয়ায় ও ভিয়েৎনামে 'চাক' বংশজ লোকেরা এখানে বসবাস করছেন এই চাক শব্দ থেকেই কালক্রমে চাকমা শব্দ জাতি অর্থে ব্যবহৃত হলো। চট্টগ্রামের অধিবাসিরা (হিন্দু ও মুসলমান) উভয়েই চকমাদের বলেন, 'চামগুয়া'।

চাম্ শব্দ শ্যাম শব্দের সাদৃশ্যবাচক। সেই জন্য বর্তমানে অনেক গবেষক শ্যাম দেশীয় লোকদের সঙ্গে চাকমাদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরো বিস্তৃত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। স্যার জন্ গ্রীয়রসন বলেছেন, 'চাকমাদের লিপি খ্মের লিপির অনুগামী। কাম্বোডিয়ার লিপিও 'খ্মের'। অবশ্য ব্রাহ্ম লিপির সঙ্গেও চাকমা লিপির সাদৃশ্য রয়েছে। স্মর্তব্য এই একদা ব্রহ্মদেশ থেকেই বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদি আরাকানের পথ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচারিত হয়। বর্তমান লেখক পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৭৪ সালের প্রথমার্দ্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে তালপাতায় লেখা যে সমস্ত প্রাচীন 'তারা' ও প্রাচীন পুঁথি, তান্ত্রিক শাস্ত্র (মন্ত্র) উদ্ধার করেছেন, তাতে দেশীয় লিপিরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু খুব চমকপ্রদ ব্যাপার এই, বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার চাকমারা চট্টগ্রামী উপভাষায় কথাবার্তা বলেন এবং বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন। তবে অতি সাম্প্রতিক চাকমারা ব্রহ্মদেশীয় লিপি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করছেন। (দ্রঃ নয়ারাম চাকমা প্রণীত 'চাকমা প্রথম পাঠ / রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম)।

চাকমাদের আদি বাসভূমি তাহলে কি ব্রহ্মদেশে ? প্রাচীন ব্রহ্ম ইতিহাস এ প্রসঙ্গে নীরব। সপ্তদশ শতকে শ্রীহট্টে [কালাবাঘা] চাকমাদের সঙ্গে পাঠানদের সংঘর্ষ হয়। তার বহু পূর্বেই চাকমারা শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ত্রিপুরা, কুমিল্লায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। 'চাকমা জাতির ইতিহাসে' [সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত] এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন লি উইন তাঁর গ্রন্থগুলিতে চাকমাদের প্রসঙ্গে সুন্দর ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। তিনি চাকমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে চিহ্নিত করেছেন। বৃহত্তর ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাস এখনও অন্ধকারে ঢাকা। বিশেষতঃ পূর্বভারতের আদিবাসীদের প্রসঙ্গে আমাদের 'ক্রনিকলস' বা 'এ্যানালস'গুলি নীরব। যুগে যুগে এই বৃহৎ ভূখণ্ডে নানা জাতের মানুষ এসেছে এবং বৃহত্তর জনস্রোতে মিশে গেছে। তাদের সুচিহ্নিত একক ইতিহাস হারিয়ে গেছে।

চাকমাদের লোকগাথা, কিংবদন্তী আর আচার অনুষ্ঠান ও ধর্ম-কর্ম, সাহিত্য ভাষা ইত্যাদির সামগ্রিক বিচার আজও হয়নি। শুধু কিছু কিছু খণ্ড খণ্ড বর্ণনা আমরা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পেয়েছি। বর্তমানে কালেও

অনুসন্ধান চলছে। শ্রীসুগত চাকমা নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র 'চাকমা ভাষার ইতিবৃত্ত' নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন (১৯৭৩)। ঐ পুস্তিকায় তিনি চাকমা ভাষাকে মাগধী (মাগহী) প্রাকৃতের সমতুল্য বলে বিবেচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মাগধী প্রাকৃতের যে লক্ষণগুলি আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে প্রাচীন বাংলাভাষার মিল রয়েছে। প্রাচীন বাংলাভাষার নিদর্শন পেয়েছি 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে' (চর্যাপদে)। আর এই চর্যাগুলি যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁরা যে শুধু বাঙালী একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। কারণ এক বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে মাগধী প্রাকৃতের প্রচলন ছিল। ভাগলপুর থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বা মগধ থেকে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ পর্যন্ত। চট্টগ্রামের বর্তমান উপভাষা মাগধী প্রাকৃতের বিকৃতরূপ মনে করা যেতে পারে। চাকমারা ইতিহাসের আদিতে অর্থাৎ তাদের উদ্ভবযুগে যে ভাষা বলতেন বা ব্যবহার করতেন, আজ সে ভাষ বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে। কালক্রমে তারা যে জনপদে ছড়িয়ে পড়েছে সেখানকার ভাষা আয়ত্ত করেছে। তা না হলে লিপির সঙ্গে বর্তমান কথ্য ভাষার এমন পার্থক্য হতে পারত না। ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উপপ্লবে চাকমারা বহুযুগ ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিক্রমা করেছে। মাত্র প্রায় আড়াই শত বছর আগে রাণী কালিন্দির আমলে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছে। সেইজন্য তাদের ইতিহাস নানা জটিল ঘটনার আবর্তে আজ নিমজ্জমান।

তবে একথা ঠিক চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নন। হিমালয়ের পাদদেশের গহন অরণ্যে মহাভারতের বা পুরাণের যুগে কিরাত, শবর ইত্যাদি আদিবাসী বাস করতেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে ও শবরদের উল্লেখ রয়েছে। বৌদ্ধ মহাযান বা বজ্রযানীরা একদা মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলেন এবং এই সুবিস্তৃত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বাণী প্রচার করতেন। বৌদ্ধধর্মের ক্ষয়িষ্ণুরূপ নেপালের তিব্বতের বৌদ্ধ মঠগুলিতে সীমিত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে যে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, তা মূলতঃ শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশের থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ। মগধ বা কলিঙ্গের সঙ্গে তার যোগ ক্ষীণ। অবশ্য অষ্টাদশ শতকে পূর্বভারতের বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে থেরবাদীদের সমন্বয়ে এক অভিনব

বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে প্রচলিত হয়ে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয়, চর্যাপদে ব্যবহৃত রূপকল্প বা ভাষার সঙ্গে বর্তমান চাকমাদের কোথাও কোথাও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য এই মিল খুব বিচ্ছিন্ন। চাকমারা যে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কালক্রমে তাদের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে ঐতিহাসিক কারণে। তাদের দেহাকৃতি ও অন্যান্য দৈহিক বৈশিষ্ট্য থাইল্যাণ্ড, (কাম্বোডিয়া) বা ভিয়েতনামবাসীদের সঙ্গে সাদৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। সুতরাং মনে হয় চাকমারা মূলতঃ চাক বা শাক। থাইল্যাণ্ডের 'চ্যাংমাই' নদী প্রসঙ্গত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারত ইতিহাসের প্রাগ্‌দশায় তারা যাযাবর জীবন থেকে মুক্তির জন্য দেশ-দেশান্তর ঘুরেছেন। একদিন উপযুক্ত পরিবেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করেছেন। চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও 'মহামুনি' বা বৌদ্ধ উৎসব পার্বণের মধ্যে চাকমাদের গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করে। সেই হারানো ইতিহাস উদ্ধারের প্রচেষ্টা করছেন বিভিন্ন গবেষক। চাকমাদের ধর্মজীবন প্রসঙ্গে বিখ্যাত জার্মান গবেষক অধ্যাপক ডঃ হাইনৃজ বেশার্ট বলেছেন,

"চট্টগ্রাম এলাকায় চাকমাদের বাস। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এঁরা দঃ পূর্ব এশিয়ার লোক।" ... ... ধর্ম বিষয়ক বিভাগে চাকমাদের চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে।"

১. ভিক্ষু ২. রৌলি ৩. ওঝা ৪. গাঙ্কুলি।

এদের ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামো নিম্নরূপ:

ভিক্ষু — রক্ষণশীল সন্ন্যাসী, সংঘরাজা নিকায়বদ্ধ।

↓

রৌলি — বা রাউলি — গ্রামীণ পুরোহিত; লোকাচারী।

↓

ওঝা — অপদেবতা ও ঝাঁড়ফুঁক-মন্ত্রদ্বারা আধিভৌতিক শক্তির নিয়ন্ত্রক, লোক চিকিৎসক

↓

গাঙ্কুলি — লোকগায়ক বা গায়েন, কবিওয়ালাদের মতন।

চাকমা সমাজ সংগঠনের প্রাচীন কাঠামো ছিল নিম্নরূপ:

চাকমা রাজা
↓
মৌজা প্রধান (হেডম্যান)
↓
কারবারী (গ্রাম প্রধান)
↓
সাধারণ চাকমা

থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম বর্তমানে চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। মহাথেরো নিকায় ও সংঘরাজা নিকায় মিলিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করছে। বাংলাদেশে ৩১০টি বৌদ্ধ বিহারের মধ্যে প্রায় ২৪৬টি চট্টগ্রামে অবস্থিত। একদিকে বৌদ্ধ সংঘ অন্যদিকে গ্রামীণ পুরোহিত রাউলিরা চাকমাদের ক্রিয়া ও লোকাচারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এই ত্রিবিধ কর্মেই উভয় ভাবধারার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

এখানে বৌদ্ধ চাকমাদের দুটি লোকাচারের দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

১. চুমুলাঙ: বিবাহ অনুষ্ঠানে চুমুলাঙ অবশ্য পালনীয় লোকাচার। চুমুলাঙ অনুষ্ঠান ব্যতীত বিবাহ অসম্পূর্ণ। অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা প্রতি বছর চুমুলাঙ বিপদ নিবারণের জন্য করতে পারেন, এবং অনেকে করেও থাকেন।

চুমুলাঙ অনুষ্ঠানে ওঝা পৌরোহিত্য করেন। পূর্বদিন অর্থাৎ চুমুলাঙের পূর্বদিন ওঝাকে নিমন্ত্রণ করা হয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্য। চুমুলাঙ অনুষ্ঠানের দিন খুব ভোরে ওঝা নির্দিষ্ট গৃহস্থ বাড়িতে আসেন এবং বাঁশের 'চ্যাচাড়ী' দিয়ে একটি ছোট 'চাঙাড়ী' প্রস্তুত করেন। তার এক পাশে একটি কাঁঠাল পাতায় একখানি ছোট 'ছুই' দেওয়া হয়। অন্যপাশে বাঁশের তিনখান বাখারী তেপায়ার মত করে তাদের মাথায় আর একটি পাতা দেওয়া হয়, এটা দেখতে ঘরের মতন। এটা নারীর

জন্য নির্মিত। 'ছুই'খানি পুরুষের জন্য নির্মিত। ছুইয়ের নীচে একটি ডিম রাখা হয়।

তারপর দুটি ছোট ঝুড়ির মধ্যে একটিতে চাল, এবং অপরটিতে ধান দিয়ে পূর্ণ করে রাখা হয়। খুব তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল — দুটো ঝুড়ির পাশেই দুটো মদের পূর্ণপাত্র রাখা হয়। ওঝা এরপর কাঁঠাল বা বাঁশপাতা মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যে স্থাপন করে হঠাৎ সেই পাতা অনুষ্ঠানস্থলে তিনবার নিক্ষেপ করে 'দেবী পরমেশ্বরীর' কাছে 'আগচাওয়া বা শুভকামনা করে নেন। দুটো পাতার মধ্যে একটি চিৎ আর একটি উপুড় করে পড়া চাই। নতুবা অনুষ্ঠান শুভদায়ক নাও হতে পারে।

তারপর ওঝা তিনটি কুক্কুট বলি দেন। বিবাহনুষ্ঠানে একটি শূকর বলি দেওয়া বিধেয়। মোরগের পদদ্বয়, মস্তক ও হৃৎপিণ্ড এবং শূকরের মস্তক, শোণিত সহ সামনের ও পেছনের দুটো পা সিদ্ধ করে কলাপাতায় দেবীর সামনে রাখা হয়। স্বামী স্ত্রী (যদি নবপরিণীতা হন) অনুষ্ঠানস্থলে এসে দেবীকে প্রণাম করবেন এবং মদ্যপাত্র বিনিময় করবেন। এবং আবার দেবীকে প্রণিপাত করবেন।

ওঝা মোরগের পায়ের আঙ্গুল, অনুষ্ঠানে দেয় চাল ইত্যাদি বিচার করে নবদম্পতির শুভাশুভ বিচার করে করে বলে দেন। মোরগের পায়ের আঙ্গুল অত্যধিক ফাঁক থাকলে, পাত্রে দেওয়া চাল ওজনে কম হলে অমঙ্গল হবে।

চুমুলাঙ অনুষ্ঠানের থান সাদা সূত্র দিয়ে ঘেরা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে ওঝা উক্ত সূত্র খণ্ড খণ্ড করে কারাক মন্ত্র উচ্চারণ করেন। এবং অনুষ্ঠান কর্তা-কর্তৃদের যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামহাতে সূত্র বন্ধন করে দেন। এবং সকলের শুভকামনা করে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

মন্তব্য : চুমুলাঙ চাকমাদের আদিধর্ম জড়বাদ ও প্রাণবাদের অন্তর্গত। কারণ এর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাতিরেক লোকাচার রয়েছে প্রচুর। প্রজনন ও উর্বরতাবাদ যাদু-বিশ্বাস সম্পৃক্ত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ লোকাচারে পরিণত হয়েছে। কোন শাস্ত্রীয় আচার এতে নেই। বৌদ্ধধর্মের পরিশীলিত ছাপ এতে পড়েনি।

'চুমুলাঙ্' শব্দটি শব্দতত্ত্বের দিক থেকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। চাকমাদের ভাষায় একটি শব্দ আছে — 'লাঙ্যা' (Lyngia) — এর অর্থ প্রেমিক। অন্য একটি শব্দ আছে — 'লাঙোনেক' — এর অর্থ কুমারী। চুমু — এর অর্থ (বাংলায়) — পাত্রে ওষ্ঠ সংলগ্ন করে তরল পদার্থ পান [সংসদ বাঙ্গালা অভিধান] বা চুম্বন; পান ইত্যাদি। 'লাঙ' শব্দার্থ — আঞ্চলিক ভাষায় রক্ষিতা (মালদহ), বারাঙ্গনা; স্বামী (চট্টগ্রাম)। সম্ভবত, লাঙ্ শব্দ থেকে লাঙ্গল এসেছে। এমনকি 'লিঙ্গ' (শিশ্ন; Phallus; শিবের লিঙ্গমূর্তি) শব্দ থেকেও 'লাঙ্' আসতে পারে। সুতরাং শব্দটি প্রজনন জ্ঞাপক। এই সমস্ত বিবেচনা করে বলা যেতে পারে 'চুমুলাঙ' চাকমা সমাজে আদিধর্ম প্রাণবাদ বা প্রজননবাদ সম্পৃক্ত একটি অনুষ্ঠান।

২। এবার একটি বিশুদ্ধ নির্বাণাদর্শ উদ্বুদ্ধ অনুষ্ঠানের বিবরণ দেব। অনুষ্ঠানটির নাম— 'কঠিন চীবর দান।' পার্বত্য চট্টগ্রামের লংদু বিহারের অধ্যক্ষ বনভান্তের প্রেরণায় স্থানীয় বৌদ্ধ রমণীরা এই অনুষ্ঠান পালন করেন ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে। কথিত আছে প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে বিশাখা বুদ্ধদেবের এবং শিষ্যাদির জন্য এই 'কঠিন চীবর দান' অনুষ্ঠান পালন করেন।

এই অনুষ্ঠান প্রারম্ভের প্রায় দু'মাস পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নেওয়া হয়। চাকমারা কোমর তাঁত বুনে। এটা মেয়েদের শিল্পকর্ম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই বস্ত্র বুনতে হ'বে। বৌদ্ধ ভিক্ষুর বা শ্রমণের প্রয়োজনীয় বস্ত্র 'ত্রি-চীবর' নামে পরিচিত:

ক। উত্তরাসাঙ্গ (উত্তরীয়)

খ। সঙ্ঘাতি

গ। অন্তর্বাস: দুটি 'অংশ বন্ধন' চারখানা 'জল সাকুনি' ও দুটি 'কটি বন্ধন।'

এই অনুষ্ঠানে হাজার হাজার বৌদ্ধ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটেছিল। যিনি অর্থাৎ যে মহিলা 'কঠিন চীবর দান' অনুষ্ঠান করবেন, তিনি প্রায় দু'মাস পূর্ব থেকে তাঁতযন্ত্র, সূত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে

থাকবেন। নির্ধারিত অনুষ্ঠানের দিনে বা রাতে এক বৈঠকে তিনি কোমর তাঁতে উল্লিখিত বস্ত্রাদি বুনবেন। অবশ্য অন্যান্য মহিলারা তাঁকে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান দেবেন।

শুদ্ধচিত্তে বস্ত্র বুনতে না পারলে সে বস্ত্র ২৪ ঘণ্টায় শেষ হয় না। পবিত্র চিত্তে ও একাগ্রমনে এই বস্ত্র বুনতে হয়। বস্ত্র বুননান্তে ভিক্ষু বা শ্রমণের কাছে শোভাযাত্রা করে 'কঠিন চীবর' নিয়ে যেতে হবে এবং 'ভান্তের' চরণতলে ঐ 'কঠিন চীবর' উৎসর্গ করতে হবে। তারপর শ্রমণ, ভিক্ষু বা ভান্তে পূজারিণীকে আশীর্ব্বাদ করবেন। এই সময় বুদ্ধ-উপাসনা অবশ্য কর্তব্য।

এই অনুষ্ঠান করতে পারলে ব্রতিনী মোক্ষ লাভ করবেন। নির্বাণের পথ মসৃণ হবে। সুতরাং যে আচার এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তা মূলত: মোক্ষ লাভের আদর্শে অনুপ্রাণিত। চুমুলাঙের সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন। চুমুলাঙেও অবশ্য 'মঙ্গলাকাঙ্খা' রয়েছে, 'কঠিন চীবর দানে' "নির্বাণ-বাসনা।' অথচ উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য 'জীব বলি' ও 'বলি রহিত প্রথা।' একটাতে আপাত হিংসা অন্যটাতে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবে পরিপূর্ণ অহিংসা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইরকম বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা চাকমাদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের মৌল পরিচয় তুলে ধরতে পারি। কোন কোন আচার-অনুষ্ঠানে হিন্দুর লোকাচার অনুপ্রবেশ করেছে অথবা প্রভাবিত করেছে। সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

প্রসঙ্গ গ্রন্থ :

১। Chittagong Hill Tracts and the dwellers therein. —Capt. T. H. Lewin. 1869.

২। Linguistic Survey of India : Vol : V —Sir Grierson.

৩। চাকমা জাতি : সতীশচন্দ্র ঘোষ

৪। চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত : শ্রীবিরাজমোহন দেওয়ান।

৫। গৈরিকা/১ম বর্ষ/১ম খণ্ড/১ম সংখ্যা : বৈশাখ/ ১৩৩৩ (রাঙামাটি) শ্রীপ্রভাতকুমার দেওয়ান সম্পাদিত।

৬। ত্রিপুরা প্রসঙ্গ/জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার/ত্রিপুরা সরকার/ শ্রীস্বপন সেনগুপ্ত সম্পাদিত/১৯৭৫

দ্রষ্টব্য : সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম : বাংলা ও ত্রিপুরায় : ডঃ হাইন্‌জ বেশার্ট লিখিত।

ডিরেক্টর
একাডেমি অব্ ফোক্‌লোর
কলিকাতা

প্রতিবেশী সংস্কৃতি ও জীবন

নেপালী লোকসংস্কৃতি পরিচয়

হরেন ঘোষ

উত্তরবঙ্গের শৈলশহর দার্জিলিঙ তার অফুরন্ত সৌন্দর্যে আকর্ষণ করে সমতলবাসীদের। দার্জিলিঙ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্বত্য অঞ্চল। এখানকার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন দেখলে ধারণা করা যায় না উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কি ঝড় বয়ে গিয়েছিল এখানে।

প্রায় জনবসতিহীন দার্জিলিঙ ছিল সিকিম রাজ্যের অধীনে। ভুটান আক্রমণ করে এর কিছু অংশ কুক্ষিগত করে। ওদিকে নেপাল থেকে, যুদ্ধে পরাজিত বিতাড়িত গোর্খারা এসে বসবাস সুরু করল অরণ্যসঙ্কুল দার্জিলিঙে। একদিকে নেপাল অন্যদিকে ভুটান মাঝখানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সিকিম। দার্জিলিঙ এবং স্বভূমি রক্ষার জন্যে সিকিম-রাজ পরাক্রান্ত ইংরেজদের সাহায্য চাইলেন। তারাও যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারা সাহায্য করতে সম্মত হওয়ায় সিকিমরাজ নিশ্চিন্ত হলেন। নেপাল ও ভুটানকে সরিয়ে দিল ইংরেজ। তবে দার্জিলিঙের ওপর তাদের দৃষ্টি পড়ল। তারা স্বাস্থ্যকেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে চাইল এই শহরকে। সিকিমরাজ বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ দার্জিলিঙ হস্তান্তরিত করেন। দার্জিলিঙ ভারতবর্ষের অন্তর্গত, বঙ্গদেশের একটি জেলা রূপে পরিগণিত হল। স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শৈলবাস এবং গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে দার্জিলিঙ জনপ্রিয় শহর হ'য়ে ওঠে।

শেরপা ও লেপচারাই এই অঞ্চলের আদি অধিবাসী। তার সঙ্গে এসে বসবাস সুরু করে ভুটান সিকিম ও নেপালের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা। তরাই অঞ্চলে এল মুনডা, সাঁওতাল, ওঁরাওরা। পরবর্তীকালে ভারতের নানা প্রান্তের অধিবাসী ও বিদেশীরা দার্জিলিঙে বসবাস সুরু করে। একটি মিশ্র সংস্কৃতির ধারা এই অঞ্চলে প্রবাহিত। তবে ক্রমশঃ দেখা গেল নেপালী ভাষা-ভাষীরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এই অঞ্চলের প্রধান পণ্য চা. এক একটি চা বাগিচাকে কেন্দ্র করে দ্রুত জনবসতি প্রসারিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য-ভূমির লোকশিক্ষা ও সাহিত্য সংস্কৃতি আলোচনার প্রাক্কালে অতীত ইতিহাস স্মরণ রাখতে হবে। যদিও দার্জিলিঙের অধিবাসীদের মূল অংশ নেপালী নামে পরিচিত, মূল ভূখণ্ড আচার, আচরণে নেপাল রক্ষণশীল। নেপাল একমাত্র হিন্দুরাজ্য। দার্জিলিঙ নেপালের শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত সংস্কৃতির সঙ্গে এদের পার্থক্য আছে। ভাষা অনেক উদার, সহনশীল। এখানে নানা বর্ণ, ধর্ম সংস্কৃতির সমন্বয় হয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মিশ্রণ লক্ষণীয়। একে অপরকে প্রীতির চোখে দেখে এবং উৎসব অনুষ্ঠানে নির্দ্বিধায় অংশ গ্রহণ করে। দার্জিলিঙ মহাকাল মন্দিরে একই সঙ্গে হিন্দু-পুরোহিত ও বৌদ্ধলামাকে পূজা করতে দেখে এখনো অনেকে বিস্মিত হন।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের নেপালী বা গোর্খালি বলে। গোর্খা কথাটিই অধিক প্রচলিত। গোর্খারা উৎসবপ্রিয় জাতি। বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। এখনো এরা ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বরবিশ্বাসী, প্রকৃতির অনেক কাছের, আপনজন। পূজাপার্বণ, ব্রতকথা, তুকতাক মন্ত্রপাঠ প্রায় প্রতিটি নেপালী পরিবারের অন্তরঙ্গ চিত্র। ধর্মে অবিচল নিষ্ঠা, ঈশ্বরভক্তি আছে বলেই শত দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও পূজাপার্বণকে এরা জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে নিয়েছে। ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকতা, মানবপ্রেম, দুটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হচ্ছে।

বৈশাখ সংক্রান্তি বা শেষ সংক্রান্তি একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। অতি প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে পরিষ্কার বেশ ভূষা পরে বিভিন্ন দেবদেবী দর্শন ও পূজাপাঠ করা হয়। শ্রীসত্যনারায়ণের পূজো হয় এই দিন। অনেকে উপবাস করেন। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়ার দিন অক্ষয়-তৃতীয়া উৎসব। এদের কাছে অতি পবিত্র দিন। এদিন জপ, হোম, যাগযজ্ঞ, পূজাপাঠ, দান ইত্যাদি যা কিছু করা হয় তার ফল অক্ষয়। অনেকে এই দিনটিকে যুগারম্ভ বলে থাকেন। এরা বলেন এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নারায়ণ পূজা করে জলপূর্ণ কলস দান করলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয় এবং সূর্যলোকে পৌঁছান যায়।

বৈশাখ মাসের অমাবস্যায় পালিত হয়, মাতৃ-আঁউসি বা মাতৃদিবস। এইদিন ছেলেমেয়েরা মাতৃপূজা করে।

সিঠা চাড় জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। এইদিনই মহাদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র কার্তিকের জন্ম হয়, তাই এই উৎসব।

প্রত্যেক মাসের সংক্রান্তির দিনটিকে পুণ্যদিন হিসেবে দেখা হয় এবং ঐদিন স্নান, দান, দেবমূর্তি দর্শন, দেবালয় পরিভ্রমণ করার রীতি আছে। শ্রাবণ সংক্রান্তি বা কর্কট সংক্রান্তি বা শাউনে সংক্রান্তি একটি উল্লেখযোগ্য পার্বণ।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীর দিন ঘণ্টাকর্ণ পূজো করে এরা। এরা বলে গঁঠামুগল। শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে নাগপঞ্চমী পালিত হয়। প্রতি বাড়ির দরজার চৌকাঠের ওপর গোবর দিয়ে নাগের ছবি টাঙান হয়। এরপর সুপুরি দুধ ও দুর্বা দিয়ে সর্পপূজা করে। এক বছর পর্যন্ত সর্পভয় থাকে না নাগপূজো করলে।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে অষ্টমী পর্যন্ত আটদিন ধরে চলে গাইযাত্রা। ভাদ্র মাসের অমাবস্যায় ব্রাহ্মণরা পবিত্র কুশ পূজো করেন। এই কুশ বাড়ির দরজার ওপর টাঙ্গিয়ে রাখা হয়, যখন প্রয়োজন এখান থেকে নিয়ে পূজো পার্বণে ব্যবহার করা হয়। একে বলে 'কুশে অঁউসি' বা গোকর্ণ অঁউসি।'

ব্রতার্ক নামক ধর্মগ্রন্থে হরিতালিকা বা তীজ উৎসবের উল্লেখ আছে। পার্বতীর বিবাহের জন্যে পিতা হিমালয় বিষ্ণুকে পাত্র মনোনিত করেন কিন্তু পার্বতী পতিরূপে পেতে চান মহাদেবকে। মহাদেবকে পতিরূপে কামনা করাই তীজ উৎসবের উদ্দেশ্য। শুক্লা চতুর্থীর দিন হয় গণেশ পূজো। অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে মিষ্টান্ন ও দুর্বা ইত্যাদি উপাচার সহযোগে এই পূজা করা হয়। এইদিন সন্ধ্যায় যদি গায়ে চাঁদের কিরণ লাগে তাহলে সারা বছর চোর অপবাদ সইতে হয় তাই সন্ধ্যার আগে সকলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আবার বলা হয় যদি চোরেরা চুরি করতে গিয়ে অসফল হয়, তাহলে সারা বছর অকৃতকার্য হবে। এই রাত্রে বাগানের শশা, বাগানের কুমড়ো ইত্যাদি চুরি হয়।

উল্লেখযোগ্য উৎসব "দশৈ।" সারা বছর সকলে আকুল আগ্রহে দশৈ এর প্রতীক্ষা করে। প্রায় প্রত্যেকেই সারাবছর ধরে কিছু না কিছু সঞ্চয় করে রাখে এই সময় মনের আনন্দে দরাজ হাতে খরচ করবে বলে। দূরের

মানুষ ঘরে ফেরে। সবাই দৈনন্দিন কাজ বন্ধ করে ছুটির আনন্দে মেতে উঠতে 'দশৈ' মহোৎসব। আশ্বিন মাসের প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত দশদিনব্যাপী এই উৎসব উদযাপিত হয় বলে এর নাম দশৈ। দশমীর দিন অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র পত্নী অপহরণকারী লঙ্কাপতি রাবণকে পরাভূত করে অসুর শক্তি বিনাশ করেন। এইদিন বিজয়া উৎসব। এরা বলে টিকা-উৎসব। বাবা মা ও অন্যান্য গুরুজন দই ও চাল মেখে ছোটদের কপাল জুড়ে বিজয় তিলক বা টিকা এঁকে দেন। কপালে টিকা পরে মনের আনন্দে এরা ঘুরে বেড়ায়। বর্তমানে বাঙ্গালী প্রভাবে দুর্গাপুজোও অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এরপর আসে যমপঞ্চক বা তিহার উৎসব। যমরাজা পাঁচদিন ছুটি নিয়ে ছোটবোন যমুনার বাড়িতে অবসর যাপন করেন। এই সময় সকলে বাড়িঘর পরিস্কার করে, রঙ লাগায়, গাঁদাফুলের মালা, পাতা-বাহার দিয়ে ঘর সাজায়, দরজার সামনে কলাগাছ রাখে, অজস্র প্রদীপ জেলে দেয়। তিহার উৎসবকে কয়েকটি পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। দ্বাদশীর দিন গণেশ পুজো দিয়ে আরম্ভ, ত্রয়োদশীতে কাক পুজো, চতুর্দশীর দিন কুকুর পুজো। অমাবস্যার দিন গাভীপুজো এবং রাত্রে লক্ষীপুজো।

দ্বিতীয়ায় ভাইটিকা বা ভাইফোঁটা। সাঙ্গ হয় তিহার।

এছাড়া আছে ধান্য পূর্ণিমা, শিবরাত্রি, পিশাচ চতুর্দশী, চৈত্রমাসে চৈত্র দশৈ, রামনবমী। সারা বছরই পূজা পার্বণ উৎসব নিয়ে মেতে থাকে এরা। বৈদিক দেবদেবীর পাশাপাশি লৌকিক দেবদেবীর পূজা চলে তবে মুলতঃ পৌরাণিক রীতিনীতির চেয়ে লৌকিক রীতির প্রতিই আগ্রহ বেশি।

গোর্খারা শক্তির উপাসক। তবে শিব, চণ্ডী, কালীর চেয়ে এরা বেশি মানে ভীমসেনকে। ভীম পূজায় এরা একশ্রেণীর বনজ গুল্মকে প্রতীক হিসেবে নেয় — এই গুল্মের নাম ভীমসেনপতি। রামায়ণ-মহাভারত এদের মূল ধর্মগ্রন্থ।

নেপালী লোক সাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়ে আছে লোক-সঙ্গীত ও প্রবাদ প্রবচন। সরল, ধর্মভীরু সৎ গ্রাম্য নেপালী নর-নারীরা নৃত্যগীতের মাধ্যমে আনন্দে দিন কাটাতে ভালবাসে। এরা উৎসবপ্রিয় জাতি। তাই যে কোন উপলক্ষে আনন্দে উৎসবে মেতে উঠতে চায়। থাকুক অভাব অভিযোগ, দৈনন্দিন দুঃখ বেদনা তো থাকবেই, যতক্ষণ পারো হেসে খেলে

আনন্দে জীবন উপভোগ করে নাও। অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, কর্মঠ, পার্বত্য জাতির হৃদয় কিন্তু পাষাণ নয়, সেখানে ফল্গুধারার মত প্রস্রবণের নির্মল রসনির্ঝর।

নেপালী লোকগীতি নানা পর্য্যায়ে বিভক্ত, নানা নামে পরিচিত। পরিচিত কয়েকটি লোকগীতি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। খুব সংক্ষিপ্ত প্রেম সঙ্গীতকে বলে 'ঝাউরে' গীত। যে কোন বিষয়বস্তু নিয়ে "সবাই" গীত গাওয়া হয়। মহালয়া থেকে অষ্টমী পর্যন্ত গাওয়া হয় "মালসিরি" বা মালশ্রী। অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গীত। কবিগানের মত গাওয়া হয় জুবারী গীত। এখানে পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রেমিক-প্রেমিকা। গ্রামের বিবাহিতা মহিলারা দলবদ্ধভাবে গায় সঙ্গিনী গীত। কথিত আছে, যদি কোন বিবাহিতা মহিলা আহূত হয়েও এই গানের আসরে যোগ না দেয় তাহলে পরের জন্মে ঘোড়া হয়ে জন্মাবে। ক্ষেতে কাজ করার সময় সমবেত ভাবে নারী পুরুষ রসিয়া গীত গায়। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী নিজস্ব সুরে নরনারীরা গায়। একে বলে বালুন গীত। বিবাহ বাসরে আদিরস প্রধান রতেলী গীত খুব জনপ্রিয়। আর আছে নানী ভুলাউনে গীত বা ছেলে ভুলানো গান। সুরের বৈচিত্র নেই, আছে আন্তরিকতা।

লোকসঙ্গীতের রচয়িতার নাম জানে না কেউ, কবি বা রচয়িতা খ্যাতির জন্যে লালায়িত নন, শুধু মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলেই তারা খুশি। নিজের মনের ভালোলাগাটুকু আর দশজনের মনে ছড়িয়ে দিতে পারলেই হল।

নেপালী লোকসঙ্গীতে নগরাধিরাজ হিমালয়ের একটি মুখ্য ভূমিকা আছে। ধ্যানমৌনী হিমালয় বন্দনা অনেক লোকসঙ্গীতের বিষয়। প্রকৃতি বিষয়ক অজস্র সঙ্গীত আছে সেখানে দেখি ঝর্ণার গান, কুয়াশা ঢাকা পাহাড় চূড়োর ছবি, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, মাটি,—গাছ—পাথর। আর আছে ধান, ভুট্টা, দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যক খাদ্য বিষয়ক সঙ্গীত। "লহরী লীলা মাই" একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত। চৈত্র-বৈশাখে যখন ভুট্টার চারা লাগান হয় তখন এই গান গাওয়া হয়। একজন একটি কলি গায় এবং সকলে সমস্বরে সুর তোলে লহরী লীলা মাই। দীর্ঘক্ষণ এই গান গাওয়া যেতে পারে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে ধান রোপণের সময় গায় "অসারে" গীত। নায়ক নায়িকা ধান রোপন করতে করতে মনোভাব ব্যক্ত করে।

নায়িকা গায় :—

"ধান হৈ রোপন্থু ছুপুমা ছুপ্
অসারকো মাসমা
রাজাকো বেটি মো কয়ে কেটি
বাঁচন্থু ছ আশমা।"

আসাঢ় মাসে ধান বুনছি কুমারী কন্যা আমি, জানি না কেমন জীবন সঙ্গী পাব — আশায় আশায় দিন গুনছি। নায়ক তখন আশ্বাস দেয়, আর কিছুকাল অপেক্ষা কর, ফসল পাকুক তখন ঘরে তুলব, ঘর ভরব।

কালীপূজোর সময় 'মারুণী' গীত গাওয়া হয়। সঙ্গে নাচ থাকতেই হবে। অত্যন্ত জনপ্রিয় গান।

বিবাহ বাসরে বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষের মধ্যে রঙ্গ-রসিকতা চলে যে গানের মাধ্যমে তার নাম 'কবিত।'

লোকসঙ্গীতের আরো অনেক ভাগ আছে, নাম আছে তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রচলিত 'দেওসী' ও ভৈলো।

দেওসী উৎসবের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। একদল বলেন দেওসীর মূল দেবশ্রী। রামচন্দ্রের সিংহল বিজয়কে কেন্দ্র করে এই উৎসব। অন্যদল বলেন, না, এ বলীরাজার গান। বলিরাজা শ্রীকৃষ্ণকে বলছিলেন, তোমার পা রাখ আমার শিরে, অর্থাৎ দাও শিরে, সেই থেকে দেওসী। কালীপূজোর রাত্রে ঘরে ঘরে লক্ষীপুজো করে এরা। তার পরদিন থেকে চলে দেওসী। দলবেঁধে গাঁদাফুলের মালা গলায় ঝুলিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাঙ্গলিক গান গায় ছোটবড় সকলে। দীর্ঘক্ষণ চলতে পারে এই গান। একজন মুল গায়েন আরম্ভ করে, বাকি সবলে ধুয়ো দেয় — দেওশিরে। অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। নমুনা দেওয়া যাক।

মুল গায়েন আরম্ভ করে — ঝিলিমিলি, — ঝিলিমিলি —
সঙ্গীরা বলে — দেও শিরে।
মুল গায়েন — কেকো ঝিলিমিলি ?
সমবেত স্বরে — দেও শিরে।

এইভাবে চলতে থাকে। ফুলকো ঝিলিমিলি দেওশিরে। রাতো মাটো-দেও শিরে। চিপলো বাটো — দেও শিরে।

চারিদিকে আলোর রোশনাই, শুভ শরৎকাল, তোমার দুয়ারে এসেছি আমরা, তবে নিজেরা আসিনি। পিছল; লালমাটি পার হয়ে অনেক কষ্টে এসেছি, আমাদের দক্ষিণা দাও, তোমাদের মঙ্গল হবে। তুমি রাজা হবে, দু'দশ টাকা তো ইঁদুরেও নিয়ে যায়, আমরা জানি তুমি দাতাকর্ণ। অতএব তাড়াতাড়ি কর এখন অন্য আরেক বাড়ি যেতে হবে, তারা আমাদের দক্ষিণা দিয়ে পুণ্যার্জনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

'ভৈলো' গানে অংশ নেয় কুমারী ও বিবাহিতা মহিলারা। দেওসী চলে তিনদিন তিনরাত্রি, ভৈলো মাত্র একরাত্রের জন্যে। এটি মাঙ্গলিক গান। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলারা সমবেত সুরে গান গায় এবং গৃহস্থের রীতিনীতি শিক্ষা দেয়। দক্ষিণা নিয়ে আশীর্বাদ করে ফিরে আসে।

নেপালী লোকসাহিত্যের বৃহৎ অংশ লৌকিককাব্য। অধিকাংশ কবিতাই সুর সহযোগে গীত হবার উপযোগী করেই রচিত। কখনো পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তু, কখনো নরনারীর চিরন্তন প্রণয়, কখনো সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি, সামাজিক অসঙ্গতি, কখনো প্রকৃতির উদার মনোরম রূপ কখনো বা রুক্ষ ধূসর নির্মম প্রকৃতির রুদ্র ভয়াল রূপ নিয়ে কাব্য রচিত হয়েছে।

একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বাবা অনেক দূর দেশে। এত দূরের পথ, যেতে ছ'মাস, আসতে ছ'মাস সময় লাগে। মেয়েকে বাপের বাড়ি কে নিয়ে আসবে? বিশেষ করে 'তীজ' উৎসবের সময়, যখন সব মেয়েই বাপের বাড়ি আসে, তখন কে তাকে নিয়ে আসবে? এটি একটি জনপ্রিয় পরিচিত কবিতা। কন্যার বিলাপ দিয়ে আরম্ভ।

"হামরো জেঠা বাকী সাতই বইনি ছোরি
সল্যোনি ডাঁড়ামা চলকে কি
হামরা বাবাকি ম এউটি ছোরি
পুরায়ো বরই নেপাল।

ছঐ মহিনা যান, ছঐ মহিনা আউন
বর্ষ দিনকো বাটো কাঠ বরিলৈ

বর্ষ দিনকো বাটো দিয়েও মেরা বাবই
'তীজমা' লিন মোলাই কো জানা ?

বাবা সান্ত্বনা দিচ্ছেন :—

"ঢলকৈ দিউলা কোটে সাঁভো
লরকৈ দিউলা ডুঙ্গিয়া
তীজমা জেঠা দাই লাই লিন্থু পাঠাউলা।"

কোন চিন্তা নেই তোমার, তোমার জন্যে ডুঙ্গি নৌকার ব্যবস্থা করে দেব, তীজ উৎসবে আনবার জন্যে তোমার বড়দাকে পাঠাব।

মেয়ের মন মানে না, ভয় কাটে না।

"পহিলে পরথম জেঠা দাইলে
জাম কি ন জাম ভনন
জেঠি ভাউজুলে জানৈ দেউইনন।"

বাবার কথায় হয়ত বড়দা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে রাজি হবেন কিন্তু বড়বৌদি তাকে যেতে দেবেন না। তখন উপায় ?

কবিতাটি দীর্ঘ। এরপর বাবা বললেন, তাহলে মেজদা যাবে। সেখানেও মেয়ের এককথা মেজবৌদি আপত্তি জানাবেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ছয় ভাই-ই স্ত্রীর বশীভূত এবং তাদের নিষেধেই কেউ যেতে রাজি নয়। অবশেষে বাবা জানান, তোমার ছোট ভাই, তারই একমাত্র বিয়ে হয়নি, সেই যাবে আনতে। তখন মেয়ে চোখের জল মোছে, সান্ত্বনা পায়, ভয় কাটে তার। ছোট ভাই-ই একমাত্র ভরসা এই কবিতাটি পড়লে আগমনী গানের কথা মনে পড়ে যায়।

নেপালীরা যোদ্ধা-জাতি। অনেকেই ঘরের মায়া কাটিয়ে দেশান্তরে জীবন কাটায়। সৈনিক জীবনে কত ব্যথা, কত দুশ্চিন্তা। এই জীবন নিয়েও নানা কবিতা আছে।

"হিমালৈ চুলি পারী বাট
বাস্তো হৈ কুখুরা

হের ফৌজকো বিরসৈলে দেশই কাটৌ
জানৈ লাগেও, জানৈ লাগেও
দুই দিনকো লাহুরে যৌবন জানৈ লাগ্যো
কানছিলে দিয়েক কইচিমার সিগরেট
অজৈ ছ টুকুরা।"

হিমালয় শিখরের অপরপারে ভোরে মোরগ ডাকল। আমাদের বীর সৈনিকরা সেই বন্ধুর পথ পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাদের ক্ষণস্থায়ী যৌবন এইভাবে ফুরিয়ে যাচ্ছে। তবু ঘরের স্মৃতি কি তারা ভুলতে পারে? প্রেয়সীর দেওয়া সিগারেটের টুকরো এখনো পকেটে রয়েছে। এই স্মৃতিটুকুই সম্বল। মেষপালন, গোপালন এদের এক শ্রেণীর জীবিকা। এরা গোঠালা নামে পরিচিত। সঙ্গে শিকারি কুকুর নিয়ে কাকভোরে এরা বেরিয়ে যায়। অনেকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘোরে জীবিকার সন্ধানে।

"খোলাকো পানী খোলহৈমা বয়ো
যাঁউ কতা পঁধেরা—
উঠন আমৈ
ফুকন আগো
ভই গয়ো সবেরা।"

ঝর্ণার জল ঝর্ণায় বয়ে যাচ্ছে, কোথায় এর উৎস কে জানে! মা এবার ঘুম থেকে ওঠো, চুলোর আগুন দাও, ভোর হয়েছে।

"ধুরীমা লাগে ও
ধুরীকো ধোঁয়াশো
মহেরী লাগ্যো লেউ।
কেটালাই মকাই
বুড়ালাই চামল
হৈ মেরী আমৈ
কুকুরলাই পিঠো দেউ।"

ঘরের চাল ধোঁয়ায় কালো হয়েছে, ঝুল জমেছে। উঠোনে শ্যাওলা জমেছে—ওসব ধোয়া মোছা, পরিষ্কার করতে হবে। মা আমার,

আমাদের সঙ্গে যারা গোচারণে যাবে, সেইসব ছেলেদের জন্মে ভুট্টা, বড়দের জন্মে চাল, আর কুকুরের জন্মে রুটি দিয়ে দাও।

লৌকিক কাব্যের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে প্রেম-কবিতা।

"মৈলে পালে মইনা চরী
বোলাওঁদা বোলদৈন
বোলি দেউন মৈনা চরী
হবেলীমা হাঁসি খেলি যাঁউ।"

একটি ময়না পুষেছি আমি, আমি কথা বললেও সে সাড়া দেয় না। একবার তুমি মুখ তোল কথা বল, আমি হেসেখেলে ঘরে ঢুকি।

নেপালী লোকসাহিত্যের আর একটি অংশ প্রবাদ, এরা বলে উখান। কথায় কথায় ছড়া কাটে এরা। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মধ্যেই এর প্রচলন বেশি। বাংলা প্রবাদ ও ছড়ার সঙ্গে মিল আছে অনেকগুলির।

(১) অন্ধারোকো কাম, খোলাকো গীত। অন্ধকারে কাজ করা, ঝর্ণায় গান গাওয়ার মত অর্থহীন।

(২) আকাশলাই থুকা আপনৈ মুখমা ছিটা। আকাশে থুথু দিলে নিজের মুখেই পড়ে।

(৩) অঘি সমঝে সদা সুখী, পছি সমঝে সদা দুখী। যে আগে চিন্তা করে সে সর্বদা সুখী, যে পরে ভাবে সে দুঃখী।

(৪) অদুয়া খাই শহর পস্তুন, মুলা খাই বন পসনু। আদা খেয়ে শহরে প্রবেশ করবে, মুলো খেয়ে বনে যাবে।

(৫) বন ডরেকো সবৈলে দেখছন, মন ডরেকো কসৈলে দেখৈতেন। বন পুড়লে সবাই দেখতে পায়, মন পুড়লে কেউ দেখেনা।

(৬) ন হুনে মামা ভনদা, কানৈ মামা নিকো। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

(৭) ধন হুনেকো মন ছৈন, মন হুনেকো ধন ছৈন। ধনবানের মন নেই, যার হৃদয় আছে তার অর্থ নেই।

(৮) কাটকো ঘাউ মাথি শুনচুক। কাটাঘায়ে শুনের ছিটে।

নেপালী লোকসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হোল। দুটি জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের বঙ্গানুবাদ দিয়ে বর্তমান নিবন্ধের যবনিকাপাত করি।

"মাটিই আমার মা, মাটিই আমার বাবা মাটি-ই আমাদের অন্নদান করে, জীবন রক্ষা করে। আমি মাটি ভালোবাসি, সম্মান করি মাটিকে, — মাটি-মা আমার ধন্য।" হিমালয় সম্পর্কে একটি পরিচিত গান :

"হিমালয় শিখরের অপর পারে
কবে বরফ জমবে —
প্রবাহিত জলধারা — উধাও মন আমার
কোথায় গিয়ে থামবে ?

শিলিগুড়ি, কলেজ